সাঁঝবেলাতে

• বিন্দাআস • পাখিরা জানে •

বুদ্ধদেব গুহ

করুণা প্রকাশনী । কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
জ্যৈষ্ঠ ১৯৬৫

প্রকাশক
বামাচরণ মুখোপাধ্যায়
করুণা প্রকাশনী
১৮এ, টেমার লেন
কলকাতা-৯

মুদ্রাকর
শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়
করুণা প্রিন্টার্স
১৩৮, বিধান সরণী
কলকাতা-৪

ফোনটা যে ওঘরে বেজে যাচ্ছে। গিয়ে ধর না জগু। কর্ডলেসটা আমার কাছে দিস নি কেন? অপারেটর আজ আসে নি?

আজ তো রবিবার বাবু।

ওটা চার্জে রাখা আছে?

হ্যাঁ বাবু।

ধরলি?

ধরছি স্যার।

কার ফোন?

আপনারই বাবু। আর কার হবে? এ বাড়িতে আপনি ছাড়া ...

তুই বড় বেশি কথা বলছিস আজকাল। কে? করলেন কে?

শ্রীদেবী।

তিনি কে?

জানি না বাবু। সিনেমা স্টার কি?

বিরক্তির সঙ্গে, দে! বলে কর্ডলেস ফোনের রিসিভারটা কানে লাগালেন হরপ্রসাদ চ্যাটার্জি। বললেন, ইয়েস।

স্যার, আমি দেবী বলছি। আপনার স্টাডির ফোনটা কি খারাপ?

হ্যাঁ।

তাই অন্য নম্বরটাতে করলাম।

বেশ করেছ। কেমন আছ?

আপনার গাছের চারা যোগাড় করেছি স্যার। আজ অগাস্টের এগারো তারিখ। এ সপ্তাহের মধ্যেই লাগিয়ে দিন। মাটি ধরে নেবে। তরতরিয়ে বাড়বে। তা'ছাড়া রাজপুরের মাটি খুব ভাল।

সত্যিই কি বসন্তী নামের কোনও ফুলের গাছ আছে? আমার এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না। শান্তিনিকেতনের পূর্বপল্লীতে প্রীতি আর আলো রায়ের বাড়ি 'আস্তানা'র কম্পাউন্ডে গাছটি না দেখলে তো ও গাছের কথা জানতামই না। গত বছর গেছিলাম বসন্তোৎসবে, পঁয়ত্রিশ বছর পরে।

এই তো আপনার দোষ স্যার। বিশ্বাস করতে সব কিছুই কি নিজের চোখেই দেখতে হবে? না-দেখে কি কিছুই বিশ্বাস করতে তো বটেই স্বীকার করতেও পারেন না? আমাকেও তো আপনি দেখেন নি বললেই চলে। তার মানে কি আমিও নেই?

তুমি অবশ্যই আছ। তুমি নেই এ কথা কে বলে! তা'ছাড়া, তোমাকে দেখি নি তা তো নয়। একঝলক দেখেছিলাম। একটি কালো ব্লাউজ আর হলুদ শাড়ি পরে এসেছিলে তুমি সেমিনারে। সেমিনারের শেষে আমার কাছে এসে আলাপ করলে।

বললে, নারী প্রগতি সম্বন্ধে আমার বলা ইনফর্মাল বলেই তোমার খুব ভাল লেগেছে।

তা বলি নি। আপনার বক্তব্য ছিল থার্ড ক্লাস কিন্তু বলার রকমটা ছিল দারুণ।

বলো নি? তা হবে। দু-তিন মিনিট কথা বললে। তারপর তো আর দেখা হয় নি। ফোনেই কথা হয়েছে বার কয়েক মাত্র। কিন্তু এ কথা ঠিক যে, সেই ক্ষণ থেকেই তুমি আমার কাছে হলুদ রঙের প্রতিভূ হয়ে গেছো। বাসন্তী। আর তাই তো তোমাকেই বাসন্তী গাছের কথা বললাম। তোমার সঙ্গে অন্য দশটা মেয়ের তফাৎ আছে। তুমি একেবারে তোমারই মতো। বয়স কম হলে কি হয়, তুমি খুব ম্যাচিওরড্ও।

তারপর বললেন, রবিবাবুর ওই গানটি কি শুনেছ তুমি?

কোন গান? আপনারা বুঝি রবীন্দ্রনাথকে রবিবাবু বলেন?

মানে, মা-বাবারা বলতেন ছেলেবেলায়। তাঁদের মুখে শুনে শুনে ...

গানটা কি বলুন।

'একলা বসে হেরো তোমার ছবি, এঁকেছি আজ বসন্তী রঙ দিয়া।'

খোঁপার ফুলে একটি মধুলোভী, মৌমাছি ঐ গুঞ্জরে বন্দিয়া।'

শুনেছি।

আর কেউই কেন অমন লিখতে বা সুর দিতে পারলেন না বলত?

জানি না।

আপনাদের জেনারেশনের রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে বেশ বাড়াবাড়ি আছে।

রবীন্দ্রনাথকে পড়লে, তাঁর গান শুনলে বাড়াবাড়ি না করে যে কোনও উপায় নেই। তোমরা যে যাচাই না করেই বাতিল করতে চাও কি না। অবুঝ যৌবনের অন্ধ ধর্মই যে এই।

তারপর তোমাকে যখন হলুদ ফুলের কথা বললাম, বললাম বসন্তী গাছের কথা, তুমি বললে চারা এনে দেবে। বুঝলে দেবী, বসন্তী ফুল হয়ত দেখে থাকব কিন্তু গাছ তো আগে চিনি নি।

ও গাছের আরো একটি নাম আছে। ভারি সুন্দর।

কী সেটা?

ফাগুন-বৌ।

তাই?

হ্যাঁ। কিন্তু দেব কোথায়? চারা তো এনেইছি। এখন দেব কি করে! শুনেছি আপনার বাড়িতে তো আপনি কারো সঙ্গেই দেখা করেন না।

ঠিকই শুনেছ।

কেন করেন না?

সে অনেক কথা। আপাতত এটুকু জেনে রাখো যে আমার বাড়ি বলতে কিছুই নেই। জগন্নাথ বলে একটা Rogue আছে। সেই বাড়ির মালিক। যে বাড়িতে কোনও নারী থাকেন না তাও কি বাড়ি না কি?

আপনার স্ত্রী থাকেন না আপনার সঙ্গে?

আমি তো বিয়েই করি নি।

সে কি? কেন?

করবার সময় পেলাম কই? আর করবার জন্যেই বিয়ে করে লাভই বা কি? স্ত্রীকে সময় না দিতে পারলে বিয়ে না করাই ভাল। তা'ছাড়া বিয়ে করার মতো কোনও নারীর সঙ্গে দেখাই হল না এ পর্যন্ত।

ভেরী স্যাড।

একটি ঘর বরাদ্দ আছে আমার। সেই স্টাডিতেই, রাতে শোবার সময় ছাড়া, দিন ও রাত কাটাই, অফিসে না গেলে, নিজের নিজস্ব কাজকর্ম করি, গান শুনি, ছবি আঁকি, গান করিও।

গান করেন আপনি?

ওই চান ঘরে গানের মতো গান আর কি। নিজেই গাই, নিজেই শুনি।

তারপর বললেন, এসব কথাকে কারো বিরুদ্ধে, এমনকি নিজের বিরুদ্ধেও কোনও অনুযোগ অভিযোগ বলে ভেবো না, নেহাৎই আমরা আইনের ভাষায় যাকে বলি, 'স্টেটমেন্ট অফ ফ্যাক্ট'। কারোকে বাড়িতে আসতে যে বলতে পারি না তা নয়, কিন্তু হয়ত না বলাই ভাল। আমার বাড়িতে তো বাড়ির পরিবেশ নেই। তাই কারোকে আসতে বললে যে প্রকার টেনশান হয় তার চেয়ে আসতে না বলাই ভাল বলে মেনে নিয়েছি। এই বন্দোবস্তেই দিন কাটছে, কেটেছে। কেউ ব্যাখ্যা চাইলে বিব্রত বোধ করি। তা'ছাড়া বাড়ি তো স্ত্রীদেরই। তা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখেন তো তাঁরাই। তাই আমার স্ত্রী'ই যখন নেই ...

তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল, দেখা করতে হলে তোমাকে আমার অফিসেই আসতে হবে। আসল চেম্বার অবশ্য বাড়িতেই। অফিসটাও অবশ্য আমার একার নয়। সেখানেও আমার জন্যে একটা ছোট্ট ঘর বরাদ্দ আছে বাবার আমল থেকেই। নড়াচড়া করা যায় না তাতে। আর তাতেই কাটিয়ে দিলাম যৌবনের, প্রৌঢ়ত্বের এমন কি বার্ধক্যের বছরগুলিও। আমার কপালটাই এরকম। আছে সবই কিন্তু সবই ছোট। সবই আছে কিন্তু কিছুই নেই।

এমন হল কেন? বিয়ে তো আপনি এখনও করতে পারেন। বলেন তো পাত্রীর লাইন লাগিয়ে দিই।

এইচ. পি. চুপ করে রইলেন।

তারপর দেবী বলল, আপনার বড় বোকা বোকা অভিমান। নিজের অধিকার কেড়ে নিতে শেখেন নি কেন? এমন দয়া-নির্ভর কেন আপনি?

জানি না। হয়ত আমারই দোষে। কিন্তু থাক সে সব কথা। এখন বলো বসন্তী গাছের চারাটি আনলে কোথা থেকে? গাছটা তো বেশ বড়ই হয় দেখলাম। তবে ঝুপড়ি হয় না। বসন্তেই ফোটে তো। ফুল?

বসন্তী বসন্তে ফুটবে না তো কি শিউলি ফুটবে! আশ্চর্য কথা বলেন আপনি! এনেছি এটা ঝাড়গ্রাম থেকে। সেখানে আমার বড় মামা থাকেন। সুবিমল চন্দ্র দে'র হর্টিকালচারাল এরেনা থেকে কিনেছি। উনি হর্টিকালচার শুধু ব্যবসার জন্যেই করেন না, পণ্ডিত মানুষ, অনেক বইও আছে তাঁর। এই তো এইবারের

বইমেলাতেই বেরিয়েছে ফুলের বড় গাছের ওপরে একটি বই, দে'জ পাবলিশিং থেকে।

তাই?

তারপর বলল, আপনি এ বছরে বইমেলাতে যান নি?

নাঃ। প্রথম প্রথম গেছি কয়েক বার। ওই ভিড় আর ধুলো আর আঁতেলদের ভিড় ভাল লাগে না আমার। তা'ছাড়া, বইমেলা তো লেখক আর পাঠকদের। আমি না লেখক, না পাঠক। কোন দাবিতে যাব সেখানে?

পশ্চিমবঙ্গে আঁতেল আছেন না কি কেউ? অধিকাংশই তো সিউডো। তা'ছাড়া আপনি তো পাঠক হিসেবেই যেতে পারেন। কত মোটা মোটা বই আছে আপনার অফিস ঘরে, বাড়িতেও আছে। আমি শুনেছি।

তুমি কি আমার পেছনে গোয়েন্দা লাগিয়েছ না কি?

হয়ত লাগিয়েছি।

উদ্দেশ্যটা কি? কিডন্যাপ করবে? আমার অত টাকা নেই। কিডন্যাপ করলে মেরে ফেলতে হবে।

তারপর বললেন, মোটা মানুষের কাছে কিছু মোটা বই তো থাকবেই।

তারপর একটু চুপ করে থেকে বললেন, কিন্তু ওসবই তো ওকালতির বই। মক্কেলদের ভড়কি দেওয়ার জন্যে। যাতে তারা ঘাবড়ে গিয়ে বেশি ফিস দেন। উকিলের চেম্বারে যত বই থাকে তার অধিকাংশই দেখাবারই জন্যে। এমনই হয়ে আসছে চিরদিন। বেশির ভাগ বই-ই নানা আইনের হাইকোর্ট সুপ্রিম কোর্টের রিপোর্টস্। মামলার সময়ে কাজে লাগে রেফারেন্স-এর জন্যে। তবে বইয়ের দিন তো শেষ হয়ে এল। এখন কমপ্যাক্ট ডিস্ক-এ আসছে সব ডিসিশনস। সিডি-রম। কম্প্যুটার। ইন্টারনেট। জায়গার বড় সংকুলান হবে এবারে। বড় আরামে হাত-পা ছড়াবে মানুষ এবারে।

আর বইগুলো? এতদিনের সুখ-দুঃখের সঙ্গী আপনাদের লাল নীল পেনসিলে দাগ দেওয়া, সেগুলোর কী হবে। ফেলে দেবেন?

পুরনো কাগজওয়ালা কিনে নেবে। উনুন ধরাবে ফুটপাথের তেলেভাজাওয়ালা।

তাই? এমন ভাবতে আপনার খারাপ লাগে না?

লাগে খারাপ। তবে আমরা তো সব Obsolete হয়ে গেছি। মানুষই বাতিল হয়ে যাচ্ছে এসব বইপত্র তো হবেই। খারাপ লাগলে কি হবে। মেনে নিতে হবে। ওয়ান মাস্ট রাইড উইথ দ্য টাইড।

যাই হোক, আপনি যে বললেন আমাকে লাঞ্চ খাওয়াবেন একদিন, তার কী হল!

খাওয়াবো তো। যেদিন বলবে। তবে সেদিন কোর্ট না থাকলেই হল।

কবে কোর্ট থাকবে না তা আমি জানব কি করে?

তুমি এক শনিবারে এসো। কোর্ট তো সব শনিবারেই বন্ধ থাকে। আমার চেম্বারের কাছেই 'মেইন ল্যান্ড চায়না'। দারুণ চাইনিজ খাবার। বার লাইসেন্সও আছে। দু'টি করে ব্লাডি মেরি খেয়ে তোমাকে হাঁসের মাংস খাওয়াবো নয়তো ক্র্যাবমীট।

চাইনিজ আমার ভাল লাগে না।

সে কি?

যা সকলের ভাল লাগে আমার তা লাগে না। তবে আপনার বেলাতেই এক্‌সেপশান করেছি। না করে পারি নি বলে।

আমাকে সকলের ভাল লাগে বলছ?

লাগে বইকি। পুরুষদের কথা বলছি। হাইকোর্টে তো আপনি খুবই জনপ্রিয়।

রাখো ওসব বাজে কথা। এখন বল দেখি কোথায় খাবে?

আপনি যেখানে খাওয়াবেন। কোনও ধাবা-টাবাতেও খেতে পারি। খাওয়াটা তো বড় কথা নয়। আপনার সঙ্গে, আপনার মুখোমুখি বসে কথা বলতে পারব কিছুক্ষণ। এ আমার বহু দিনের স্বপ্ন।

হরপ্রসাদ হেসে ফেললেন। বললেন, ধাবাতে কেন? তোমাকে তাজ বা গ্রান্ডের কফি শপ-এ খাওয়াবো। পার্ক হোটেলের কফি শপটাও খারাপ নয়। তোমার যেখানে খুশি। কোন ক্লাবেও খেতে পারো। টলি, সুইমিং ক্লাব, বেঙ্গল ক্লাব। তবে ক্লাবগুলো আর আগের মতো নেই। কুচো চিংড়ি আর চামচিকেয় ভরে গেছে।

ক্লাবের দোষ কি? আসলে মানুষের কোয়ালিটিই নষ্ট হয়ে গেছে। কতখানি নষ্ট হয়েছে তা আমার চেয়ে আপনি অনেক ভাল জানবেন।

কিন্তু আমি তো সেলিব্রেটেড লেখক নই, গায়ক নই, চিত্রী নই, আমার মধ্যে তুমি কি দেখলে তা তুমিই জানো! বড়ই বিপদে ফেললে দেখছি তুমি আমাকে। এখনও সময় আছে। নিজেকে গুটিয়ে নাও।

তা হয় না! আপনার মধ্যে একজন মানুষ দেখেছি। সেটাই যথেষ্ট।

তারপর বলল, মীর সাহেবের একটা শায়েরী আছে জানেন?

না। আমি কোন শায়েরীই জানি না। হরপ্রসাদ বললেন। শায়েরী কি জিনিস?

দেবী বলল,

'হিঁয়া সুরত-এ আদম বহুত হ্যায়, আদম নেহি হ্যায়।'

মানে কি হলো? এসব বিজাতীয় ভাষা আমি বুঝি না।

সে কি? আপনি হিন্দি ছবি দেখেন না টেলিভিশনে?

টিভি আমি দেখিই না।

মানে হলো, এখানে মানুষের চেহারার জীব অনেক আছে, মানুষ নেই।

ভাল। তুমিই সত্যদ্রষ্টা। জীবনের সাঁঝবেলাতে তুমি এসে পড়ে আমার জীবনে মহা ঝামেলা বাধাবে বলে মনে হচ্ছে। জানি না, কপালে কি আছে!

জীবনের সাঁঝবেলাতে পৌঁছে গিয়েও বাঁচতে শিখলেন না। হোয়াট আ পিটি! আপনাকে আমি বাঁচতে শেখাব।

কোন কিছুই শেখার মতো মানসিকতা আর ধৈর্য আমি হারিয়ে ফেলেছি দেবী। বৃথা চেষ্টা কোরো না। তোমার জীবনে এখন সুগন্ধি সকাল। নিজেকে উপভোগ করো। বুড়োকে গাছের চারা দিয়েছো বেশ করেছ, নিজের মহামূল্য সময় দিয়ে নিজের ক্ষতি কোরো না। যৌবনের মতো দামী আর কিছুই নেই। আমার যৌবন চলে গেছে বলেই আমি একথা জানি। এ কথার তাৎপর্য তুমি আজকে বুঝবে না। তুমি নিজেও একটি চারা। তোমার যোগ্য বাগানে হেঁটে গিয়ে থিতু হও।

আপনি মুণ্ডু জানেন। (যৌবন কোন শারীরিক অবস্থা আদৌ নয়, পুরোপুরিই মানসিক অবস্থা, অ্যাটিট্যুড টুওয়ার্ডস লাইফ।) আপনার মতো যুবক তো আমি সেদিন আর একজনও দেখলাম না।

এই টাক-পড়া হতশ্রী বুড়োকে এসব কথা বলে উত্তেজিত বা আহ্লাদিত করতে পারবে না। তোমার মাথা খারাপ হয়েছে, চোখ খারাপ তো হয়েইছে।

আমি ঠিকই আছি। ইন পারফেক্ট ফিজিক্যাল অ্যান্ড মেন্টাল কন্ডিশন।

দেবী বলল।

আচ্ছা দেবী, তুমি কি চাও বলো তো আমার কাছে? চাকরি চাও? টাকা চাও? ডোনেশন চাও? কোথাও কি ইন্টারভিউ পেয়েছ? ইন্টারভিউয়িং বোর্ডে কারোকে কারোকে বলে দিতে হবে তোমার সম্বন্ধে? খুলেই বলো না।

দেনা-পাওনা, স্বার্থ, এসব ছাড়া কি কিছুই বোঝেন না আপনি? আপনার মনটাই দূষিত হয়ে গেছে। একেবারে পল্যুটেড। আপনার মনের পরিবেশ ঠিক করতে সময় লাগবে। কত সময়, কে জানে!

সময় যে আমার বেশি বাকি নেই দেবী। তুমি রবিবাবুর ওই গানটা জানো?

কোন গান?

"অবেলায় যদি এসেছ আমার বনে, দিনের বিদায় ক্ষণে/গেয়ো না, গেয়ো না চঞ্চল গান ক্লান্ত এ সমীরণে।। ঘন বকুলের ম্লান বীথিকায়/শীর্ণ যে ফুল ঝরে ঝরে যায়/তাই দিয়ে হার কেন গাঁথ হায়, লাজ বাসি তাই মনে/চেয়ো না, চেয়ো না মোর দীনতায় হেলায় নয়ন কোণে।।"

গেয়ে শোনান না?

আমি গায়ক নই। তা'ছাড়া তোমাকে শোনাবার মতো ভাল গাই না।

হাঃ। আমি কি খুব বড় বোদ্ধা?

যাই হোক, গানটি শুনি নি। আমরা সত্যিই অভাগা। রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে বা তার সাহিত্য ও গানের ছায়ায় আমরা বড় হয়ে উঠি নি। আমার মা সব সময়েই বলেন একথা।

তাই? তোমার বাবা কি করেন?

বাবা ডাক্তার ছিলেন। জি. পি.।

ছিলেন মানে?

মানে, এখন নেই। চলে গেছেন।

সে কি! তোমার বাবার আর কত বয়স হতে পারে। ষাটও তো হবে না।

থাকলে বাষট্টি হতো। উনি পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সেই চলে গেছেন মোটর অ্যাকসিডেন্টে।

আর মা? তোমার সঙ্গে থাকেন? মায়ের বয়স এখন কত?

মেয়েদের বয়স জিজ্ঞেস করতে হয় না। তা এখন পঞ্চান্ন হবে। মা একাই থাকেন। আমার সঙ্গে থাকেন না।

মা কি কিছু করেন?

মা স্কুলের টিচার।

কী বিষয় পড়ান?

বাংলা।

তা'হলে তুমিও একাই থাকো?

হাসল দেবী। বলল, একা কেন থাকব? সঙ্গীর সঙ্গে থাকি।

সঙ্গী মানে? বিয়ে করো নি তুমি?

না স্যার। বিয়ে ব্যাপারটা আজকালকার দিনে সকলের পক্ষে করা সম্ভব হচ্ছে না আর। খুব বড়লোকের মেয়ে যদি হতাম তবে হয়ত বেশ সালঙ্কারা সুসজ্জিতা হয়েই সানাই বাজিয়ে বিয়ে করতাম। বাবা জামাইকে গাড়ি কিনে দিতেন, টলি ক্লাবের মেম্বার করে দিতেন, বিলেতে বা স্টেটস-এ ম্যানেজমেন্ট পড়াতে পাঠাতেন আর আমি স্বামীর ওপর ছড়ি ঘোরাতাম। অমন চক্ষুলজ্জাহীন আরামদায়ক ব্যবস্থা না হলে বিয়ে করা সম্ভব হচ্ছে না এখন। করাটা উচিতও নয় হয়ত। মানে, ওরকম বিয়ে করাটা। তেমন স্বামীকে তো শ্রদ্ধা করা যায় না। তারা তো ঘর জামাই-এর চেয়েও অধম। আজকালকার খুব কম শিক্ষিত আত্মসম্মানজ্ঞানসম্পন্ন ছেলেই অবশ্য অমন বিয়ে করতে রাজি হবে।

বলো কি? আমার তো ধারণা আত্মসম্মান জ্ঞান ব্যাপারটা আজকালকার খুব কম ছেলের মধ্যেই আছে।

আপনি হয়ত সকলকে দেখেন নি স্যার।

তোমার সঙ্গী কি করেন?

তবে আমার সঙ্গী তো এক জন নয়, দু'জন। মিনি-দ্রৌপদী বলতে পারেন আমাকে। আমরা তিন জনে এক সঙ্গে লিভ টুগেদার করি। এক জন স্বামীতে আজকাল সত্যিই কুলোয় না। তিন জনেই কাজ করি যে আমরা।

কেন? তিন জনেই কাজ করো কেন?

নইলে কুলোয় না। কারো রোজগারই তো বেশি নয়।

তারপরই বলল, আপনাকে একদিন নিয়ে আসবো আমাদের বাড়ি। আসবেন? আপনি এত বড়লোক, নামী মানুষ।

আমি যে মোটা মানুষ এটুকুই জানি। আর কিছু বিশেষণ আমার সম্বন্ধে প্রযোজ্য বলে জানি না।

তারপর বললেন, কোথায় থাকো তুমি?

কোনও পশ পাড়াতে নয়। বুঝতেই পারছেন, আমি অতি সাধারণ মধ্যবিত্ত। দমদমের নাগেরবাজারে থাকি আমি। খাদিমের কর্তা পার্থ রায়বর্মনকে যেখানে কিডন্যাপাররা ছেড়ে দিল আমাদের এক তলার বাড়িটা সেই গলিতেই। রিক্‌শাওয়ালাটাকেও আমরা চিনি। কতদিন দমদম মেট্রো স্টেশন থেকে ওকে নিয়ে আমি এসেছি।

নিজের ফ্ল্যাট তোমার? ওনারশিপের ...

দেবী হাসল।

বলল, আপনি কি পাগল? নিজের ফ্ল্যাট থাকলে কি আর সংসার চালাতে দু'জন সঙ্গী লাগত? একটা ডাইনিং-সিটিং আর দুটো বেডরুম। তাও এক তলাতে।

প্রাইভেসি প্রায় নেই-ই। এই গুমোটে সারাক্ষণ পর্দা টেনে থাকতে হয়। আওয়াজ। ধুলো। গাড়ির হর্ন। সাইকেল রিক্‌শার প্যাঁকপ্যাঁকানি।

দুটো বেডরুম কেন?

আমার যে দু'জন সঙ্গী। এক সঙ্গে দু'জনের সঙ্গে শোব কী করে! তিন দিন তিন দিন করে শুই। বদলে বদলে। রবিবার অফ্‌ফ ডে। আমি একলা শুই হাত-পা ছড়িয়ে আর ওরা দু'বন্ধু এক সঙ্গে শোয়। রাম-টাম খায়। টিভি দেখে, বসার ঘরে বসে। মেয়েদেরই মতো ছেলেদেরও অনেক নিজস্ব গল্প থাকে, যা মেয়েদের সামনে করতে বাধে। তবে ভবিষ্যতে আরও একটা ঘরের হয়ত দরকার হবে।

কেন? আরও একজন সঙ্গী জোটাবে না কি?

হেসে ফেলল, দেবী।

বলল, না। আগামী বসন্তে যখন শান্তিনিকেতনে নরম হলুদ বসন্তী ফুল আসবে, মনে ইচ্ছে আছে, তখন কন্‌সিভ করব আমি।

তারপরই বলল, ও গাছের আরো একটি নাম আছে। ভারি সুন্দর।

কী সেটা?

ফাগুন বৌ।

ফাগুন বৌ বা বসন্তী গাছে যখন ফুল আসবে তখনই আমিও ফুলফলন্ত হব। আমার শরীরে বীজ বপন করব। ইচ্ছে আছে। আগন্তুক এলে তো তার জন্যে একটা এক্সট্রা ঘর লাগবেই।

কন্‌সিভ যে করবে তা তোমার সন্তানের বাবা কে হবে?

আপাতত ঠিক আছে বর্তমান সঙ্গীরাই।

দু'জনে?

হ্যাঁ দু'জনেই। তবে আমি সিংগল-প্যারেন্ট হিসেবে মানুষ করব সন্তানকে যদিও সন্তানের দুই বাবাই আমাকে মরাল ও ফিনান্সিয়াল সাপোর্ট দেবে। আশা করি। নিনা গুপ্তা আমাদের চোখ খুলে দিয়েছেন। শী ইজ দ্যা পাথ-ফাইন্ডার। বাঘও তো শুনেছি তার বাচ্চাদের সঙ্গে থাকে না। বাবাদের যে বাচ্চার সঙ্গে থাকতেই হবে তার কি মানে আছে?

হ্যাঁ। অনেক বাবা শুনেছি বাঘেরই মতো স্বভাবের হয়। নিজের বাচ্চাকেও খেয়ে ফেলে।

শুনছেন! শুনছেন! দরজার বেল বাজাচ্ছে তো না যেন যুদ্ধ করছে। নিশ্চয়ই কিংশুক ফিরেছে। ওর আবার আজকে বাজার করে নিয়ে আসার কথা। দরজা খুলতে দেরি হলে চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করবে। আজকে ছাড়ি স্যার। পরে আবার করব একদিন শিগগিরি। পরশুই করব। আপনার সঙ্গে কথা বলতে খুব ভাল লাগে। আপনিও করবেন, যদি সময় পান। আর যদি ইচ্ছে করে। আমার নম্বরটা লেখা আছে তো?

আছে আছে। লেখা আছে।

তারপরে, টাটা! বলেই রিসিভারটা ক্র্যাডল-এ নামিয়ে রাখল দেবী।

কর্ডলেস ফোনটার স্যুইচ অফ্‌ফ করে দিতেই কেমন যেন শূন্যতা বোধ

করলেন এইচ. পি. চ্যাটার্জি সাহেব। কলকাতার উঁচু মহলে সকলেই তাঁকে এইচ. পি. বলেই জানে। ঠিক এই ধরনের শূন্যতা এর আগে কোনওদিনই বোধ করেন নি। ওই অল্পবয়সী মেয়েটি তাকে কী যেন এক পূর্ণতার আভাস দেয়, হাতছানি দেয়, অতি শালীন ও সুরুচিসম্পন্ন হাতছানি, অন্য এক জগতে, যে-জগৎ সম্বন্ধে এইচ. পি.-র কোনও স্পষ্ট ধারণা নেই।

ফোনটা বাজল।

তোমার অন্য নাম্বার দুটোই কি খারাপ? এইচ. পি.?

মাথার মধ্যে যে এক ঘোরের সৃষ্টি হয়েছিল তা চুরমার হয়ে গেল। এইচ. পি. বললেন, হ্যাঁ তিন দিন হয়ে গেল।

কমপ্লেইন করো নি?

করেছে তো মদন।

জে. কে. রায় সাহেবকে বলে দাও না একবার।

থাক না। যবে ঠিক হয়, হবে। ফোন একটা যন্ত্রণা। একা থাকার, একটু একা ভাবার কি জো আছে? তবু যদি বুঝতাম আমার উপকার করতে কেউ ফোন করে। সকলেরই তো কিছু না কিছু চাই। এটা করে দাও, ওকে বলে দাও, সেটা ধরে দাও এই আর কি! বিরক্ত লাগে। তিতিবিরক্ত।

বুঝলাম। তা কার সঙ্গে প্রেম করছিলে এইচ. পি?

হরপ্রসাদ অনেকক্ষণ চুপ করে থাকাতে ব্যারিস্টার মৃগেন মিত্তিরের বউ বাসবী খেঁকিয়ে উঠে বললেন, কি? কথা বলছ না যে।

তাঁর কী যে অধিকার এইচ. পি. চ্যাটার্জির ওপরে তা তিনিই জানেন। বিরল কেশ, কলপ করা, পেডিকিওর ও ফেসাল করা ষাট ছুঁই ছুঁই বাসবী মিত্তির হরিপদকে একটু বিশেষ চোখে দেখেন। কিন্তু এইচ. পি. সাহেব রিয়্যালি ডেসপাইজেস হার। নেহাৎ মৃগেন মিত্তির তার চেয়ে সিনিয়র এবং প্রথম দিকে প্রফেশনে খুবই সাহায্য করেছিলেন। তা ছাড়াও বাসবীর দাদা হারাধন বাঁড়ুজ্জ্যে একজন নামী সলিসিটর। মেসার্স ওয়ালটন অ্যান্ড হুইটনি সলিসিটর ফার্মটা ওঁরই, বহুদিন হল। ওয়ালটন এবং হুইটনি ওই দুই সাহেবই স্বাধীনতার কয়েক বছর পরেই ইংল্যান্ডে চলে গেছেন। ওই ফার্ম অনেকই ব্রিফ দিয়েছে চ্যাটার্জি সাহেবকে, পেশার প্রথম দিকে, যখন সাহায্যর দরকার ছিল। আজকে তিনি ব্রিফ যত ফেরত দেন সেই তুলনাতে খুব কমই নেন। বাসবীকে তাই সহ্য করেন ফর ওল্ড টাইমস্ সেক।

অনেক মহিলারই বয়স যত বাড়ে তাঁরা তত গ্রেসফুল হন কিন্তু বাসবী অন্য মেরুর জীব। রাক্ষুসী, রুক্ষ, অভব্য বলে মনে হয় তাঁকে চ্যাটার্জি সাহেবের। স্বাভাবিকতা যে নারীর নেই, যিনি গ্রেসফুলি বুড়ি হতে জানেন না, বয়স তাঁকে ভিখারি করে দেয়। একথাটা কম নারীই বোঝেন।

মৃগেনটাও একটা ম্যাদামারা। মিথ্যে বলবেন না, হরপ্রসাদের যৌবনে বাসবীর সঙ্গে একটু মাখোমাখো হয়েছিলেন তিনি। অবশ্য বাসবীরই প্রবল আগ্রহে। এইচ.

পি.-র দিক দিয়ে সেই সম্পর্কটা ছিল কনভিনিয়েন্সেরই। মহিলা নীম্ফোম্যানিয়াক ছিলেন যৌবনে। তাই কয়েক বার শারীরিক সান্নিধ্যে আসতে হয়েছিল। বিবেকের কাছে তিনি পরিষ্কার। কিন্তু সেই সম্পর্কে কোন মাধুর্য ছিল না বরং পুরো নারী জাতির ওপরেই এক গাঢ় বিদ্বেষ জন্মে গেছিল চ্যাটার্জি সাহেবের। উনি এমনিতে খুবই সূক্ষ্মরুচির মানুষ। বাসবীর শরীরী প্রেম তাঁর সেই রুচিকে আহত করেছিল। এসব জিনিস বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে বলার নয়, নীরব অনুভূতির। যাঁরা বোঝার, তাঁরা বুঝবেন।

সময়ে বিয়েটা যে কেন করা হল না, এখন ভেবেও তার কোনও ব্যাখ্যা পান না।

মনে আছে, দিল্লি থেকে সান্যাল সাহেব এক বার এসেছেন ফুল-বেঞ্চে অ্যাপিয়ার করতে। কলকাতা হাইকোর্টের লিফট-এর সামনে দেখা। তখন চ্যাটার্জি সাহেবের বয়স হয়েছে চল্লিশ-বেয়াল্লিশ। সান্যাল সাহেব বললেন, আরে হরপ্রসাদ, তোমার সব খবরই পাই। খুবই তো ভাল করছ হে! ভেরি গুড। কনগ্র্যাচুলেশনস্। তা এবার একটা বিয়ে-টিয়ে করো।

চ্যাটার্জি সাহেব বিনয়ের সঙ্গে বলেছিলেন, পায়ে একটু ভাল করে দাঁড়িয়ে নিই স্যার।

সান্যাল সাহেব বলেছিলেন, এখনও দাঁড়াও নি। তা ভায়া, তুমি যখন দাঁড়াবে তখন তো তোমার ওটি আর দাঁড়াবে না।

লজ্জায় অধোবদন হয়ে গিয়েছিলেন চ্যাটার্জি সাহেব। অন্য সিনিয়ররা হেসে উঠেছিলেন কাঁচা রসিকতার জন্যে বিখ্যাত সান্যাল সাহেবের কথাতে।

কি হল? জবাব দিচ্ছ না কেন এইচ. পি.?

খেঁকিয়ে উঠে বললেন মিসেস মিত্তির।

কি বলবে বল না বাসবী? কি করতে পারি তোমার জন্যে?

কিছুই করতে হবে না, সাড়ে সাতটার সময় কাল রাতে ক্লাবে চলে আসবে। হাউজি আছে।

কোন ক্লাবে?

স্লিক ক্লাবে।

আমি যেতে পারব না। স্লিক ক্লাবে তো আজকাল একদল সিউডো আঁতেলকে জুটিয়েছ তোমরা। যাওয়াই যায় না তাদের ভিড়ে। তা'ছাড়া বুড়ো বয়সে 'টু ফ্যাট লেডিস এইট্টি এইট' ওইসব বালখিল্য ক্রিয়াকাণ্ড করে সময় নষ্ট করতে আমি আদৌ রাজি নই। রিডিকুলাস। আমার সময়ের দাম আছে।

শোনো, তারপর আমরা তাজ বেঙ্গলে যাব। 'সোনার বাংলা'-তে খাব।

ভাল কথা। আমি রাজীব গুজরালকে বলে দেব, তুমি যাকে খুশি সঙ্গে নিয়ে যেও। বিল সই করে দিও। আমার নাম। আমি কোথাওই যাব না।

সই করার কী আছে। মণ্ড সেন কি দেউলে হয়ে গেছে নাকি? না, সে রাজীব গুজরালকে চেনে না। তুমি আসবে না?

খুব রেগে বললেন বাসবী।

না। স্যরি। এনাফ ইজ এনাফ। তুমি খুকী হতে পারো কিন্তু আমার বয়স হয়েছে।

কি করবে? বাড়ি থেকে বেরোবে না তো, শনিবারের সন্ধেবেলায় কি করবে একা বসে?

মৃগেনদা কি করবে? তাকেই নিয়ে যাও না।

সে কি এখানে আছে না কি? বম্বেতে আছে সাত দিন হলো। এসো এসো, খাওয়ার পরে আমরা বাড়িতে আসব, নয়ত তোমার বাড়ি।

কি করতে? নোপ্। স্যরি।

তারপর বলল, 'তোমার নাতনির সঙ্গেই হয়ত দেখা হয়ে যাবে তার বন্ধুদের নিয়ে তাজবেঙ্গলের "ইনকগনিটোতে" নেচে-টেচে সেও খেতে আসবে যখন।

তাকে কি? নাতনিদের জীবন তাদের, আমাদের জীবন আমাদের। আমাদের কি লাইফ এন্‌জয় করার রাইট নেই?

এন্‌জয়মেন্ট নানা রকম হয় বাসবী। তুমি আমাকে বুঝবে না।

তুমি করবেটা কি বলো না?

ভীমসেন যোশীর একটা টেপ পাঠিয়েছে বম্বে থেকে বকুল, জয়ন্ত চ্যাটার্জির কাছে। ভীমসেন যোশীর নাম শুনেছ কি? মাইকেল জ্যাকসন-এর শুনেছ, পিট সিগারের শুনেছ, কিন্তু ভীমসেন যোশীর নাম সম্ভবত শোনো নি। আগামীকাল জয়ন্ত সেটা আমাকে পাঠাবে। কোর্ট থেকে ফিরে রাতের চেম্বার শেষ করে চানটান করে হুইস্কির বোতলটি নিয়ে ইজিচেয়ারে আধো শুয়ে সেটি শুনব। প্রায় পৌনে তিন ঘণ্টার টেপ। ইমন, হোরি বাহার তারপর পিলুতে ঠুংরী, সব শেষে ভজন। 'যো ভজে হরিকো সদা।' সত্যি! হাজার বার শুনেছি, তবু পুরনো হয় না।

খুব হুইস্কি খাচ্ছ বুঝি তুমি আজকাল?

খুব না হলেও খাই। উকিল-ব্যারিস্টারেরা মাথার কাজ করেন, তাঁরা অনেকেই খান। তোমার বাবা খেতেন, দাদা খায়, মৃগেন তো খায়ই। তবে আমি মৃগেনের চেয়ে কম খাই। তুমি জ্ঞান দিও না তো।

তুমি জাহান্নমে যাও। কার সঙ্গে কথা বলছিলে তা বললে না তো। পৌনে এক ঘণ্টা ধরে লাইন এন্‌গেজড!

সে আছে। আছে। এক হলুদ পরী।

বৃদ্ধ ভাম। সখ কত্ত।

বলেই, বাসবী মিত্তির জ্বলে উঠলেন।

এইচ. পি. বললেন, তুমি যা ভালবাসো, যেমন মানুষ ভালবাসো, সম-মানসিকতার, তাদের নিয়েই এন্‌জয় করো। তুমি তোমার মতো আনন্দে থাকো, আমাকে আমার মতো থাকতে দাও।

ওসব জ্ঞানের কথা থাক। এখন তুমি কাল আসবে কি না ফ্যাইনালি বলো।

বললামই তো, আসব না।

ঠিক আছে।

মনে হলো বাসবী থ্রেট করলেন? কিন্তু হরপ্রসাদের বাসবীর কাছ থেকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। কোনদিনই ছিল না। জীবনের এক সময়ে যদি কোনো মহিলার

সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক হয়ে থাকে, এমন মহিলারা সেই সম্পর্ক রদ করলে তিনি বাঘিনীর মতো হিংস্র হয়ে ওঠেন বোধহয়।

কর্ডলেস-এর সুইচটা টিপে দিয়ে হরপ্রসাদ কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকলেন।

বাইরে বড়ই কোলাহল। ভবিষ্যতে কলকাতায় না কি মানুষ আর যানবাহন আরও বেড়ে যাবে। কাগজে পড়েছিলেন। সব সময়েই এত আওয়াজ, এত গাড়ির হর্ন, এত বিভিন্ন যানবাহনের এঞ্জিনের আওয়াজ একটুও ভাল লাগে না আর। হেঁটে কোথাও যাওয়া তো যায়ই না, গাড়ি করেও কোথাওই যাওয়া যায় না। হাইকোর্টে যেতেই হয় সপ্তাহে পাঁচদিন। সেখান থেকে ফিরে কোথাওই আর যেতে ইচ্ছে করে না। ইচ্ছে করে, প্রতি উইকএন্ডেই রাজপুরের বাগানবাড়িতে চলে যান, কিন্তু হয় না। কনফারেন্স থাকে, প্লেইন্ট সেটল করার থাকে, পরের সপ্তাহের মামলা দেখে রাখতে হয়। এত কাছে করলেন বাগানবাড়ি তাও যাওয়া হয় না। তিন জন মালী, বাবুর্চি, বেয়ারা, ইলেকট্রিসিটি, ফোন, ফ্যাক্স খরচা যা হওয়ার হয়ই কিন্তু যাওয়াই হয় না। সত্যি কথা বলতে কি আজকাল কোর্টেও আর যেতে ইচ্ছে করে না। সব জায়গার পরিবেশই পাল্টে গেছে, মানুষজন সব অন্যরকম হয়ে গেছে। না কি, তিনি সত্যিই বুড়ো হয়ে যাচ্ছেন? প্রায়ই মনে হয়, আর বেশি দিন খাপ খাওয়াতে পারবেন না।

শুধু টাকার জন্যেই যে কাজ করেন তা নয়। যতটুকু সঞ্চয় আছে তাতে তাঁর কাজ ছেড়ে দিলেও বাকি জীবন এইভাবেই কেটে যাবে। টাকার জন্যে নয়, কিন্তু কাজ না করলে করবেনটাই বা কি? সময় কাটবে কি করে। অকুপেশান ছাড়া মানুষে বাঁচে? রিটায়ার্ড মানুষদের মতো সকালে লাঠি বা ছাতা হাতে করে বেশি দিন বাঁচবার জন্যে হেঁটে বেড়ানো, পার্কের বা বেঙ্গল রোয়িং ক্লাবের লনে বসে চা খেতে খেতে রাজা-উজির মারা বা মুখরোচক পরনিন্দা পরচর্চা করে বেড়াতে তাঁর মানসিকতাতে বাধে।

তবে আগে 'হেল্‌থ কনশাস' বুড়োদের যতখানি অনুকম্পার চোখে দেখতেন এখন আর তা পারেন না। শরীর নানারকম বেগড়বাই শুরু করেছে।

অনেকের কাছেই শোনেন, সন্তানদের মধ্যে মেয়েরা না কি ছেলেদের চেয়ে অনেকই বেশি দেখে বাবা-মাকে, বুড়ো বয়সে। তাঁর ছেলেমেয়েই নেই, তার বাছবিচার! কত দিন বাঁচতে হবে তা তো জানা নেই। বার্ধক্যে কার শরণাপন্ন হবেন? জীবনে অনেক যুদ্ধই জিতে এসেছেন, সত্যি কথা বলতে কি, কোনও যুদ্ধেই হারেন নি। হারতে ভালবাসেন নি। কিন্তু ভয় হয়, বার্ধক্যর কাছে বোধহয় হেরে যাবেন। আর সেই হার হবে বড় মর্মন্তুদ।

অনন্তরূপ, তাঁর সমবয়সী মামাতো ভাই, একটা আমেরিকান অ্যাড কোম্পানিতে বড় চাকরি করতেন। অনেক টাকা নিয়ে রিটায়ার করেছেন। এক ছেলে। সে স্টেটস-এ থাকে, জাপানি মেয়ে বিয়ে করেছে। অনন্তর পারকিনসনস্ ডিজিজ হয়েছে। হাত কাঁপে, জামাকাপড় পরতে পারে না, কথা জড়িয়ে যায়, কি বলে, তা বোঝা যায় না। অনন্তর ছোড়দা বলে, খুব কম অন্যায় তো করে নি অন্তু মানুষের ওপরে। সব শুধে যেতে হবে। এখানেই শুধতে হবে। তাই গুণাগার দিচ্ছে অন্তু।

ল'কলেজের বন্ধু বিমলেন্দুর স্ত্রী তাকে ছেড়ে চলে গেছিলেন অন্য একজনের সঙ্গে। অনেকদিনই হল। তারপরে সেই সুন্দরী মহিলা মারাও গেছেন আজ বছর কুড়ি। ওর দু'মেয়ে। কিন্তু বিয়ে হয়েছে। তারা নিজের নিজের সংসার ও চাকরি নিয়ে থাকে। বিমলেন্দু প্রায় অন্ধই হয়ে গেছে। চেন্নাইয়ে নেত্রালয়ে নিয়ে গেছিল মেয়েরাই। হরপ্রসাদ মক্কেলদের বলে তাদের চেন্নাইয়ে থাকার এবং গাড়ির বন্দোবস্ত করে দিয়েছিলেন। কিন্তু কিছুই হয় নি। বিমলেন্দু অন্ধই আছে। দেখতে পায় না। দু'মেয়ের একজন প্রায় রোজই এসে ওকে দেখে যায় রিলিজিয়াসলি। কিন্তু বিমলেন্দু বলছিল ফোনে সেদিন, বুঝলি হরু, ওরাও আমাকে নিয়ে হয়রান। দুসস্, এই জীবন রাখতে ইচ্ছে করে না রে। মনে হয়, আত্মহত্যা করে মরে যাই।

বিমলেন্দুকে কখনও কখনও গাড়ি পাঠিয়ে রাজপুরে নিয়ে আসেন। তবু ওর পক্ষে আসা মুশকিল। সঙ্গে সব সময় একজনকে লাগে। রিফ্লেক্সও ঢিলে হয়ে গেছে।

মনে হওয়া আর করা এক নয়। অমন তো হরপ্রসাদের মনে হয় মাঝেমাঝেই। আত্মহত্যা করা কাপুরুষদের কাজ আদৌ নয়। অত্যন্তই সাহস লাগে আত্মহত্যা করতে। এখন মনে হয় হরপ্রসাদের।

কে জানে! সত্যিই কি পাপ-পুণ্যের হিসেব-নিকেশ এখানেই করে যেতে হবে? পরজন্ম-টরজন্ম সব বোগাস? পুণ্যের প্রাপ্তি, পাপের গুণাগার সব এখানেই?

অনেকে বলে ঈশ্বরচিন্তা করতে। কোনও গুরুটুরুর কাছে যেতে। কলেজের বন্ধু যতীন, সাঁইবাবার ভক্ত হয়েছে। সেদিন এসেছিল। সাঁইবাবার একটি ছবি আর কিছুটা ভষ্ম দিয়ে গেছে। বলেছে, কাছে রাখিস, কোনও বিপদই তোকে ছুঁতে পারবে না।

অনিমেষ, অনুকূল ঠাকুরের শিষ্য হয়েছে। প্রায়ই দেওঘরে যায়। বলে, মহানন্দে আছি রে হরে। যাবি নাকি তুই? 'জয় ঠাকুর!' কথায় কথায় 'জয় ঠাকুর' বলে।

হরপ্রসাদ হেসেছেন। বলেছেন মন এখনও করে নি, করলে, তোকে অবশ্যই বলব।

বিজিতেন লোকনাথবাবার শিষ্য হয়েছে। চাকল্যাধাম না কোথায় যেন যায় স্ত্রী-শাশুড়ি ছেলেমেয়ে সকলকে নিয়ে গাড়ি বোঝাই করে সপ্তাহান্তে। বলে জানিস, বড় শান্তি পাই রে।

শান্তির নানা রকম আছে। প্রতিটি মানুষের শিক্ষা, মানসিকতা ছেলেবেলা থেকে তাকে একজন আলাদা মানুষ করে গড়ে তোলে। প্রত্যেকেরই আদল আলাদা আলাদা হয়। এক খাপে অন্যে আঁটে না। হয়ত সেই কারণেই তারা মানুষ, জানোয়ার নয়।

কারোকেই ছোট বলে ভাবেন না হরপ্রসাদ, তবে ছাপ্পান্ন বছর বয়সে পৌঁছে একথাটা বোঝেন যে, তিনি অন্যদের থেকে আলাদা। বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি তাঁর হবে না। অথচ কিসে যে হবে, তা তিনি নিজেও জানেন না। 'মুক্তি' বলতে ঠিক কী যে বোঝায় তা নিয়েও বিশেষ চিন্তাভাবনা করেন নি।

মাঝরাতে 'বল হরি হরি বোল্' ধ্বনি দিতে দিতে পথ দিয়ে কোন মৃতদেহ

নিয়ে গেলে হঠাৎ ঘুম ভেঙে উঠে বসে ভাবতে বসেন হরপ্রসাদ, কোথায় যাচ্ছে মানুষটা? আধুনিক বিজ্ঞান বলে, কোথাওই যাচ্ছে না। এখানেই সব শেষ। সেই শেষ কবে আসবে তাঁর? মানুষ অনেকই দেখেছে, জেনেছে, কিন্তু কার শেষ কখন যে আসবে সেই জ্ঞানটা তো কারও ভাঁড়ারেই নেই।

একথা ঠিক যে, এইসব ভাবনা হয়ত উনি ব্যাচেলর বলেই, একা বলেই, প্রায়ই আসে মনে। ভয় ভয় লাগে। আর লাগে বলেই, ওই মেয়েটি, দেবী, তার সঙ্গে হঠাৎ আলাপিত হওয়ার পরে তারুণ্যর উষ্ণতা ও দীপ্তির চমক দিয়ে অন্য এক জগতের আভাস দেয়. সে এবং তার লিভ টুগেদারের দুই সঙ্গীর কাছেই, ওই থ্রী-মাস্কেটিয়ার্স-এর কাছেই বোধহয় হরপ্রসাদের পুনর্যৌবনের মুক্তির মন্ত্র আছে। দিন বদলে গেছে, পৃথিবী পাল্টে গেছে। কতখানি যে পাল্টে গেছে তা সামান্য দূরে, দমদম-এর নাগের বাজারের, একটি মড পরিবারকে জেনেই তিনি বুঝতে পারছেন।

অবাক লাগছে হরপ্রসাদের। যে আধুনিক জগৎ সম্বন্ধে তাঁর কোনও ধারণা নেই সেই জগৎ সম্বন্ধে তীব্র এক আকর্ষণ বোধ করতে থাকলেন উনি ফোনটা আজ ছাড়বার পর থেকেই।

২

বাঃ। কোচটা তো একেবারে নতুন।

এইচ. পি. বললেন।

তা তো হবেই স্যার।

দেবী বলল।

কেন? তা হবেই কেন?

এখন রাঁচি তো একটি রাজ্যের রাজধানী। ঝাড়খণ্ডের রাজধানী নয়? তাই রাঁচির ট্রেনকে উপেক্ষা করলে আর চলবে না। আগে আগে সাউথ ইস্টার্ন রেলের যত ওঁচা কোচ সব ঠেলে দিত রাঁচি এক্সপ্রেস আর পুরী প্যাসেঞ্জারে।

এ সি কোচও?

সব সব। ফারস্ট ক্লাস, এ সি সব কোচই। রেলের অনেক উন্নতি হচ্ছে। হয়ত আরও হবে। আপনি শিয়ালদহ থেকে যে রাজধানী ছাড়ে তাতে কখনও চড়েছেন স্যার। ভাবা যায় না। উনিফর্মড বেয়ারারা হাতে গ্লাভস পরে দারুণ খাবার সার্ভ করছে, পলিথিনের ব্যাগে করে বেডশিট তোয়ালে পিলোকেস দিচ্ছে, মিনারাল ওয়াটারের বোতল।

কোন ক্লাসে? এ সি ফারস্ট-এ?

না, না এ সি থ্রি টায়ারেই। আমি জীবনে এ.সি. ফারস্ট ক্লাস-এ চড়েছি না কি? এই তো প্রথম চড়লাম আপনার দৌলতে। তবে মানে হয় না কোন এত পয়সা নষ্ট করবার।

আমি তো মোটা মানুষ। তা'ছাড়া, পয়সা তো খরচ করারই জন্যে। পয়সা জমিয়ে রাখলে তা কাগজই হয়ে থাকে। জমানো পয়সা হয়ত কোন কোন অশিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত আত্মবিশ্বাসহীন মানুষের শ্লাঘা বাড়ায় কিন্তু পয়সাকে কে কোন কাজে ব্যয় করে তার ওপরেই পয়সার সার্থক হওয়া না হওয়া নির্ভর করে। তা'ছাড়া, সারাটা জীবন অনেকই পরিশ্রম করেছি। জীবনে তোমরা যাকে 'সফল হওয়া' বলো, তা হতে অনেকই মূল্য দিয়েছি। জীবনের সবচেয়ে সুন্দর সব দিনে নিজেকে অনেকই সুখ, অনেকই আনন্দ থেকে বঞ্চিত করেছি তাই আমার মনে হয়, এই সাঁঝবেলাতে পৌঁছে এইরকম কিছু কিছু আরামের যোগ্যতা আমি হয়ত অর্জন করেছি।

অবশ্যই! আমি আমার নিজের কথাই বলছিলাম। কিছু মনে করবেন না স্যার।

না, না মনে করব কেন?

তা'হলে চড়বেন একবার শিয়ালদহ থেকে ছাড়া রাজধানীতে।

ট্রেনে চড়ি কোথায়? আজকে তোমার পাল্লায় পড়ে ট্রেনে চড়ছি, তাও সস্তুক

বছর পনেরো পরে। নইলে সব জায়গায়ই তো প্লেনেই যাতায়াত করতে হয়। সময় কোথায় সময় নষ্ট করবার।

ক'টা বাজল স্যার?

সাড়ে নটা। কেন? তোমার ঘড়ি নেই?

থাকবে না কেন? আছে। ব্যাটারিটা বদলাতে দিলাম কিংশুককে। তা ভুলেই গেল।

তোমাকে একটা ভাল ঘড়ি দেব।

দেবেন কেন? একটা তো আছেই। অপচয় করবেন না। তা'ছাড়া আমি যত ভাল আমার ঘড়ি তার চেয়ে বেশি ভাল হলে দৃষ্টিকটু দেখাবে না!

আরেকটা কাটলেট খাও। আমার বাবুর্চি ইদ্রিস আলি রান্নাটা ভালই করে। ইংরেজি, মোগলাই, চাইনিজ যা বলবে রেঁধে দেবে। তবে বাঙালি রান্না এখনও শিখল না।

কেন?

শেখাবে কে?

তাই? তা আপনি বাঙালি রান্না কি কি খেতে ভালবাসেন?

সেসব কথা থাক। তুমি খাও তো এখন। পুডিংটা খেও। সুইট-ডিশও খুব ভাল করে ইদ্রিশ।

আপনি তো কিছুই খেলেন না।

খাদ্য আমি রাতে কমই খাই। দুটি হুইস্কি খাই। দেখছ'তো খাচ্ছি।

হ্যাঁ। তা তো দেখছিই। কি হুইস্কি খান আপনি?

তুমি কি নাম জানো নাকি?

না, ওরা মাঝেমধ্যে খায় তো।

ওরা কি খায়?

রয়্যাল স্ট্যাগ। শিঙাল হরিণের ছবি দেওয়া বোতলে।

হেসে ফেললেন এইচ. পি.।

বললেন, তাই?

তারপর বললেন, ওটা দেশী। তবে শুনেছি ভালই।

আপনি দেশী খান না?

উনি হেসে বললেন, এমনিতে আমি খুবই দেশপ্রেমী কিন্তু হুইস্কির বেলাতে নই। হুইস্কি বলতে স্কটল্যান্ডের হুইস্কিই বুঝি। আমার নিজের কিনতেও হয় না। প্রতি সপ্তাহেই কোনও না কোন মক্কেল বিদেশে যান, নিয়ে আসেন আমার জন্যে। নিজে আর কতটুকু খাই। কখনও পার্টিটাটি দিলে অন্য কথা।

পেছনে বালিশ নিয়ে পায়জামা-পাঞ্জাবি পরে বসেছিলেন এইচ. পি.।

এককালে হ্যান্ডসাম ছিলেন। মানুষে বলত। এখন বয়স এসে অনেক কিছুই একে একে ছিনিয়ে নিয়েছে। পারে নি শুধু মনটাকে। মনের মধ্যে এখনও একটি কুড়ি-একুশ বছরের তরুণ বাস করে। তবে সে বড় লাজুক। মুখ লুকিয়েই থাকে। কখনও সখনও চারদিকে যে কেউ নেই তা দেখে নিয়ে চুপিসাড়ে মুখ বের করে।

তবু সে যে আছে, থাকে তাঁর হৃদয়ে, নীরবে এবং গোপনে এই কথাটা জেনেই খুবই আনন্দ হয় এইচ. পি. চ্যাটার্জির। সে বুকের মধ্যে না থাকলে, সত্যিই একেবারেই বুড়ো হয়ে যেতেন।

তুমি যে আমার সঙ্গে ট্রেনের ক্যুপেতে ট্রাভেল করছ, তোমার ভয় করছে না? আমি বুড়ো হলেও তো এমন বুড়ো নই! মেয়েদের ক্ষতি করার ক্ষমতা তো এখনও যায় নি আমার।

খুব জোরে হেসে উঠল দেবী, খাওয়া থামিয়ে। বলল, আপনি যেটাকে আমার ক্ষতি ভাবছেন সেটা তো আমার লাভও হতে পারে। কিন্তু আমি অথবা আপনি তো জন্তু-জানোয়ার নই যে সুযোগ পেলেই শারীরিক সম্পর্ক ঘটে যাবে আমাদের মধ্যে। আমরা মানুষ। দু'জন মানুষের মধ্যে শারীরিক সম্পর্ক হওয়ার আগে কত সময়ের, বিবেচনার দরকার। আমরা যে দারুণই কমপ্লিকেটেড জীব। মনের মিল হতে হবে, তারপরে সহমর্মিতা, তারও পরে রুচির মিল, তারপরেও সোহাগ, শৃঙ্গার, আদর। এ সবকিছুর পরেই তো বড় আদর। কত মাস বছর কেটে যায় এই সব প্রসেসে। সত্যি! বিধাতা মানুষকে বড়ই গোলমেলে করে গড়েছেন।

বলেই বলল, আপনার হঠাৎ এ কথা মনে হল কেন স্যার?

আমার মনে ঠিক হয় নি। তোমার মনে কিছু হল কি না তারই খোঁজ করছিলাম। তুমি এব্যাপারে আশ্বস্ত না হলে রাতেও নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারবে না যে!

ক্যারামেল কাস্টার্ড পুডিংটা খেতে খেতে হাঃ করে হাসল, দেবী।

বলল, আমি তো ধোওয়া তুলসী পাতা নই। অনাঘ্রাতাও নই। আপনি তো জানেনেই যে আমি মিনি-দ্রৌপদী। তবে আমি ধোওয়া তুলসী পাতা নই বলেই যখনই ইচ্ছে যে কেউ বাজার থেকে কিনে নিয়ে গিয়ে পুজোয় লাগাবে তাও হবার নয়। আসলে, আপনি আমার আই কিউ-এর লেভেল বড় নিচু বলে মনে করেছিলেন স্যার ভুল করে। আপনাকে সারাঙ্গাতে নিয়ে যাব বলে ঠিক করার অনেক আগেই আপনাকে আমি বুঝে গেছিলাম। আপনার দ্বারা কোন কুকর্ম হবে বা না হবে, সে সম্বন্ধে আমার স্বচ্ছ ধারণা না থাকলে আপনাকে সারাঙ্গাতে নিয়ে যাওয়ার কথা বলতামই না। এতো রেলগাড়িরই বদ্ধ কামরা, হোক না সুন্দর বিছানা-পাতা, গদী-আঁটা, হোক না এয়ার কন্ডিশনড। প্রকৃতির মধ্যে যখন থাকব আমি আর আপনি একই ঘরে, সেই সাংঘাতিক অভিঘাতও যখন আপনার সয়ে যাবে বলে আমার বিশ্বাস, তখন এই ট্রেনের ক্যুপেতে কোনও অঘটন ঘটবে না। আসলে আপনাকে যে কারণেই হোক আমি এমন এক জায়গাতে বসিয়েছি আমার মনের, এমন এক উঁচু কুলুঙ্গিতে যে, সেখান থেকে মাটিতে নেমে অন্য দশজন সাধারণ পুরুষের মতো পুরুষ আপনি কখনওই হতে পারবেন না।

তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল, দেবীর বয়স কম হলে কি হয়, এ পর্যন্ত যে অনেকই পুরুষের পুজো পেয়েছে, গ্রহণ করেছে কি করে নি, সেটা অবান্তর। তাই এই সব সামান্য ও তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে আপনি মোটেই মাথা ঘামাবেন না। কিংশুক আর অন্তুর সঙ্গে তো আমি লিভ টুগেদার করিই। আপনি আমার স্বপ্নের

মানুষ। আমি চাই আপনি স্বপ্ন হয়েই থাকুন। আপনার আদর যদি কখনওই খাই তো স্বপ্নেই খাব। আপনি আমার চেয়ে বয়সে অনেকই বড়। আপনিও নিশ্চয়ই নানা অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে হেঁটে এসেছেন এতগুলো বছর। আপনারও কি মনে হয় না যে স্বপ্ন, বাস্তবের চেয়ে সব সময়েই বেশি সুন্দর?

মনে হয়। কিন্তু মনে মাঝে মাঝে এ সংশয়ও জাগে যে, শুধু স্বপ্ন নিয়েই কি জীবন কাটানো যায়? বিশেষ করে, জীবন যখন শেষই হয়ে এসেছে।

অবশ্যই যায় স্যার। আমি পারি নি ফিনান্সিয়াল কারণে।

এইচ. পি. হুইস্কির গ্লাসটা শেষ করে বললেন তুমি তো ভারি সুন্দর কথা বল। তুমি লেখালেখি করো না কেন?

কথা বলতে পারলেই কি লেখা যায়? শুধু কথায় ভার থাকে না। শুধু কথা গেঁথে গেঁথে লিখে যুক্তিহীন অর্থহীন টিভি সিরিয়ালের স্ক্রিপ্ট লেখা যেতে পারে, সাহিত্য সৃষ্টি হয় না। কিংশুকের আসার কথা আছে—কথা আছে আগামী পরশু পাটনা থেকে, সারাঙ্গাতে। সেত কবি। সে লিখতে পারে। শুনবেন তার কবিতা।

কবিতা লেখাই ওর প্রফেশান নাকি?

ঠিক তা নয়। কবিতা ওর প্রেম। প্রথম প্রেম। আমি ওর দ্বিতীয় প্রেম। মনে হয়। জানি না ঠিক। ও সম্ভবত বিজ্ঞাপনের কপি-টপি লেখে। ফ্রী-ল্যান্সার। ঠিক কী যে করে তা বলতে পারব না।

কিংশুকের পদবী কি?

বন্দ্যোপাধ্যায়।

কিংশুক বন্দ্যোপাধ্যায়।

নিজের মনে বললেন এইচ. পি.। নামটা তো চেনা মনে হচ্ছে না।

কি করে হবে। ওতো লেখে লিটল ম্যাগ-এই। তা'ছাড়া কবি তো এখন বাংলা ভাষায় আছে কয়েক হাজার। মানে, যাঁরা নিজেদের কবি বলে ভাবেন। স্বঘোষিত কবি আর কি! দেশে জনসংখ্যার বিস্ফোরণ হয়েছে অবশ্যই কিন্তু কবিদের জনসংখ্যাতে যে বিস্ফোরণ ঘটেছে গত ত্রিশ বছরে, মানে আমার জন্মের সময় থেকেই, তার কোনও নজির নেই। শুনেছি, স্বয়ং শক্তি চট্টোপাধ্যায়ও একবার লিখেছিলেন, বড় বেশি কবি হয়ে গেছে এখানে।

এইচ. পি. বললেন, তাই বুঝি?

তাই তো শুনেছি।

নীল নাইট-লাইটটা কি জ্বালিয়েই শোবে? না কি সব আলো নিভিয়ে দেবে?

আপনার কিসে সুবিধা?

সব আলো না নিভিয়ে আমি শুতে পারি না, তবে তোমার অসুবিধে হলে নাইট-লাইটটা জ্বালিয়েই রেখো।

আমি তো ওপরের বার্থে শোব। যদি রাতে বাথরুমে যেতে হয়, নামতে গিয়ে আপনার ঘাড়ে পড়লেই চিত্তির। যদিও সুন্দর সিঁড়ি লাগানো আছে।

তবে, জ্বেলেই রেখো।

আপনি শুয়ে পড়বেন এখন?

কেন? তুমি কি জেগে থাকতে চাও?

বেশিক্ষণ নয়। একটা রিপোর্ট জমা দিতে হবে দে সাহেবকে। সেটাতে একবার চোখ বুলিয়ে নিতাম। মাথার কাছের রিডিং ল্যাম্প জ্বালিয়ে পড়ে নেব। আপনার অসুবিধে হবে না।

দে সাহেব কে?

প্রফেসর ইন্দ্রজিৎ দে। তিনি আর তাঁর স্ত্রী সুমিতাদিই তো সোসাইটি ফর রুরাল ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন চালান। রাঁচির বারিয়াতুতে ওঁদের ক্রিয়াকাণ্ড দেখলে আপনার চোখ জুড়িয়ে যাবে। এন জি ও। ওঁদের সঙ্গে আমাদের টাই আপ আছে। সুমিতাদির ইউনিটটির নাম অবশ্য অন্য।

কি তা?

“ভূমিকন্যা”।

বলেই বলল, আমি একবার বাথরুম থেকে ঘুরে আসি। পা-টা ভাল করে না ধুলে আমার ঘুম আসে না।

খুবই ভাল অভ্যেস। শুধু পা-ই কেন, গোড়ালি, হাঁটু, হাঁটুর উল্টোদিক, কনুই, কব্জি, ঘাড়, কানের পেছন এসব জায়গাতে জল লাগিয়ে শুলে খুব ভাল ঘুম হয়। তবে চান করতে পারলে সবচেয়ে ভাল। আমি তো সারা বছরই রাতে গরম জলে চান করি।

তাই? তো সারাঙ্গাতে কি হবে? ওখানে তো গিজার-টিজার নেই।

তারপরে বলল, ঠিক আছে। ক্যানেস্তারা করে জল গরম করে দিতে বলব। আর সব কিছুর অভাব অবশ্যই আছে কিন্তু লোকবলের তো অভাব নেই আমাদের। বলেই বলল, তা'হলে আমি যাই?

যাও। তুমি এলে আমি একবার যাব।

বাথরুমে যেতে যেতে দেবী বলল, নীল আলোটা নিভিয়েই দেব। আপনার যখন অসুবিধে হয়। রাতে আমি উঠিই না বলতে গেলে। যদির কথা ভেবেই বলেছিলাম। উঠলে, তখন বাতিটা জ্বালিয়ে নেব।

দেবী চলে গেলে এইচ. পি. লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লেন। পা দুটো ভিতরে করে নিলেন যাতে দেবী ফিরে এসে ইচ্ছে করলে বসতে পারে? পায়ের কাছে ভাঁজ করা সাদা চাদর আর নতুন কম্বল। যখন ঠাণ্ডা লাগবে তখনই গায়ে দেবেন। আজকাল একাধারে স্পন্ডিলাইটিস, অন্যধারে সাইনাসাইটিস-এ ভারি কষ্ট পাচ্ছেন। কাজের জন্যে চেম্বারে এ সি তো চালাতে হয়ই কিন্তু এসবের ভয়ে শোবার ঘরে সারা রাত চালাতে পারেন না। ঘরটা ঠাণ্ডা হয়ে গেলেই বন্ধ করে দেন। কিন্তু বন্ধ ঘরে অক্সিজেনের অভাবে বুকে কষ্ট হয়। ডাক্তার বলেছেন স্লিপ অ্যাপনিয়ার জন্যে কাত হয়ে শুতে। চিৎ হয়ে না-শুতে। ওজনটা বেড়ে যাওয়াতেই নানারকম অসুবিধেতে পড়েছেন। ওজন কমবার কোন সম্ভাবনাও তো দেখছেন না। মা বাবা দু'জনেই মোটা ছিলেন। গোপেন গাঙ্গুলি রোগা হওয়ার ওষুধ অ্যামেরিকান ‘গোলা’ খেয়ে অনেক কেজি কমেছে, প্যান্ট ঢিলে হয়ে গেছে। কিন্তু এইচ. পি. অনেক অনুরোধেও খান নি। ভগবান যাকে যেমন গড়ন দিয়েছেন। রোগা-মোটা, বেঁটে-

লম্বা, ফর্সা-কালো করে গড়েছেন তিনি মানুষকে। খামোখা খোদার ওপর খোদকারী করার দরকার কি?

দেবী বাথরুমে চলে যাবার পরে ক্যুপের মধ্যে তার শরীরের হালকা পারফিউমের গন্ধ পেলেন এইচ. পি. এয়ার কন্ডিশনারের ঝিরঝিরে হাওয়ায়। রাতে ঠাণ্ডাটা কমাবার ব্যবস্থা করতে হবে। এখুনি কোচ অ্যাটেনডেন্টকে বলে রাখতে হবে। তিনি নিজে ডাবল-কম্বল গায়ে মাথা ঢেকে ঘুম লাগালেই চিত্তির।

এই সুগন্ধে বেশ একটা ঘোর ঘোর লাগছে এইচ. পি.-র। পারফিউমের গন্ধ ছাড়াও দেবীর শরীরেরও কি আলাদা কোনও গন্ধ আছে? কোন যুবতীর এত কাছে তো বহুদিন থাকেন নি। মৃগেনের বউকে তিনি রমণ করেছিলেন বার কয়েক অবশ্যই, তাও বছর পঁচিশেক আগে কিন্তু তাকে রমণীজ্ঞানে কখনও দেখতে পান নি, দেখেছিলেন এক কামুক ডাইনি হিসেবে।

যদি উনি বিয়ে করতেন যৌবনে, যখন সকলেই করে, তা'হলে ফুলশয্যার রাতে কি এমনই গন্ধ-মেদুর অনুভূতি হতো? সুগন্ধি অন্ধকার ঘরে একটি যুবতীর সঙ্গে এমন ভাবে রাত কাটান নি কখনও। রীতিমত উত্তেজনা বোধ করছেন উনি। যদিও দেবী তাঁর সঙ্গে শোবে না, শোবে উপরেই, তবু এই সান্নিধ্যও তো অভূতপূর্ব। দেবীর চুড়ির রিনঝিন, পায়ের পাঁয়জোর-এর শব্দ নিঝুম রাতে কানে আসবে। ঘুম কি আসবে তাঁর? রবীন্দ্রনাথের লেখাতে পড়েছিলেন, কোন কবিতাতে তা মনে নেই,

"রাতের রেলগাড়ি, দিল পাড়ি
গাড়ি ভরা ঘুম, কামরা নিঝুম।"

ঘুম কি আজ আসবে এইচ. পি.-র?

দেবী ফিরে এলে উনি চটিটা গলিয়ে বাথরুমে গেলেন। ফিরে এসে দেখেন দেবী তাঁর পায়ের কাছের চাদর পেতে তার ওপরে কম্বল বিছিয়ে সুন্দর করে ভাঁজ করে দিয়েছে, ফাইভ-স্টার হোটেলে যেমন ভাবে করে "হাউস-কীপিং"-এর লোকেরা।

দেবী বলল, জল রইল মাথার কাছে। হাত বাড়ালেই পাবেন।

তোমার জলের বোতলটা ওপরে তুলে নিয়েছ তো?

হুঁ।

তারপরে স্বগতোক্তির মতো বললেন, সোহনলালবাবু গাড়িটা পাঠালে হয় স্টেশনে। রাঁচি স্টেশন থেকে কতক্ষণ লাগবে তোমার সারাঙ্গা পৌঁছতে?

ভাল ড্রাইভার হলে ঘণ্টা আড়াই।

বলেই প্রশ্ন করল, সোহনলালবাবু কে?

সোহনলাল ব্যাহেল। আচ্ছুরাম কালকাফফ্, লাক্ষা কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

ও। ওঁদের নাম তো শুনেছি। রাঁচি থেকে চক্রধরপুরের যাওয়ার রাস্তায় খুঁটি

পেরিয়ে মুরহুতে তো ওঁদের মস্ত কারখানা আছে না লাক্ষার? ওই জায়গাটার নাম হচ্ছে তো আচ্ছুরামপুরী।

তুমি জানলে কি করে?

আমাদেরই একটি ইউনিট তো ওখানে আদিবাসীদের মধ্যে কাজ করছে, তাই জানি। যদিও আমি যাই নি সেখানে কখনওই। কিন্তু আমার বন্ধু সুদীপ এখন খুঁটিতেই আছে। আপনি কি গেছেন স্যার? ওদের তো গেস্ট হাউসও আছে শুনেছি ভাল।

এইচ. পি. মাথা নাড়লেন। বললেন, নাঃ যাই নি। আচ্ছুরাম, সোহনলালবাবুর বাবার নাম। জার্মান কোলাবরাশানে কোম্পানিটি ফর্ম করেছিলেন উনি। উনি অনেকবারই বলেছেন যদিও। সেখানে ইংলিশ জার্সি গরু আছে। তার দুধ-ঘি-দই খাওয়াবেন বলেছিলেন। নিরামিষ, কিন্তু খুব ভাল খাওয়া।

গেলেন না কেন? যদি কখনওই যাঁন তবে ওই অঞ্চলের মুণ্ডাদের নিয়ে লেখা 'সাসানডিরি' নামের একটা উপন্যাস অবশ্যই পড়ে নেবেন। এ অঞ্চলের বিপজ্জনক ডি-ফরেস্টেশান এবং মুণ্ডারী সংস্কৃতির বিনাশের কথা তাতে আছে।

তারপরে বলল, গেলেই তো পারেন একবার।

বুঝলে দেবী। ওপরওয়ালার মতো জবরদস্ত অ্যাকাউন্ট্যান্ট আর দুটি দেখলাম না। এক হাতে তিনি দেন আর অন্য হাতে নিয়ে নেন। একটা ডেবিট হলে সঙ্গে সঙ্গে একটা ক্রেডিটও হয়। ওঁরই অঙ্গুলি হেলনে। ভারতবর্ষে এমন কম জায়গাই আছে যেখানে ব্যারিস্টার এইচ. পি. চ্যাটার্জি যেতে চাইলে স্টেশনে বা এয়ারপোর্টে এয়ারকন্ডিশনড গাড়ি থাকবে না, থাকা-খাওয়া-ঘোরার দুর্দান্ত বন্দোবস্ত থাকবে না, কিন্তু সময় কোথায়? সময়ই যে জীবনে সবচেয়ে দামি সে কথা এই পরিণত বয়সে এসে যতটা বুঝি অল্প বয়সে ততটা বুঝি নি।

তারপর বললেন, তুমি যেতে চাও তো বোলো আমাকে। তোমরা তিন জনেই যেয়ো না। এই পুজোতে যাবে? সব বন্দোবস্ত করে দেব। স্টেশন থেকেই ওদের কেউ এসে তোমাদের নিয়ে যাবে। ভি আই পি ট্রিটমেন্ট দেবে।

দেবী খুশি হয়ে বলল, বলব। আসলে ওই অঞ্চলই তো বিরিসামুণ্ডার উলগুলান-এর জায়গা। অনেক কিছু দেখার আছে ওদিকে। লুথেরান মিশন আছে। জার্মান মিশন। ফাদার হফফ্ম্যানের জায়গা। কত পড়েছি ফাদার হফফ্ম্যান সম্বন্ধে।

বাবাঃ। তুমি কত কি জানো। ছোট্ট মেয়ে হলে কি হয়! তোমাদের জ্ঞান-গম্মিই আলাদা। একবার যাও। তোমাদের তিন জনকে এই Treat-টা দিতে পারলে আমার খুব ভাল লাগবে।

আমাদেরও খুব ভাল লাগত এক সঙ্গে যেতে পারলে কিন্তু তিন জনের এক সঙ্গে হওয়াটাই যে প্রচণ্ড অসুবিধের। আমাদের তিন জনেরই কাজের রকম এমনই যে, কী বলব! অথচ কাজ তো না করলেই নয়। তবে শুধু যে টাকার জন্যেই কাজ করি এমনও নয়। নেশাও বলতে পারেন। সত্যি! বাবা বা মামা যদি বেশ কয়েক লাখ ব্যাঙ্কে রেখে যেতেন তবে এই ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্যে এমন হন্যে হয়ে ঘুরতে হতো না।

শুধুই কি পেটের অন্নর জন্যেই খাটো? মনে তো হয় না। তুমি, যেই তোমার স্বামী হোক না কেন, তার রোজগারেই অবহেলায় তার বাড়িতেই থাকতে পারতে। হাউস ওয়াইফ হয়েই না হয় থাকতে। থাকো না যে তার কারণ অন্য। আমার মনে হয়, এত হাজার বছরের পরে তোমরা যে স্বাধীনতার স্বাদ পেয়েছ, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, চিন্তা-ভাবনা, সঙ্গী নির্বাচন, ব্যক্তিগত সেক্স-লাইফের স্বাধীনতা তা তোমরা পুরোপুরি উপভোগ করতে চাও। সে জন্যে তোমরা অনেক কিছুই ছাড়তে রাজি আছ এবং ছাড়ছোও। তোমাদের এইসব কষ্ট স্বীকার যে আনন্দরই এক অন্য রূপ, অন্য অভিব্যক্তি, তা এই মুহূর্তে তোমরা হয়ত বুঝতে পারছ না কিন্তু তোমাদের উচ্ছ্বাস, এই স্বাধীনতার ঢেউয়ে ঢেউয়ে চূর্ণীত জীবনের ফেনা যখন থিতিয়ে আসবে তখন অবশ্যই বুঝতে পারবে। আমি তো এইসব নিয়েই বলেছিলাম তোমাদের সেদিনের সেমিনারে।

সত্যি! যদিও আপনি সোশ্যালজির পণ্ডিত নন, কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানও না, আমাদের, মানে, অল্পবয়সী মেয়েদের স্বাধীনতার স্বরূপের ব্যাখ্যা সেদিন আপনি যেমন প্রাঞ্জল করে আপনার বক্তৃতাতে দিলেন তাতে আমরা তো বটেই আমি যে কলেজে পড়তাম এবং অন্যান্য নানা কলেজের অধ্যাপক-অধ্যাপিকারাও মুগ্ধ। দূর থেকে দেখে এমন অ্যানালিসিস যে করা আদৌ যায় তা ভেবেই ওঁরা চমৎকৃত। তাও যদি আপনি সাহিত্যিক-টাহিত্যিকও হতেন। জীবনের নানা দিককে যাঁরা দেখেছেন, ভেবেছেন, ছিঁড়েছেন, লিখেছেন তা'হলেও না হয় বোঝা যেত।

আমরা যাঁরা মনোযোগ দিয়ে ওকালতি করি তাঁরা কিন্তু সাহিত্যিকদের চেয়ে কিছু কম জানি না মানুষের জীবনকে। আইন ব্যাপারটাই দাঁড়িয়ে থাকে ফ্যাক্টের ওপরে। ফ্যাক্ট যদি ডিসটিংগুইশ করতে পারো তাহলে আইনের প্রয়োগ ভিন্ন রকম হবে। আর সে কারণেই প্রত্যেক কেস-এরই এই ফ্যাক্টকে আলাদা করে জানতে গিয়েই অনেক গভীরে যেতে হয়, অনেকই বিভিন্ন জগতে ঢুকতে হয় আমাদের। আর এই করে করেই মানুষকেও জানতে পারা যায়। আমরা কলম ধরলে অনেক সাহিত্যিকের চেয়েই হয়ত ভাল লিখতে পারতাম।

এই সব Facts কি সব কেসেই আলাদা আলাদা হয়?

নিশ্চয়ই। তবে Facts ভুল ইংরেজি অথচ অনেক উকিল ও জজসাহেব পর্যন্ত এই শব্দটি ব্যবহার করেন।

সে কি! Facts ভুল শব্দ?

ভুলই তো। Fact হচ্ছে Plural, Singular হচ্ছে Factum। যেমন Datum আর Data।

সত্যি? এটা জানতাম না তো। সকলেই ব্যবহার করেন, আমার চেয়ে অনেক জ্ঞানী-গুণীরাও তাই আমিও ব্যবহার করি।

বাজল কটা?

সাড়ে দশটা?

এবার শোবে তো?

ওই। শুয়েই পড়ব। দাঁড়িয়ে তো গল্পও হবে না, পড়াও হবে না।

তার আগে ওই কলিং বেল-এর স্যুইচটা একবার টেপ তো লক্ষ্মীটি।

দেবী বেল-এর স্যুইচ টিপলে একটু পরই অ্যাটেনড্যান্ট এলেন। বললেন, ইয়েস স্যার। কি লাগবে?

লাগবে মানে, ঠাণ্ডাটা বেশ বেশি আছে। একটু পরেই কম করে দিতে হবে।

কোনও চিন্তা নেই স্যার। একটু পরেই অটোম্যাটিক থার্মোস্ট্যাটে দিয়ে দেব। প্রথমে সকলেরই গরম বেশি লাগে তো। তার ওপর প্রতি কম্পার্টমেন্টে যে সব ব্রিফকেস আছে তার মধ্যে বাণ্ডিল বাণ্ডিল হাজার আর পাঁচশ'র নোট। তাদের গরমটার কথাও তো ভাবতে হবে স্যার।

আমাদের ব্রিফ কেস নেই।

নেই যে তা দেখেছি বলেই তো সাহস করে বললাম কথাটা। আচ্ছা স্যার। গুড নাইট। আপনাকে একটা একস্ট্রা পিলো কি দেব? পাশ বালিশ করার জন্যে?

দিলে তো ভালই হয়।

এখুনি দিচ্ছি।

আপনি বুঝি পাশ বালিশ ব্যবহার করেন? দেবী বলল।

করি। আমার তো বৌ নেই যে তার কোমরে পা তুলে দেব। তা'ছাড়া পাশ পালিশ কেন, আমি Neck-Pillowও ব্যবহার করি।

সেটা কি জিনিস?

সাহেবরা বলছে এখন Neck-Pillow কিন্তু আমাদের দেশে এর ব্যবহার বহুদিনের! লক্ষ্ণৌর নবাবেরা একে বলতেন 'গল-তাকিয়া'। মানে, গালের বালিশ। তুমি যখন পাশ ফিরে শোও তখন গালের নিচে হাল্কা ও ছোট্ট বালিশ দিলে আরাম হয়। Neck-Pillow-টা ঠিক গাল-তাকিয়া নয় যদিও। মনে হয়, যাদের স্পন্ডিলোসিস আছে তাঁরা পুরো বালিস ব্যবহার না করে এই ঘাড়ের নিচের ছোট্ট কোলবালিশের মতো গোল বালিস ব্যবহার করলে আরাম পান। আজকাল ক্যামাক স্ট্রিটের West Side-এ কিনতে পাওয়া যাচ্ছে।

দেবী বলল বাবাঃ। কত কি শিখছি আপনার কাছে স্যার।

আমিও শিখছি তোমার কাছে।

দেবী বলল, আমি তা'হলে স্বর্গারোহণ করছি। কিন্তু তার আগে আমার একটা প্রশ্নর জবাব দেবেন?

কি বল?

এতো নাম থাকতে আপনার নাম হরপ্রসাদ কে দিলেন?

হেসে ফেললেন এইচ. পি.। বললেন, আমার এক বালবিধবা পিসী ছিলেন আমাদের বাড়ির সর্বময় কর্ত্রী। খুবই অল্প বয়সে বিধবা হয়েছিলেন বলেই বাবা-কাকারা ওঁর অনেক অপ্রাপ্তির শূন্যতা তাঁকে ভাঁড়ারে চাবি আর এই কর্তৃত্ব দিয়ে পূর্ণ করে দিতে চেয়েছিলেন। তাঁর ওপরে কথা বলেন এমন সাধ্য মা কাকীমাদের কারোই ছিল না। তিনিই আমাদের সকলের নাম দিয়েছিলেন। তিন ভাইয়ের তিন ছেলের নাম হরপ্রসাদ, রুদ্রপ্রসাদ এবং কালীপ্রসাদ। আর মেয়েদের নাম মানদাসুন্দরী, জ্ঞানদাসুন্দরী, মৃণালিনী, কাদম্বরী ইত্যাদি।

এই বিচ্ছিরি নাম নিয়ে আপনার কোন অভিযোগ ছিল না?

ছিল বৈকি। কিন্তু নিজের নাম তো কেউই নিজে রাখে না। তা, একদিন আমার বাবা আমাকে একটি গল্প বলেছিলেন। তারপর থেকে আর কোনও অনুযোগ অভিযোগ ছিল না। তখন আমি ক্লাস থ্রি-তে পড়ি।

কি গল্প? বলে ওপরে ওঠার সিঁড়িতে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল দেবী।

বাবা বললেন, একজন মানুষের নাম ছিল ঠনাঠন দাস।

সে আবার কী নাম!

বিহারী নাম। আমার ঠাকুর্দা অভ্রখনিতে কাজ করতেন বিহারের কোডারমাতে। সাহেবদের কোম্পানি ছিল, ক্রিশ্চান মাইকো কোম্পানি, তাতে। তাই গল্পটির অনুষঙ্গ বিহারী। বাবার ছেলেবেলা ওই অঞ্চলেই কেটেছিল বলে।

গল্পটা বলুন।

হ্যাঁ। তা ঠনাঠন দাসের মনে বড়ই দুঃখ। এমন নাম নিয়ে কেউ বাঁচে? সকলেই তাকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করে, নামেরই জন্যে। তা একদিন এই দুঃখর নিরসন করবে বলে সে নদীতে ডুবে আত্মহত্যা করবে মনস্থ করে নদীর দিকে চলল।

তারপর?

কিছু দূর যাওয়ার পরেই দেখল পথের পাশে এক বাড়ির সামনে জটলা। কি ব্যাপার? না একজন মরে গেছেন। তাঁর চাদরে ঢাকা মৃতদেহ শোয়ানো আছে চৌপায়ার ওপরে। ঠনাঠন দাস জিজ্ঞেস করল, মৃতর নাম কি ছিল? পরিজনেরা বললেন, অমরনাথ।

তারপর?

ভারি অবাক হল ঠনাঠন দাস। যার নাম অমরনাথ সেই না কি মরে গেল যৌবনাবস্থাতেই।

তারপর?

তারপর ঠনাঠন দাস জঙ্গলে ঢুকে নদীর পথ ধরল। আরও কিছু দূর গিয়ে দেখে একটা ছোট হাট মতো। এক জন বুড়ি শতছিন্ন শাড়ি পরে পাহাড়ি ঝোরা থেকে ধরা মাছ তিন ভাগ করে নিয়ে বসে আছে। ঠনাঠন জিজ্ঞেস করল, তোমার নাম কি বুড়ি মা?

বুড়ি বলল, লছ্‌মী।

তারপর?

ঠনাঠন তো আরও ফাঁপরে পড়ল। যার নাম লক্ষ্মী তারই কিনা এই দশা।

তারপর?

ভাবতে ভাবতে ঠনাঠন দাস আরও এগিয়ে যেতে দেখে এক বুড়ো খালি গায়ে একটি ছেঁড়া খেটো ধুতি পরে জঙ্গলের মধ্যে কাস্তে দিয়ে ঘাস কাটছে। সেই ঘাস হয়ত বাড়িতে বয়ে নিয়ে যাবে গরু বা ছাগলকে খাওয়ানোর জন্যে অথবা বিক্রি করে দেবে অন্যকে।

তারপর?

ঠনাঠন দাস জিজ্ঞেস করল, তোমার নাম কী বুড়ো বাবা?

বুড়ো বলল, ধনপত্। শুনে তো ঠনাঠনের অজ্ঞান হওয়ার যোগাড়। যে সাক্ষাৎ ধনপত অর্থাৎ ধনপতি কুবের, তারই না কি এই দশা।

তারপর কি হল? হাসতে হাসতে বলল দেবী।

তারপর ঠনাঠন দাস অ্যাবাউট টার্ন করে বাড়ির দিকে ফিরে যেতে যেতে বলল,

"অমরনাথ যো সো মর গ্যয়ে হ্যায়,
ঔর ধনপত কাটতি হ্যায় ঘাস,
লছমি যো, সো মছলি বিকতি হ্যায়
ভালাই ঠনাঠন দাস।"

দেবী হাসতে হাসতে ওপরে উঠে গেল। উঠে বলল, আমারই জিজ্ঞেস করা অন্যায় হয়েছে। শেকসপীয়রই তো সেই কবে বলে গেছেন What's in a name?

দেবী কালোর ওপরে সাদা পোলকা ডট-এর একটি সালোয়ার কামিজ পরেছিল সিল্কের। সে ওপরে উঠে যাওয়ার আগে তার সুন্দর পায়ের পাতা, দু'পায়ের মধ্যমার রূপোর চুটকি, সুডৌল সুগৌর গোড়ালিতে পাৎলা পাঁয়জোর শুদ্ধু পায়ের ছবিটি এইচ. পি.-র চোখে আঁকা হয়ে গেল। আলোগুলি নিভিয়ে দিল দেবী।

অন্ধকার ক্যাপেতে চোখ খুলে শুয়ে উনি ভাবছিলেন, ওঁর মধ্যে যে এতখানি রোম্যান্টিকতা ছিলই শুধু নয়, আজও বেঁচে আছে সে সম্বন্ধে তাঁর নিজেরই কোন স্পষ্ট ধারণা ছিল না। নিজেকে পুরোপুরি জানেন, ভাবতেন উনি। এখন জানছেন যে, আদৌ জানতেন না নিজেকে। সময়ে বিয়ে করলে তাঁর দেবীর বয়সী কন্যা থাকতে পারত। তাঁর কন্যার প্রতি তাঁর যে মনোভাব, যে অপত্য, তার রকমটা কেমন হতো তা জানার উপায় তাঁর আর নেই কিন্তু দেবীর প্রতি তাঁর যে মনোভাব তার মধ্যেও অপত্য মিশে আছে অনেকখানি এবং সেই অপত্যর সঙ্গে আরও অনেক কিছু মিশে আছে। কিন্তু সেই সব বোধের নাম তিনি নিজেও জানেন না। আশ্চর্য! সারা জীবনেও একজন মানুষ তার সব বুদ্ধি বিদ্যা ও অনুভূতি দিয়েও নিজের কতটুকুকেই বা ধরতে পারে, জানতে পারে। অথচ সে সর্বজ্ঞ মনে করে নিজেকে। রবীন্দ্রনাথের গান মনে পড়ে গেল আবার এইচ. পি.-র। "আপনাকে এই জানা আমার ফুরাবে না, ফুরাবে না/সেই জানারই সঙ্গে সঙ্গে তোমায় চেনা।"

৩

টাটিসিলোয়াই।

টাটিসিলোয়াই স্টেশনে ট্রেনটা দাঁড়িয়েছিল। কোচ অ্যাটেন্ড্যান্ট দরজাতে টক টক করে বলে গেলেন আর কিছুক্ষণের মধ্যেই রাঁচি পৌঁছবে ট্রেন। উঠে বসলেন এইচ. পি.। চেঞ্জ করার কিছু নেই। যে পায়জামা পাঞ্জাবি পরে ট্রেনে উঠেছিলেন তা পরেই নামবেন। শুধু বাথরুম স্লিপারটা ব্যাগে ঢুকিয়ে কাবলিটা পরে নিতে হবে। ক্যুপের মধ্যেই ওয়াশ বেসিন ছিল। লিকুইড সোপ, তোয়ালে, সব। মুখ চোখ ধুয়ে নিলেন।

দেবী উপর থেকেই বলল গুড মর্নিং স্যার।

ভেরি গুড মর্নিং ইনডিড। রাতে ভাল ঘুম হয়েছিল?

ঘুমই হয় নি।

কেন?

ট্রেনে কি ঘুম হয় না কি কারো? তা'ছাড়া সারারাত স্বপ্ন দেখলাম।

সত্যি? কাকে দেখলে স্বপ্নে?

কত'জনকে। তার মধ্যে আপনিও ছিলেন।

তাই? বাঃ। শুনেও ভাল লাগছে। বাস্তবে না থাকলেও তোমার মতো সুন্দরী কৃতবিদ্য যুবতীর স্বপ্নে যে আছি এইটাই বা কম কি?

আর আপনার ঘুম হয়েছিল?

আমি তো একটা অ্যালজোলাম খেয়েছিলাম। রোজ রাতেই খাই।

কত মিলিগ্রাম?

ওয়ান।

ঘুম হয়েছিল তবে?

হ্যাঁ।

আর স্বপ্ন দেখেন নি?

আমি আমার জীবনের এমন একটা পর্যায়ে এসে পৌঁছেছি দেবী যেখানে সব স্বপ্ন শেষ হয়ে গেছে। স্বপ্ন যদি কখনও দেখিও তবেও শুধু অতীতই দেখি। আমার অতীতই সব। ভবিষ্যৎ তো নেইই, বর্তমানও ক্ষীণ হয়ে এসেছে। তা'ছাড়া ঘুমের ওষুধ নিয়মিত খেলে স্বপ্ন দেখার ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়।

বানিয়ে বানিয়ে কথা বলেন আপনি। আপনিও স্বপ্ন দেখেছিলেন, আমি জানি।

উপর থেকে নামতে নামতে দেবী বলল।

আমি বাথরুম থেকে আসছি। তুমি মুখ এখানেই ধুয়ে নাও, দাঁতও মাজতে চাও তো তাও মাজতে পারো, তোমার তোয়ালে বাঁদিকে আছে। আমি আসছি।

ঠিক আছে।

রাতের দেবীর মুখকে এক রকম দেখিয়েছিল। আজ জানালা দুটোর পর্দা সরিয়ে দেওয়ায় সকালের আলোতে তাকে অন্য রকম দেখালো। চুল এলোমেলো, মুখটা সামান্য ফোলা, এ সি'র ঠাণ্ডাতে বোধহয়।

বাথরুম থেকে ফিরে এসে দেখলেন চুল আঁচড়ে, হালকা করে লিপস্টিক দিয়ে ফিটফাট হয়ে গেছে দেবী।

নিজের থেকেই বলল, লিপস্টিক দেওয়া আমি পছন্দ করি না কিন্তু এতো ঠোঁট ফাটে যে বলার নয়।

বেশ করো। দেখতেও ত ভালই লাগে। তুমি কোন কোন শেডের লিপস্টিক ব্যবহার করো তা আমাকে লিখে দিও। আমার মক্কেলদের বলে দেব অনেক এনে দেবে তোমাকে। এক বছরের স্টক।

আপনি স্যার ভীষণই বোরিং।

কেন?

আপনার কোনো অভাবই নেই। অভাববোধ কিন্তু থাকাটা জরুরী।

তাই?

হ্যাঁ, আমার মনে হয়। অভাব না থাকলেও অভাববোধ থাকাটা দরকার।

চাদর ও কম্বলটা ফটাফট পাট করে ফেলে বালিশটার সঙ্গে এক কোনায় করে এক পাশে বসে পড়ল দেবী। এইচ. পি. অবাক হয়ে দেখছিলেন। ভাবছিলেন, মেয়েরা কিছু কিছু কাজ এমন নিপুণভাবে অথচ অবহেলায় করে যে ছেলেরা হয়ত শত চেষ্টাতেও করতে পারবে না। রাতের বেলা তাঁর বিছানার উপরে চাদর ও কম্বল বিছানোর কথাও মনে পড়ে গেল। এই প্রজন্মের পুরুষেরা কি বলবে তা জানেন না এইচ. পি. কিন্তু তিনি বুঝতে পারেন যে মেয়েরা পুরুষের জীবনের কত শূন্যতাই কি আশ্চর্যভাবে পূরণ করে। একথা ভাবলেও আশ্চর্য হন। অথচ তিনি এত বড় ইডিয়ট যে সারা জীবন এক জেদের বশে পেশাতে এক নম্বর হওয়ার জন্যে, পুরুষের জগতে পূর্ণতা আনার সাধনাতে, তাঁর অন্য অনেক জগতই শূন্যই রেখে দিলেন। আজ আর পূর্ণ করার সময় এবং উপায়ও নেই।

ট্রেনটা ছেড়ে দিল। এ সি ফারস্ট ক্লাস-এর কামরা থেকে বাইরের স্টেশনের প্ল্যাটফর্মের বা প্ল্যাটফমের বাইরেরও কোন আওয়াজই শোনা যায় না। বাইরেটাতে নড়াচড়া দেখেই বুঝতে হয় ট্রেন ছাড়ল। হাওড়া-হাটিয়া এক্সপ্রেস টাটিসিলোয়াইতে থামে না, সিগন্যাল না পেয়ে থেমেছিল। কে জানে!

এইচ. পি. একটা বড় দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। ওঁর ভিতরটাও ওই এ সি কামরারই মতো হয়ে গেছে। বাইরের কোনো তাপ বা শীত কোনো গান বা কথা বা নিমন্ত্রণের প্রবেশাধিকার নেই আর ওঁর মনে। নিজের উপরে হঠাৎই বড় রাগ হল ওঁর। কি করতে এই প্রায় অচেনা ছুঁড়ির সঙ্গে তিনি তার কথাতে মজে সারাঙ্গা না ফারাঙ্গা দেখতে এলেন? দেবীব মতলব যদি এই হয় যে, ওদের অর্গানাইজেশনে কিছু ডোনেশন পাওয়া ওঁর কাছ থেকে, তবে ব্ল্যাঙ্ক চেক লিখে দিচ্ছেন এখুনি উনি। সোহনলালবাবুর সঙ্গে ওঁর ওখানে একটা দিন কাটিয়ে আগামীকালই প্লেনে বা ট্রেনে ফিরে যাবেন।

রাঁচি স্টেশনে নেমেই মোবাইল ফোনে ধরলেন কার্তিককে। কার্তিক রায় তাঁর ক্লার্ক-কাম-সেক্রেটারি-কাম ম্যানেজার সব। মহিলাহীন সংসারে সেই ম্যানেজার। কি বাজার হবে থেকে কোন গাড়ির ড্রাইভারের কি ডিউটি প্রত্যেক দিন, কোন কাজের লোক কবে ছুটি নেবে বা দেশে যাবে সেসব কার্তিকই ঠিক করে, দেখাশোনা করে। তার নীচে ক্যাশিয়ার আছে একজন। সেই রাতে, চেম্বারে মক্কেলদের কাছ থেক চেক ও ক্যাশ নেয়, হিসেব রাখে, খরচও করে। আরও অনেকে আছেন তবে কার্তিকই ইনচার্জ। অত সকালে কার্তিক তখনও ঘুম থেকে ওঠে নি। তার স্ত্রী ধরলেন ফোন। বললেন, অনেক রাত করে ফিরেছে স্যার। আপনি তো নেই।

এইচ পি. বললেন, ও বড় বেশি ড্রিঙ্ক করছে আজকাল। ওকে বলবে যে, অমন করলে চাকরিটা যাবে। পরিমিতিজ্ঞান যার নেই আমার কাছে তার জায়গা নেই। আর শোনো মলিনা, ও উঠলে বোলো যে আমি নেই বলে যেন চেম্বার সে কামাই না করে। আমি হয়ত কালই ফিরে যেতে পারি। রাতে ফোন করে জানাব ওর মোবাইলে। ঠিক আছে?

ঠিক আছে স্যার। আমি শুনেছিলাম সাত দিনের জন্যে গেছেন। যা পরিশ্রম করেন স্যার, একটু ছুটি নেওয়া তো ভালই।

কার্তিকের স্ত্রী মলিনা বললেন।

একথার উত্তর না দিয়ে এইচ. পি. বললেন, ছাড়ছি।

কার্তিককে, ক্যাশিয়ারকে এমন কি তাঁর খাস ড্রাইভার রামদীন সিংকেও একটা করে মোবাইল ফোন দিতে হয়েছে। রামদীনের দরকার ক্যালকাটা ক্লাব বা টলি ক্লাবের পার্কিং লট থেকে গাড়ি নিয়ে আসার জন্যে বলতে। আজকাল তো কোথাওই সোফার-ড্রিভন গাড়ি রাখতে দেয় না। ক্লাব থেকে বেরোবার পাঁচ মিনিট আগে মোবাইলে বলে দিলে গাড়ি নিয়ে গেটে এলে সুবিধা হয়।

দেবী এইচ. পি.-র মোবাইলের কথোপকথনটা শুনতে পেয়েছিল। ফোনটা সুইচ অফ্ করে দেওয়ার পরে দেবী এইচ. পি.-র মুখে তাকাল। এইচ. পি.ও তার মুখে তাকালেন। দেবীর মুখটা কালো হয়ে গেছিল। মুখ নীচু করে বলল, আপনি ফিরে যাবেন? আমার কি অপরাধ হয়েছে কোনো?

দেবীর কালো হয়ে যাওয়া মুখে চেয়ে তাঁর বুকে হঠাৎ করে কি যেন বিঁধল। হার্ট অ্যাটাক হলে কি অমন ছুরির মতো বেঁধে বুকে? কিন্তু উত্তর দেবার সময় পেলেন না, সোহনলালবাবুর বড় ছেলে কুলদীপ ব্যাহেল, যার ডাকনাম কুকু, এসে তাঁকে প্রণাম করল।

এইচ. পি. হেসে তাকে তুলে বুকে জড়িয়ে ধরে বলল, হাউ আর উ্য?

ফাইন আঙ্কল।

পিতাজী ক্যা ঘরমে?

উনোনে ত দেল্লি গ্যয়া কালহি এক্সপোর্ট প্রোমোশন কাউন্সিল মে কুছ জরুরি কাম পড় গ্যয়া। আপকি মোবাইল নাম্বার মুঝে দিজিয়ে উনসে বাত করা দেগা।

গাড়ি তো লায়া?

জী আঙ্কল। মগর হামলোগোঁ কো তো মার্সিডিজ নেহি না হ্যায়। ওপেল অ্যাস্ট্রা লেকর আয়া। তকলিফ হোগা আপকি।

মজাক্ মৎ ওড়াও বেটা।

বলেই বললেন, কাহে? পিলা রঙকি এক মার্সিডিজ তো থী। বাব্বিকে শাদীমে ওহি গাড়িমে ম্যায় বরাতভি গ্যায়েথে।

হাঁ হাঁ থী। মগর পেট্রোল কা থী। সফেদ হাতি বন গ্যায়ে থে। পিতাজী হ্যাজ গিফ্‌টেড দ্যাট কার টু দ্যা রাজা অফ গুণ্ডু, হিজ ফ্রেন্ড। গুণ্ডু সে কাফি স্টিকল্যাকভি আতা হ্যায় ফ্যাক্টরীমে।

এইচ. পি. দেবীর দিকে ফিরে আলাপ করিয়ে দিয়ে বললেন, ইনোনে হ্যায় দেবীজী, দেবী ভটচারিয়া...। সোশ্যাল ওয়ার্কার হ্যায়। বহুতই তেজ আপনি কামমে।

বলেই বললেন, সারাঙ্গা কাঁহা হ্যায়? জানতে হ্যায় তুম কুকু ?

নেহি তো আঙ্কল। কিতনা সারি জাগে হ্যায় হিঁয়া ঝাড়খণ্ডমে সবহি ম্যায় জানতা থোড়ী। রাঁচী ঔর মুরহু এহি তো হ্যায় হামারা বীট। কভি কভি কলকাত্তা ভি চলে যাতেঁ হেঁ। বাসস্।

চলো, কাঁহা হ্যায় তুমহারা গাড়ি।

বলে, দেবীকে বললেন, এসো দেবী।

আপলোগোঁ কি সামান?

এই কুলি।

বলে ডাকলেন এইচ. পি.। বললেন, একহি কুলি লেগা দোনোকো সামান। দোনোকা লাগেজ। গাড়ির কাছে পৌঁছে এইচ. পি. বললেন, তুম লওটে গা কৈসে? দুসরা গাড়ি লায়া?

কুকুবাবু বললেন, আপনাকে ছাড়ছি থোড়ী। বাড়িতে চলুন। রেশমী আর মা আপনাদের জন্যে নাস্তা বানিয়ে অপেক্ষা করছেন। মুখ হাত ধুয়ে নাস্তা করে তারপর যাওয়া। ওই ওপেল গাড়ি আর সানেকা মুণ্ডা ড্রাইভার আপনারই হেপাজতে থাকবে আপনি যতদিন থাকবেন। সাত দিন থাকবেন ত?

কথা তো সে রকমই ছিল। তবে আগেও ফিরে যেতে পারি। কতগুলো ঝামেলার মামলা আছে, অনেকগুলো প্লেইন্ট সেটল করতে হবে। জুনিয়রেরা কান্নাকাটি করবে।

আসাটা আপনার হাতে ফেরাটা আমাদের হাতে। কি বলেন দেবী জী? কুকু বললেন।

জরুর।

দেবী বলল।

তারপর বলল, স্যার আমরা কিন্তু সোজা বেরিয়ে গেলেই ভাল করতাম। পথে কুরুতে ব্রেকফাস্ট করে নিতাম, তা'হলে সারাঙ্গাতে পৌঁছনো যেত সময় মতো। আপনার মতো বড় মানুষকে নিয়ে তো যাই নি কখনও আগে। আপনার যাতে অসুবিধে না হয় তার সব বন্দোবস্ত করতে হবে তো। তারপরে দুপুরে দে সাহেব

আর সুমিতা বৌদি আসবেন। আমাদের সঙ্গে এক সঙ্গে খাবেন বলেছেন। আমাকে আপনার ভাল লাগছে না যে তা বুঝতে পেরেছি কিন্তু ওঁদের অবশ্যই ভাল লাগবে।

এইচ. পি. বললেন, কুকু যদি তোমাদের বাড়ি না যাই তবে ভাবীজী আর রেশমী কি খুবই রাগ করবেন?

গেলে যদি আপনার অসুবিধে হয়, তা'হলে আর রাগ করবেন কি করে।

তা'হলে আমাকে ছেড়েই দাও। ফেরার সময়ে, কথা দিচ্ছি, ট্রেনে ওঠার আগে তোমাদের বাড়িতে খেয়ে তারপরেই ট্রেনে উঠব।

প্রমিস আঙ্কল?

প্রমিস। চলো তোমাকে নামিয়ে দিয়ে যাই।

আমি অন্য গাড়ি এনেছি পাছে আপনি না মানেন। তা'ছাড়া আপনারা কুরুর দিকে যখন যাবেন তখন আমাদের বাড়ি একেবারেই উল্টো দিকে হবে।

ঠিক আছে। ওঠো দেবী। তুমি ডান দিকে বোসো আমি বাঁ দিকে বসব।

দেবী বলল, আমি ড্রাইভার সাহেবের পাশেও বসতে পারি। পেছনে আমি বসলে অসুবিধে হবে না আপনার?

এইচ. পি. এবার দৃঢ় গলাতে বললেন, না, হবে না। তুমি পেছনেই বোসো।

দেবী উঠে বসলে এইচ. পি. কুকুবাবুকে বললেন, কুকু প্লিজ নোট ডাউন মাই মোবাইল নাম্বার।

জী আঙ্কল, বলেই পকেট থেকে ছোট নোট বই বের করে নাম্বারটা নোট করে নিলেন কুকুবাবু আর নিজের একটা কার্ড দিয়ে বললেন, এতে আমার মোবাইল নাম্বার আছে। সকাল পাঁচটা থেকে ছ'টা, চার্জে রাখি, শুধু সেই সময়টুকু ছাড়া যে কোনও সময়েই করতে পারেন।

তারপর এইচ. পি.-কে বসিয়ে, গাড়ির দরজা বন্ধ করার আগে বললেন, আঙ্কল, শুনেছি, আপনি জঙ্গলে যাবেন। সেখানে এই গাড়িতে যদি সুবিধে না হয় তবে জিপ পাঠিয়ে দেব একটা। মাহিন্দ্রর 'বোলেরো' নিয়েছি দুটো। এসিও আছে। দারুণ গাড়ি। ওপেলটাও রাখবেন। ফোন করলেই পাঠিয়ে দেব। আরও কিছুর দরকার হলেও বলবেন, দ্বিধা করবেন না। আপনার কোনওরকম অসুবিধা হয়েছে জানলে বাবা আমার চাকরিটাই খেয়ে নেবেন।

এইচ. পি. বললেন, থ্যাঙ্ক উ্য।

দরজাতে হাত দিয়েই কুকু এবার দেবীকে জিজ্ঞেস করলেন, সারাঙ্গা জায়গাটা ঠিক কোথায়?

দেবী বলল, চান্দোয়া-টোরী থেকে লাতেহারের দিকের রাস্তাতে মাইল পনেরো গিয়ে বাঁদিকে একটা কাঁচা পথ ঢুকে গেছে। ওই পথেই সাত আট কিমি গেলে সারাঙ্গা। অতি ছোট্ট বস্তি। আসলে ওখানে একটা পাহাড়ি নালাও আছে, যার নাম সারাঙ্গা।

নদীর নামে গ্রামের নাম? আশ্চর্য তো।

এইচ. পি. বললেন।

নদীর নামেই গ্রামের নাম। গ্রামীণ ভারতবর্ষের প্রায় সব জায়গাতেই নদীর

নামেই গ্রামের নাম হয়। পাহাড়ের নামে ও গাছের নামেও নাম হয় দেশের কোথাও কোথাও।

দেবী বলল।

তারপর বলল, বস্তির নাম অবশ্য কম মানুষই জানেন। এতোই ছোট বস্তি। জঙ্গলে জঙ্গলে চাহাল-চুঙরু থেকে একটা কাঁচা জীপেবল্ রোড এসেছে সারাঙ্গাতে। বহু বছর আগে একটা কোলিয়ারি ছিল না কি। এবানডনড হয়ে গেছে। তাও আজ চল্লিশ বছর আগে, শুনেছি। আমার জন্মেরও আগে। ছিপাদোহর থেকেও একটি পথ এসেছে তবে পায়ে চলা, জীপও যায় না সে পথে।

তা'হলে এবারে আমরা এগোই কুকু?

এইচ. পি. বললেন।

জী আঙ্কল। হ্যাপি জার্নি।

থ্যাঙ্ক উ্য।

ড্রাইভার সানেকা মুণ্ডা গাড়ি স্টার্ট করল।

এইচ. পি. বললেন, ট্রেন মে বহতই সর্দি থা। এয়ার কন্ডিশনার ইকদম কমতি করকে রাখ না গাড়িকো।

জী স্যার।

বলল, সানেকা।

এখনও রাঁচি শহরের মধ্যেই আছে ওরা। শহর এখনও পুরো জাগে নি।

এইচ. পি. বললেন, আমি একবার নেতারহাটে এসেছিলাম বছর চল্লিশেক আগে। তারপরে আর আসি নি এদিকে। তখন মানুষজন অনেক কম ছিল। হাটিয়ার হেভি-এঞ্জিনীয়ারিং-এর কারখানা তখনও হয় নি সম্ভবত। ভারি ভাল লেগেছিল। এখন তো শুনি রাঁচি একটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল শহর হয়ে গেছে।

দেবী চুপ করে রইল।

তুমি কিন্তু আমাকে গাইডের মতো সব দেখাতে দেখাতে নিয়ে যাবে দেবী। আবার কবে আসব এদিকে কে জানে। এ জীবনে কি আর আসা হবে!

দেবী তবুও চুপ করেই রইল।

কি হল? চুপ মেরে গেলে যে! কথা বলছ না যে!

কি কথা বলব বলুন স্যার। যখন কিছু দ্রষ্টব্য জায়গা আসবে তখন বলব আপনাকে।

তারপরে দু'জনেই নিজের নিজের ভাবনাতে বুঁদ হয়ে জানালার বাইরে চেয়ে রইলেন। গাড়ি চলতে লাগল।

খুবই ভাল ড্রাইভার।

বলল, দেবী।

হ্যাঁ। গাড়ির ড্যাশবোর্ডে জলের গ্লাস রাখলেও জল একটুও চলকে পড়বে না এমনই সুন্দর চালাচ্ছে গাড়ি! শুধু গিয়ারেই গাড়ি চালাচ্ছে ব্রেক প্রায় ব্যবহারই করছে না, লক্ষ্য করেছ?

তারপর বলল, জাপানে যে বুলেট ট্রেন আছে তার কথা মনে পড়ে গেল।

দেড়শ মাইল গতিতে, ট্রেন যায় অথচ ডাইনিং রুমে তোমার চায়ের কাপ থেকে চা একটুও চলকাবে না।

আমি কি কখনও গাড়ি চালিয়েছি না রোজ গাড়ি চড়ি। আমি এসবের কি বুঝি? জাপানেও তো যাই নি কখনও।

যেতে চাও? তুমি বললেই বন্দোবস্ত করে দেব। মারুতির কিছু কাজ আমি করি। জাপান অবশ্যই দেখা উচিত। দেখার মতো দেশ। গেলে সেপ্টেম্বরের শেষে যেও। তখন ওদের 'সাকুরা' ফেস্টিভ্যাল হয়। সাকুরা মানে চেরী ট্রী। চেরী গাছে ফুল আসে তখন। আর সেপ্টেম্বরেই হাওয়াইতে 'আলোহা' উইক হয়। আলোহা মানে, ওয়েলকাম। একটা প্যারেড হয় ওয়াইকিকিতে দেখবার মতো। জাপান থেকে সেখানে চলে যাবে।

জাপান থেকে হাওয়াইয়ান আইল্যান্ডস কত দূরে?

কি আর দূর। প্যাসিফিক ওসানে তো। জাপান হয়ে স্টেটস-এ আসতে পথে হনলুলু। মনে নেই? জাপানিরা তো জাপান থেকেই হনলুলুরই খুব কছে পার্ল হারবার-এ প্রথমে অতর্কিতে বোমা ফেলে আমেরিকান ন্যাভাল বেস ধ্বংস করেছিল। তারপরেই না যুদ্ধে নামল আমেরিকা।

সত্যি। পৃথিবীর এদেশ থেকে ওদেশের কথা এমন করে বলছেন যেন বালিগঞ্জ থেকে টালিগঞ্জ যাওয়া। কত্ত জানেন আপনি। দেবী বলল।

এইচ. পি. বললেন। তুমি যা জানো তা তো আমি জানি না। এখন থেকে আমি শ্রোতা আর তুমি বক্তা। আমাকে সব দেখাতে দেখাতে নিয়ে চলো। আমি কিছুই মিস করতে চাই না কিন্তু। আসলে নিজের দেশই দেখি নি। লজ্জার কথা।

ঠিক আছে।

বলল, দেবী, অন্যমনস্ক গলাতে।

এইচ. পি. বুঝলেন যে মেয়েটি খুবই সেনসিটিভ। নইলে কাল ট্রেনের ক্যুপেতে সে এক রকম ছিল আর প্লাটফর্মে নেমেই অন্য রকম হয়ে গেল মোবাইল ফোনে তাঁর কথোপকথন শোনার পর থেকেই। নিজেকেই বকলেন মনে মনে। যাচ্ছ তো ঠিকই, থাকবেও সাত দিন, তবে শুধু শুধু মুডটা নষ্ট করতে গেলে কেন মেয়েটার। কত ভালবেসে আগ্রহ ভরে সে নিয়ে এসেছে এইচ. পি.-কে। ভারি আত্মসম্মানজ্ঞানী মেয়ে, মনে হয়। সে সইবে কেন অবহেলা? ওতো কিছু চাইতে আসে নি এইচ. পি.-র কাছ থেকে। সারা জীবন ঘাঘু মক্কেলদের চরিয়ে খেয়েছেন, কার কি ধান্দা তা ঠিকই বোঝেন। এ মেয়ে কোনও ধান্দা নিয়ে তাঁর কাছে আসে নি। আর আসে নি যে, তা জেনেই আরও ফাঁপরে পড়েছেন উনি। ধান্দাহীনতাই একটা ধান্দা কি না সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হতে পারছেন না কিছুতেই। আসলে ধান্দাবাজ মানুষ দেখে দেখে নিজের মনটাই বোধহয় বক্র হয়ে গেছে। সহজ কথা, সোজা কথা ভাবতে পর্যন্ত পারেন না। এ একটা ট্রাজেডি। সারা পৃথিবীই তাঁর চোখে বেঁকা হয়ে গেছে।

গাড়িটা এখন ফাঁকাতে এসে পড়েছে। ডান দিকে কালো পাথরের স্তূপ, সবুজ গাছগাছালি বুকে করে দাঁড়িয়ে আছে বৃষ্টিস্নাত লাল মাটির পটভূমিতে। ডান দিকে মস্ত বড় একটা আমবাগান।

দেবী বলল, দেখেছেন স্যার? আম্রকুঞ্জ? শান্তিনিকেতনের আম্রকুঞ্জর চেয়েও অনেক গুণ বড়।

আর ওই আম্রকুঞ্জের পেছনে লাল পাথরের যে দুর্গ মতো দেখা যাচ্ছে ওটা কার দুর্গ?

এইচ. পি. জিজ্ঞেস করলেন।

ওটা দুর্গ নয়, রাজবাড়ি। ওই জায়গাটার নাম রাতু। রাতুর রাজার বাড়ি ওটা। আর দেখুন বাঁদিকে জলাটা। বিরাট নয়? শীতকালে এখানে অনেক রকম পরিযায়ী হাঁস আসে।

পরিযায়ী মানে?

মানে, মাইগ্রেটরি।

মাইগ্রেট করে আসে পাখি? কোত্থেকে?

কত দেশ থেকে আসে, ইয়োরোপের নানা দেশ থেকে আসে, রাশিয়া, সাইবেরিয়া। তবে এই জলাতে সামান্যই আসে।

আবার চলে যায় ফিরে?

যায়ই তো। গরম পড়লেই ফিরে যায়। তবে যেতে যেতেও এপ্রিলের মাঝামাঝি অবধি কোন কোন প্রজাতিকে দেখা যায়।

প্রজাতি মানে?

মানে স্পিসিস।

তুমি এই সব পাখিদের নাম জানো?

সবের নাম কি জানি? তবে কিছু কিছুদের জানি। সারাঙ্গাতে আমরা নদীতে একটা বাঁধ বেঁধেছি পঞ্চায়েতের সহযোগিতাতে। তাতে একটি জলাধার হয়েছে বেশ বড়। গত শীতে ওখানেও এসেছিল কিছু পাখি। শিকার করা তো একদম মানা। পাহারাও দিই আমরা। তাই মনে হয়, এ বছর আরও পাখি আসবে। মাছও ছেড়েছি গত বছরে। এ বছর শীতে দেখা যাবে মাছ কত বড় হল।

কি মাছ ছেড়েছ?

মেইনলি রুই, কাতলা, মিরগেল। তবে দে সাহেব কিছু তেলাপিয়াও ছেড়েছেন গেরস্থ-পোষা হিসেবে।

বাঃ।

কয়েকটি পরিযায়ী পাখির নাম বলো তো শুনি, চিনি কি না একটাকেও।

ম্যালার্ড, পোচার্ড, গার্গনি, পিন টেইল, পোচার্ড, পিংক-হেডেড পোচার্ড, শোভেলার, স্পুন-বিলড, নাক্‌টা, বাহমিনি ডাকস, মানে চখা-চখি, নানা রকম টিলস, হুইসলিং টিল, গিজ নানারকম। এরা সবাই হাঁস। আরও কত আছে। যেমন কুট, মুরহেন ইত্যাদি।

আচ্ছা, কাম পাখি বলে কি কোনও পাখি আছে, জগু বলে, তার দেশের বিলে আছে। দারুণ সুন্দর নাকি দেখতে, লাল ঠোঁট আর ময়ূরের মতো গায়ের রং, বড় বড় পা। সত্যি?

এইচ. পি. বললেন।

তাঁর দেশ কোথায়?

বহরমপুরে।

হ্যাঁ বহরমপুরে তো অনেকই বড় বড় বিল আছে। থাকতে তো পারেই। কাম পাখির ইংরেজি নামই তো মুরহেন।

আর গিজ মানে রাজহাঁস? আসে?

হ্যাঁ। তবে সারাঙ্গাতে আসে না।

সরস্বতী ঠাকুরের রাজহাঁসের মতো?

এইচ. পি. রীতিমত উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। উনিও জানেন কম নয়, ইন্ডিয়ান ল রিপোর্টস, ইনকাম ট্যাক্স রিপোর্টস, সুপ্রিম কোর্ট রিপোর্টস, সেলস ট্যাক্স রিপোর্টস। আইনে আর রায়ে তাঁর মগজ খচখচ করে। কিন্তু এ যে জীবনের খবর, অন্য জগতের খবর। আশ্চর্য! বডই অশিক্ষিত তিনি। ওই অতটুকু মেয়েটার কাছেও যে তাঁর এত কিছু শেখার থাকতে পারে তা ঘুণাক্ষরেও ভাবেন নি উনি।

হ্যাঁ। সে রকমও আসে। ওইরকম বড় রাজহাঁস আসে অস্ট্রেলিয়া আর সাইবেরিয়া থেকে। তবে ওসব বড় হাঁস বড় হ্রদ বা নদী ছাড়া নামে না। অস্ট্রেলিয়া থেকে অমন বড় কালোরঙা রাজহাঁসও আসে। চিড়িয়াখানায় দেখেন নি?

চিড়িয়াখানা! চিড়িয়াখানাতে বড়রা যায় না কি? শেষ গেছি বড় মামার সঙ্গে, যখন স্কুলে পড়ি। তা, বছর পঞ্চাশেক আগে হবে।

আপনি চিলিকা লেক-এ গেছেন?

দেবী বলল।

নাঃ। গোপালপুর অন সি-তে ওবেরয়ের পাম বিচ হোটেলে তিন দিনের জন্যে গেছিলাম একটা আইনের সেমিনারে একবার। অনেকেই উইক-এন্ডে গেছিলেন চিলিকাতে বটে। আমি যাই নি। বারান্দায় বসে বিয়ার খেয়েছিলাম আর হ্যারল্ড রবিনস্ পড়েছিলাম।

ও।

তুমি হ্যারল্ড রবিনস পড়েছ?

না। আমাদের নিজস্ব বিষয়ে এত পড়াশুনো করতে হয় যে অন্য কিছু পড়ার অবকাশই হয় না। আর পড়লেও ক্লাসিকস্ পড়ি বাংলা এবং ইংরেজি।

তারপরে বলল, দেবী, কিছুক্ষণ পরেই আমরা মান্দার বলে একটা জায়গা পেরোব। সেখানে হাট বসে আজকে। গীর্জা আছে, মিশনারিদের হাসপাতাল আছে।

এই মিশনারীরাও কি জার্মান?

না, জার্মান যে নন সেটা জানি তবে ইংলিশও নন। সম্ভবত বেলজিয়ামের কোনও মিশন। ঠিক জানি না।

মান্দারের পরে আমরা পৌঁছব বিজুপাড়াতে। রাঁচি থেকে ঠিক কুড়ি মাইল। সেখান থেকে ডান দিকে রাস্তা বেরিয়ে গেছে খিলারীর সিমেন্ট ফ্যাক্টরির। আর বিজুপাড়া থেকে কিছু দূর গিয়ে চামা নামের একটি বস্তি হয়ে বাঁদিকে গেলেই ম্যাকলাস্কিগঞ্জ। বিজুপাড়া থেকে পনেরো মাইল। নাম শোনেন নি?

না তো। ম্যাকলাস্কি কে ছিলেন?

তা জানি না, তবে জানি যে, অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের খুব সুন্দর কলোনি ছিল মস্ত এলাকা জুড়ে সেখানে, পাহাড়-জঙ্গলের মধ্যে মধ্যে। স্কটসম্যান ম্যাকলাস্কি একটা সোসাইটি গড়ে সেই কলোনির পত্তন করেছিলেন তাই তাঁর নামে নাম। খুবই স্বাস্থ্যকর জায়গা শুনেছি আর ভারি সুন্দর নিসর্গ দৃশ্য। ক্লাব ছিল, চার্চ ছিল। তবে এখন আর সাদা অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানরা নেই-ই বলতে গেলে, সব অস্ট্রেলিয়াতে চলে গেছে।

এত কাছ দিয়ে যাও আসো আর যাও নি একবারও। এইচ. পি. বললেন।

হয় নি যাওয়া। কাছে গেলেই কি যাওয়া হয় সবসময়ে? কি পথে, কি জীবনে।

কথাটার গভীরতায় চমকে উঠলেন এইচ. পি.।

দেবী বলল, সারাঙ্গাতে কাজে আসি। রাঁচিতে নেমে রাঁচি শহরের রাতু রোড বাসস্ট্যান্ড থেকে ডালটনগঞ্জের বাসে চড়ে এসে সারাঙ্গার মোড়ে নেমে যাই। কেউ না কেউ থাকে মোড়ে, আমার অপেক্ষায়। তার সঙ্গে হেঁটে চলে যাই। অনেক সময় সাইকেলেও যাই। অনেক সময় কেউই আসতে পারে না কাজ বেশি থাকলে. তখন একাই হেঁটে যাই।

জঙ্গলে অতখানি পথ একা হেঁটে যেতে ভয় করে না?

জঙ্গলে একা হাঁটার মতো সুখ আর কিছু নেই। আসলে একা তো আর থাকি না - কত পাখি, প্রজাপতি, ওরাও তো সঙ্গে থাকেই। তাছাড়া ভয়, শহরে যতখানি জঙ্গলে তার ছিঁটেফোঁটাও নেই। আমরা জঙ্গলকে চিনি না, ভালবাসি না, তাই মনের মধ্যে নানা মিথ্যে ভয় পুষে রেখেছি।

তুমি সাইকেল চালাতো জানো?

অবাক হয়ে বললেন এইচ. পি.।

হেসে ফেলল, দেবী। বলল, সাইকেল চালানো আর কঠিন কাজ কি? আপনি জানেন না?

নাঃ। তবে গত দশ বছর আগে অবধিও জিম-এর সাইকেল চালিয়েছি। সে সাইকেল তো আর এগোয় না, তা চড়তে ব্যালান্সেরও দরকার হয় না।

তা ঠিক।

মান্দার পেরিয়ে যাওয়ার পরে কিছু দূর গিয়েই পথটা একটা খুব খারাপ বাঁক নিয়েছে ডান দিকে।

অত্যন্ত বাজে বেন্ড তো!

এইচ. পি. স্বগতোক্তি করলেন।

হ্যাঁ। এখানে বহু অ্যাকসিডেন্টও হয়েছে। কলকাতার এক সময়ের খুবই নামী বাঙালি চাটার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্সী ফার্ম পি কে মিত্র অ্যান্ড কোম্পানির নাম শুনেছেন? জি বাসু, রায় অ্যান্ড রায়ের সমসাময়িক?

হ্যাঁ। শুনেছি বৈকি। তখন তো মাড়োয়ারি গুজরাটি প্রফেশনালস কলকাতায় ছিলই না বলতে গেলে। প্রফেশনাল মানেই ছিল বাঙালি।

সেই ফার্মের পার্টনার সি পি মুখার্জির ছেলে এই বাঁকে মারাত্মক অ্যাকসিডেন্ট করেছিলেন। তবে প্রাণে বেঁচে যান।

কবে?

সেও বহুদিন আগে। আমি দে সাহেবের কাছে শুনেছি।

এই দে সাহেব মানুযটি সম্বন্ধে আরও কিছু জানা দরকার।

জানবেন। যেমন সুন্দর চেহারা তেমন প্লিজিং পার্সোনালিটি। আমেরিকাতেও প্রফেসারি করে এসেছেন। ভার্সেটাইল মানুষ। ওর স্ত্রী সুমিতাদি শান্তিনিকেতনের মেয়ে। তিনিও চমৎকার। সুন্দরী, ভাল গানও গান। আলাপ হলেই দেখবেন। ওদের সঙ্গে আলাপ হলে আমাকে ভুলে যাবেন।

আমি যাতে তোমাকে ভুলে যাই-ই সে জন্যে তুমি এত উদগ্রীব কেন? তুমি কি চাও যে, আমি ভুলে যাই তোমাকে, ভাল করে চিনতে না চিনতেই।

আমার কোন চাওয়া নেই।

খারাপ কথা। এই বয়সেই এমন হলে তোমাতে আর সন্ন্যাসিনীতে তফাত কি রইল?

সন্ন্যাসিনী হতেই বা দোষ কোথায়?

না, দোষ নেই। তবে কোন অভিমানে এই বয়সেই বিবাগী হবে? আমিই কি তোমাকে বিবাগী করলাম? আমি মানুষ হিসেবে কি এতই রিপালসিভ?

হেসে ফেলল, দেবী। বলল, তাই কি বললাম?

কিংশুক কিভাবে আসবে পাটনা থেকে?

এইচ. পি. প্রসঙ্গান্তরে গিয়ে বললেন।

পাটনা থেকে বাসে বা ট্রেনে আসবে রাঁচি। রাঁচি থেকে বাসে আসবে। পাটনা থেকে ডাল্টনগঞ্জের বাসও থাকতে পারে সরাসরি। সেটা গয়া হয়ে এলে জৌরী চাতরা হয়ে চান্দোয়া-টোরী হয়ে ডালটনগঞ্জের দিকে আসতে পারে। জানি না, আমি ঠিক। কি করবে না করবে তা ও এবং ওরাই জানে। একবার শুনছিলাম দুজনেই আসবে। আবার কেউই আসতে নাও পারে। ওদের মতির স্থির নেই।

তোমার ব্যাপারে তো দিব্যি একমত হয়েছে।

হয়েছিল। কতদিন সম্পর্ক ট্যাঁকে দেখি। লিভ টুগেদারের যা সুবিধে তাই অসুবিধে। চলে যাবার জন্যে দরজা খোলা থাকে বলেই সবসময় পা সুড়সুড় করে চলে যাওয়ার জন্য।

তারপরই বলল, ওই যে সামনে বিজুপাড়া। আপনার খিদে পেয়ে থাকলে এখানেও খেতে পারেন। নইলে কুরুতে গিয়েও খাওয়া যেতে পারে। বাসে এলে, সেখানেই খাই। যেমন আপনার ইচ্ছা।

এখন টু আর্লি হয়ে যাবে। তবে সকাল থেকে বেড টিও খাওয়া হয় নি, এক কাপ করে চা খাওয়া যেতে পারে। ড্রাইভারেরও খাওয়া দরকার। তার ঘুম পেয়ে গেলে মুশকিল।

বলেই, বললেন, সানেকা আগে জারা রোকনা। ঔর উতারকে আচ্ছা সে চায়ে বানোয়ানা। একমে বেগর চিনি। তুম ভি পি লেনা, কুছ। খানা হ্যায় তো খা ভি লেনা।

নেহি স্যার। স্রিফ চায়েই পীয়েগা। ম্যায় লা রহা হুঁ আপলোঁগোকি চায়ে।

একটু পরই সানেকাকে ভাঁড়-এ করে দু'ভাঁড় চা নিয়ে আসতে দেখা গেল।

এইচ. পি. বাঁদিকের দরজাটা খুলে দিয়েছিলেন।

দেবী বলল, এই এসি গাড়িগুলো শহরে ভাল। আওয়াজ ও পল্যুশন এবং হিউমিডিটির হাত থেকে বাঁচা যায় কিন্তু বাইরে এলে প্রকৃতির সঙ্গে কোনও সম্পর্কই থাকে না। তাই না?

ঠিক তাই। তাই তো খুলে দিলাম। তবে কাঁচ নামানো থাকলে আবার চুলগুলো হুটোপাটি করে চোখে-মুখে হাওয়ার ঝাপটা লাগে, ধুলো-বালিও ঢোকে। গরম তো আছেই। ঠাণ্ডার দিনেও ঠাণ্ডা তো থাকে। চা খেয়ে কাঁচ নামিয়েই যেতে বলব। তারপর বেলা বাড়লে গরম লাগলে তখন চালানো যাবে আবার। কি বল?

আমি তো বাসে করেই আসি। আমার কিসের অসুবিধা।

একি! ভাঁড়ের চা। আহ! সেই ছেলেবেলাতে খেয়েছিলাম। রেলস্টেশনে স্টেশনে "চায়ে গরম", "চায়ে গরম" করে চা নিয়ে ফেরি করত চাওয়ালা। আহা। বড় নস্টালজিক করে দিলে আমাকে দেবী। ভাগ্যিস তোমার সঙ্গে এসেছিলাম।

চায়ে চুমুক দিয়ে বললেন, চিনি দিয়েই খাই? কি বল? ডাক্তারেরা তো কত বারণই করেন। সানেকা, ইক চামচ শক্কর লাও তো। চাম্মচভি লেতে আনা।

সানেকা চিনি নিয়ে এলে চিনি গুলিয়ে চা-টা খুব রেলিশ করে খেলেন এইচ. পি.।

দেবী অবাক চোখে তাঁর দিকে চেয়েছিল। ভাবছিল মানুষটা বড় হলেও একেবারে শিশু আছেন কোন কোন ব্যাপারে। সত্যি একজন মানুষের মধ্যে যে কতজন মানুষ থাকেন!

চা খাওয়া হলে, এইচ. পি. সানেকাকে পার্স খুলে একটি পাঁচশ টাকার নোট দিয়ে বললেন, তোমার কাছে রাখ। পেট্রলও তো কিনতে হবে। যখন যা লাগে। তোমার বিড়ি সিগারেট।

সানেকা লম্বা কুর্নিশ করে বলল, নেহি হুজুর। পয়সা তো কুকুবাবু দেহি দিয়া। আপকি কোঈভি ফিক্কর নেহি কর না চাহিয়ে। হামারা নোকরী চলা যায়েগা।

এতো মহা ফ্যাসাদ। স্বগতোক্তি করলেন এইচ. পি.। তারপর ওটি ফেরত নিয়ে একটি একশো টাকার নোট দিলেন। বললেন, লো, রাখখো।

গাড়ি আবার চলল। মিষ্টি হাওয়া আসছে। আকাশ মেঘলা থাকলেও গুমোট নেই। এইচ. পি. বললেন, এর পরে কী কী জায়গা পাবো আমরা পথে?

এরপরে পাব সঁস। সঁস-এ এ অঞ্চলের মস্ত বড় হাট বসে। চান্দোয়া থেকে, লাতেহার থেকে, ডাল্টনগঞ্জ থেকে নানারকম সবজি, মোরগা-আণ্ডা, পাঁঠা সব আসে এই হাটে। আজ মান্দারের হাট। সঁস-এ আজ হাট নেই। আমাদের কোন পিকনিক টিকনিক হলে সঁস থেকে পাঁঠা কিনে নিয়ে যাওয়া হয়। অবশ্য যদি ট্রান্সপোর্ট অ্যারেঞ্জড হয়।

তারপর?

তারপর পৌঁছব কুরু। কুরুতে নাস্তা করে আমরা ডান দিকে ঘুরব।

আর সোজা গেলে?

সোজা গেলে লোহারডাগা। আর লোহারডাগা থেকে নেতারহাট ঠিক পঞ্চাশ মাইল, আপনি যেখানে গেছিলেন।

লোহারডাগা কত মাইল রাঁচি থেকে?

ঠিক পঞ্চাশ মাইল। সারাঙ্গা থেকে জঙ্গলে জঙ্গলে একটা পথ গেছে বেতলা ন্যাশনাল পার্ক-এর মধ্যে দিয়ে—সেটা সোজা গিয়ে উঠেছে লোহারডাগা—নেতারহাটের পথের বানারীতে।

বাবাঃ। তুমি দেখছি এসব জায়গা হাতের রেখার মতো জানো।

গত চার বছর মাসে তিন-চারবার করে আসছি যে।

তারপর কুরু থেকে?

কুরু থেকে চান্দোয়া-টোড়ি এগারো মাইল। কিমিতে একটু বেশি হবে।

চান্দোয়া-টোড়ি নাম কেন?

চান্দোয়ার ঘাটে উঠব আমরা একটু পরে। সুন্দর জঙ্গলে পাহাড়ি ঘাট রাস্তা। ঘুরে ঘুরে পথ উঠেছে। এই পথেই ঘাট শেষ হওয়ার আগে ডান দিকে একটি বাংলা আছে নাম, আমঝারিয়া। অনেকটা নেতার হাটের পালামৌ ডিভিশনের বাংলোব মতো।

বলেই বলল, আপনি মধ্যপ্রদেশের মাণ্ডুতে গেছেন কখনও?

মাণ্ডু? সেটা আবার কোথায়?

মধ্যপ্রদেশের ধার জেলাতে। মাণ্ডু একটি দুর্গ। দেখার মতো। সত্যি! আমাদের দেশে গর্ব করার মতো কত কিই যে ছিল। দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয়।

কাদের তৈরি?

তৈরি তো করেছিলেন রাজা ভোজ দশম শতকে। তারপর একাদশ শতকে পারমার রাজারা দখল নেয়। ঘোরি এবং খিলজি বংশর মালিকানাতে যায় চতুর্দশ শতকে। সেই সময়েই রাজধানী মাণ্ডুর রবরবা হয়। জাহাঙ্গির এর নাম দেন শাদিয়াবাদ বা আনন্দনগরী। মারাঠারা মুঘলদের হঠিয়ে দেয় অষ্টাদশ শতকে। তখনই মাণ্ডু তার গরিমা হারায়। কারণ, রাজধানী সরিয়ে নিয়ে যায় তারা সমতলে। ধার-এ। এখন ধার মধ্যপ্রদেশের একটি জেলা।

তারপর বলল, আপনি এ এল ব্যাশামের "দ্য ওয়ান্ডার দ্যাট ওজ ইন্ডিয়া" বইটা পড়েছেন?

না তো।

এইচ. পি. বললেন।

কী আর পড়েছি বলো? শুধু তো অকাজই করেছি। কাজের কাজ আর কি করলাম। এতগুলো বসন্ত পার করে দিলাম। অথচ। নিজের ওপরে ঘেন্না হয়।

তারপর বললেন, হঠাৎ মাণ্ডুর কথা উঠল কেন?

না, মাণ্ডুর এক প্রান্তে রূপমতী মেহাল আছে। নবাব বাজবাহাদুর আর গায়িকা রূপমতীর প্রেমের উপাখ্যান কিংবদন্তি হয়ে আছে। সেই মেহালটি দুর্গর শেষ প্রান্তে এবং সেখান থেকে পাহাড় খাড়া নিচে নেমে গেছে প্রায় দু'হাজার ফিট নিচে, নিমারের উপত্যকায়, যেখান দিয়ে নর্মদা বয়ে গেছে। আমঝারিয়া বাংলোর

সামনেটাও মাণ্ডুর মতো অতখানি না হলেও প্রায় হাজার ফিট খাড়া নেমে গেছে নিচে পাহাড় জঙ্গলাবৃত উপত্যকায়। সেই বনভূমি ধরে সোজা হেঁটে গেলে চাতরা আর সোজা গিয়ে ডান দিকে গেলে হাজারিবাগ। অপূর্ব দৃশ্য। তবে এখন গাছ কেটে তো প্রায় শেষ করে দিয়েছে। দে সাহেবের কাছে শুনেছি আগে ওই উপত্যকার দৃশ্য দেখার মতো ছিল, বিশেষ করে বসন্তে ও বসন্ত শেষে।

দেখাবে না আমাকে?

নিশ্চয়ই দেখাব। তবে বর্ষার রূপ দেখতে পাবেন। বসন্ত তো কবেই চলে গেছে।

একটু চুপ করে থেকে এইচ. পি. বললেন, তা ঠিক। বসন্ত অনেক দিন হল চলে গেছে। 'কখন বসন্ত গেল, এবার হলো না গান'। হয়তো আর কখনওই হবে না।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, তারপর কোথায় যাব আমরা?

তারপর চান্দোয়ার ঘাট থেকে নেমে টোড়ি বস্তিতে গিয়ে বাঁ দিকের পথে ঘুরে যাব আমরা লাতেহার ডাল্টনগঞ্জের দিকে। সাতান্ন মাইল পথ। বেতলার পথ চলে গেছে ডাল্টনগঞ্জে পৌঁছনোর সাত কিমি আগে, বাঁদিকে। তবে আমরা ওই পথে টোড়ি থেকে মাইল পনেরো গিয়ে বাঁদিকে কাঁচা পথে ঢুকে যাব।

কটা নাগাদ পৌঁছব?

নাস্তা করতে মিনিট পনেরো কুড়ি লাগবে। তা ধরে, ধরুন এই দশটা সাড়ে দশটাতে, খুব বেশি হলে এগারোটাতে। দেখতে দেখতে, থামতে থামতে যাচ্ছি তো, তাই এত সময় লাগবে।

বাঃ।

সানেকা বলল, মেমসাহেবকো তো সবেহি মালুম। মুঝে ভি ইতনি সারে মালুম নেহি হ্যায়।

হাসল, দেবী।

এইচ. পি.-ও হাসলেন, অ্যাডমিরেশনের হাসি। তারপর পকেট থেকে মোবাইল ফোনটা বের করে নাম্বার ডায়াল করলেন। কে? কার্তিক? শোনো, তোমার স্ত্রীকে বলেছিলুম যে কালই ফিরে যেতে পারি। কিন্তু যাচ্ছি না। ছুটি খাও। তবে সন্ধেবেলা চেম্বারটা অ্যাটেন্ড কোরো। ফোন এবং ফ্যাক্স-এর মেসেজগুলো নোট করে রাখতে বোলো ডালিয়াকে। ঠিক আছে? ছাড়ছি। তারপর আবার ডায়াল করলেন। মে আই স্পিক টু কুকু? ও কুকু। কুকু প্লিজ গেট মী ট্যু রিটার্ন টিকেটস্ বাই হাটিয়া হাওড়া অন নেক্সট স্যাটারডে। ইয়েস, আই সাপোজ ট্যু নো মাই নেম অ্যান্ড এজ। দ্যা আদার শুড বি ইন দেবী, ডি ই বি আই ভট্‌চার্জিস নেম। এজ? ইটস্ নট নাইস টু আস্ক আ লেডি হার এজ। বাট পুট থার্টি। শী শুড বী অফ রেশমীজ এজ। গেট আ ক্যুপে প্লিজ। থ্যাঙ্কস্।

আমি কিন্তু আপনার সঙ্গে ফিরতে নাও পারি। তা'ছাড়া দু'জন যদি কাল আসে এখানে।

তারা অর্ডিনারী থ্রী-টায়ারে যাবে আর আমি আপনার সঙ্গে ফারস্ট ক্লাস এসিতে যাব এটা কি ভাল হবে?

সব কিছুই যে ভাল হতে হবে তার কি মানে আছে? তোমার ইচ্ছে হলে যাবে নইলে টিকিট নষ্ট হবে। নইলে বলো, ওদের জন্যেও ফারস্ট ক্লাস এসির টিকিট কাটতে বলি—ফোর বার্থ কম্পার্টমেন্ট—গল্প করতে করতে যাওয়া যাবে। বলেই, পকেট থেকে ফোনটা আবার বের করলেন।

দেবী বলল, না না ওরা অত দামি ক্লাসে যাবে না।

যাবে না?

তারপর বললেন, ওরা যাক আর নাই-ই যাক। তুমি আমার সঙ্গে যাবে।

দেবী এইচ. পি.-র দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল। এইচ. পি.-ও ওর দিকে তাকালেন।

দু'জনেই কি বুঝলেন ও বুঝল তা অন্যে বুঝল বা বুঝল না। কিন্তু দু'জনের মনেই নানা ভাবনার ঝড় উঠল। দেবী ভাবল, মনের ব্যাপারে মানুষটি অশক্ত নন। শরীরে তো নিশ্চয়ই নন। আফটার অল পুরনো দিনের পুরুষ তো, আস্তে আস্তে জোর খাটানো শুরু করেছেন। আসলে সব পুরুষই সমান। বসতে দিলে শুতে চায়।

এইচ. পি. ভাবলেন, দু'জনের সঙ্গে সহবাস করো বলেই তো আর খোঁটায়-বাঁধা গরুর মতো জরু নও তুমি। জীবনের সাঁঝবেলাতে এসে আমিও যে সাহসী হতে পারি তা প্রমাণ করব। এক জন পুরুষের মধ্যে মেয়েরা কি চায় তা ঠিক জানেন না এইচ. পি.। এবারে জানবেন। আগল যখন খুলেইছেন, নিশি যখন ডেকেইছে, তখন কোন দিকে সে তাঁকে নিয়ে যায় দেখাই যাক না। তাঁর শরীর মনের মধ্যে অনেক শুকিয়ে যাওয়া চাওয়ার উৎসমুখগুলি যেন একে একে খুলে যাচ্ছে।

জীবনের এই সাঁঝবেলাতে পৌঁছে এ কি বিপদে পড়লেন তিনি!

৪

সকালবেলা ঘুম ভাঙল হাজারো পাখির ডাকে। পায়ের কাছের ও গায়ের কাছের জানালা দিয়ে ঝকঝকে রোদ এসে পড়েছে। কে বলবে অগাস্টের শেষ। রোদের রঙ, আকাশের রঙ এবং মিষ্টি ঠাণ্ডাতে মনে হচ্ছে যেন শরতেরই সকাল।

চোখ মেলে প্রথমে কয়েক সেকেন্ড বুঝতে পারেন নি এই এইচ. পি. তিনি কোথায় আছেন। কলকাতাতে মাঝ রাতে উঠে এয়ার কন্ডিশনারটা বন্ধ করে দেন। ঘরের পর্দা সব টানাই থাকে। ভোরে উঠে একবার বাথরুমে গিয়ে মুখে ঘাড়ে জল দিয়ে আসেন তারপর আবার শুয়ে পড়েন। একটু আলসেমি করেন। দ্বিতীয় বার শোওয়ার আগে ঘরের দরজার লকটাকে আনলক করেন। পাঁচ-দশ মিনিট শুয়ে থেকে বালিশের পাশে রাখা রিমোট কন্ট্রোল বেলের স্যুইচটা টেপেন। তাঁর খাস-বেয়ারা জগু নিঃশব্দ পায়ে এসে ঢোকে পাঁচখানি খবরের কাগজ নিয়ে। মশারী খোলে এবং তোলে; এয়ারকন্ডিশনড ঘরে শুলেও তিনি মশারী টাঙিয়েই শোন। চিরদিনের অভ্যেস। জানালাগুলির পর্দা সরিয়ে জানালাও খুলে দেয় সে, তারপর পশ্চিমের জানালার সামনে রাখা রকিং-চেয়ারের পাশের উঁচু তেপায়াতে কাগজগুলি রেখে চা আনতে যায়। খবরের কাগজ তিনি পড়েন না। প্রথম পাতার হেডলাইনগুলি দেখেন শুধু টাইমস অফ ইন্ডিয়ার। পরে ওগুলো চেম্বারে চলে যায়, মক্কেল এবং জুনিয়রেরা পড়েন।

দু'মুঠো মুড়ি খান একটা বড় এককোয়া রসুন দিয়ে, তারপর বিস্ক ফার্মের দুটি মিষ্টি এবং দুটি নোনতা বিস্কিট দিয়ে দু'কাপ চা। তারপরে শরীরের রক্ত চলাচল শুরু হয়।

দে'জ মেডিকেলের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দে মশায় খুব স্নেহ করতেন এইচ. পি.-কে, শুধু উকিল হিসেবেই নয়, এক বিশেষ চোখে দেখতেন তিনি হরপ্রসাদকে। উনি বলতেন ঘুম মানে অর্ধ-মৃত্যু। ঘুম ভেঙে চা খেলে তবেই জীবন ফিরতে থাকে তোমার মধ্যে। আরেকটা কথা বলতেন যা খুবই মানেন এইচ. পি.। বলতেন দ্যাখো, আমরা ওষুধ তৈরি করার সময়ে যেমন লিখে দিই প্যাকের ওপরে ডেট অফ ম্যানুফ্যাকচারিং আর ডেট অফ এক্সপায়ারি, আমাদের যিনি বানিয়েছেন তিনিও তেমনই লিখে রেখেছেন আমাদের কপালে অদৃশ্য কালিতে ডেট অফ এক্সপায়ারি। যেদিন যেতে হবে সেদিন হবেই। সেদিন যে কোন দিন বা কোথায় তা আগে থেকে জানাও যাবে না আর তা নিয়ে ট্যাঁ-ফো করাও চলবে না।

মনে পড়ে গেল এইচ. পি.-র যে ভূপেনবাবু যেদিন মারা যান বম্বেতে সেদিন এইচ. পি.-ও বম্বেতেই ছিলেন। বম্বে হাইকোর্টে দুটো ম্যাটার ছিল। তাজমহল হোটেলের ওল্ড উয়িং-এ উনি উঠেছিলেন, যেমন চিরদিন ওঠেন, কিন্তু এইচ. পি.

জানতেন না যে ভূপেনবাবুও সেদিন সেখানেই আছেন। অনেক সময় লবিতে তাঁর সঙ্গে বা তাঁর পুত্র গৌতমের সঙ্গে দেখা হয়ে গেছে কিন্তু সেবারে হয় নি। রাতে নাকি পেটে অসহ্য যন্ত্রণা হয় তারপর ডেট অফ এক্সপায়ারিতে তিনি এক্সপায়ার করে যান। তাঁর মৃত্যু সংবাদ পরদিন বিকেলের ফ্লাইটে কলকাতাতে পৌঁছে তারপরই পান এইচ. পি.। ভূপেনবাবুও জানতেন না যে উনিও ঐদিন ওখানেই আছেন।

সাতসকালে মৃত্যুর কথা কেন মনে এলো জানেন না। প্রৌঢ়ত্বের শেষে এবং বার্ধক্যর চৌকাঠে তিনি অবশ্যই পৌঁছেছেন এসে কিন্তু মরার সময় তো তাঁর আদৌ হয় নি। তবু এই এক আকাশ রোদের মধ্যে এই মৃত্যু চিন্তা কেন?

দু'কাপ চা না খেলে তিনি "নট-নড়ন-চড়ন-নট কিচ্ছু" হয়ে থাকেন। ল্যাজে-গোবরে। কিন্তু কে এনে দেবে তাঁকে এখন চা? কাল রাতেই বুঝতে পেরেছিলেন যে অ্যাডভেঞ্চার করতে এসে ভাল করেন নি। কষ্ট করার ক্ষমতা তাঁর আর নেই। আরামের মধ্যে তিনি নির্বাসিত হয়ে গেছেন চিরজীবনের মতো। তাঁর আর মুক্তির উপায় নেই।

কাল রাতের ডিনার ছিল মোটা মোটা আটার রুটি আর আলু ভাজা। কাল দুপুরে খেয়েছিলেন মোটা চালের ভাত, অড়হরের ডাল আর বেগুন ভাজা। খেতে কিন্তু খারাপ লাগে নি। কিন্তু সবচেয়ে যেটা খারাপ লেগেছিল সেটা হচ্ছে বিকেলের চা! মোটা, আধফাটা কাচের গ্লাসে খুব দুধ আর চিনি দেওয়া গুঁড়ো চা। কাঠের আগুনের গন্ধ তাতে। গেলা যায় না। আবার সেই চা খেতে হবে ভাবতেই ভয় করছিল এইচ. পি.-র।

ছেলেটির নাম যেন কি? ভিগু? হ্যাঁ ভিগুইতো। ভিগু বলে ডাকলেই সে এসে দাঁড়াবে, বলেছিল দেবী। বলেছিল, এইচ. পি. যতদিন আছেন ভিগুকে অন্য সব দায়িত্ব দিয়ে ছুটি দেওয়া হয়েছে, শুধুই এইচ. পি.-র ডিউটি করবে সে। খাটের ওপরে উঠে বসে ভাবলেন, ভিগু বলে ডাকেন। ঠিক সেই সময়ে বাইরে থেকে দেবীর গলা ভেসে এল : ঔর জারা গরম পানি বৈঠাও। ম্যায় ঔর এক গ্লাস পিয়েগা ঔর সাবকি লিয়েভি বানানা তো পড়ে গা।

জী দিদি।

ভিগু বলল।

মাটির বাড়ি একটা। খাপরার চাল। মনে হয় না বেশিদিন বানানো হয়েছে। বাড়ির চারদিকে চারটি বারোমেসে জবার বড় গাছ। তাতে নীল, লাল, সাদা আর কালচেটে জবা ফুটেছে। এই জবা গাছ তাঁর রাজপুরের বাগানবাড়িতে আছে বলে তিনি চেনেন। চাঁর গাছের নিচে। গাছটার নাম গতকাল বিকেলেই ইন্দ্রজিৎবাবু বলেছিলেন এইচ. পি.-কে। বিরাট গাছ। ফলও ফলে। মানুষে খায়ও সে ফল।

দুটি ঘর পাশাপাশি। সামনে ছ'ফিট গভীর বারান্দা — লম্বাতে আঠারো ফিট হবে। তাতে কয়েকটি বেতের ও বাঁশের মোড়া রাখা আছে। একটি ঘরে পাশাপাশি ঠাসাঠাসি করে চৌপাইতে শুয়েছিল রামধানীয়া, নাগেশ্বর আর ভিগু। যে রান্না করে সেই ভরত শোয় রান্নাঘরেই। তিন দিন আগেই নাকি এক ভাল্লুক এসেছিল

রাতে তার সঙ্গে ভাব করতে। রামধানীয়ারা ঠাট্টা করছিল ওকে, বলেছিল ভাল্লুকি নিশ্চয়ই, নইলে অবিবাহিত ভরতের খোঁজ করতে বর্ষা রাতে কেন আসবে?

হঠাৎ নিচু গলাতে গান ধরল দেবী। কি গান? মনে হয় ব্রহ্মসঙ্গীত। শোনেন নি আগে।

"তাঁরে দূর জানি ভ্রম, সংসার সঙ্কটে
আছে বিভু তোমা হতে তোমারো নিকটে
তুমি কেন নিরন্তর থাকো তা হতে অন্তর
ভাব সেই পরাৎপর নিত্য অকপটে
ভ্রম, সংসার সঙ্কটে।"

চমৎকার গলা দেবীর। আর আশ্চর্য সুন্দর ভাবও আছে গলাতে। আছে ঈশ্বর-প্রেম, সমর্পণ-তন্ময়তা। ওইটুকু বয়সের মেয়ের মধ্যে এমনটি আসা করারই নয়।

এইচ. পি. বাইরে এলেন।

দেবী ওই ডেরার পাশেই গাছতলাতে বড় কোনও গাছের একটা গুঁড়ি ফেলা ছিল তার ওপরে বসেছিল। সেটাই চেয়ারের মতো ব্যবহার করে সবাই, কালই দেখেছিলেন। গুঁড়িটা এতখানি লম্বা যে জনা পনেরো কুড়ি মানুষ তার ওপরে বসতে পারেন পাশাপাশি।

এইচ. পি.-কে দেখে দেবী উঠে দাঁড়াল। রাতে সালোয়ার কামিজ পরেই শুয়েছিল। এখন একটা কালো জিনস্ আর হলুদ গেঞ্জি পরেছে। ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে। আসলে চোখ যাকে একবার সুন্দর দেখে, তাকে সব বেশেই, সব অবস্থাতেই সুন্দর দেখে বোধহয়। সেই চোখটা যখন মরে যায় বা নড়ে যায় তখন আর একটুও সৌন্দর্য খুঁজে পাওয়া যায় না যাকে দেখা যায় তাঁর মধ্যে। দেবী ঠিক কতখানি সুন্দর বা আদৌ সুন্দর কি না, ঠিক জানেন না এইচ. পি.। প্রস্ফুটিত পূর্ণ যৌবনের দীপ্তি যখন লাগে, কি নারী কি পুরুষের মুখে, তখন সেই মুখ এক আলগা এবং আলাদা সৌন্দর্য পায়। কুকুরীও যৌবনে সুন্দরী। যৌবন যখন চলে যায় তখন নিষ্ঠুরের মতো সেই দীপ্তিকে মুখ থেকে মুখোশের মতো ছিঁড়ে নিয়ে যায়। দুঃখের বিষয় এই যে, যাদের যৌবন আছে ভরপুর, তারা এই দীপ্তি সম্বন্ধে আদৌ সচেতন নয়।

মুগ্ধদৃষ্টিতে চেয়েছিলেন এইচ. পি. দেবীর মুখে।

দেবী দাঁড়িয়ে উঠে বলল, রাতে ঘুম হল ভাল?

কাল থেকে হবে। নতুন জায়গাতে প্রথম রাতে ঘুম হয় না।

তা ঠিক।

তুমি ঘুমালে?

আমি তো পড়ি আর মরি।

ঘরের মধ্যে ধাড়ি শুয়োর নিয়ে কেউ ঘুমোতে পারে?

মানে?

মানে আমি নাকি নাক ডাকি শুয়োরের ঘোঁৎ ঘোঁৎ-এর মতো।

কে বলেছে?

আমার বন্ধু ব্রতীন বলতো। গোপালপুরে ঘর কম থাকাতে সে আমার ঘরে ছিল ওবেরয় পামবীচ-এ। তিন রাত। ভুক্তভোগী বলেই বলত।

জানি না। আমি তো বুঝতে পারি নি।

বলেই বলল, চা আনতে বলি? চা আর লেড়ো বিস্কিট।

তারপর বলল, আমার ভীষণই খারাপ লাগছে। আপনাকে যে কোন আক্কেলে এখানে নিয়ে এলাম। এত খারাপ থাকা-খাওয়া, বাথরুম পর্যন্ত নেই, অ্যাটাচড-বাথরুম তো দূরস্থান, সবই জঙ্গলে—এর মধ্যে আপনার মতো মানুষ কি থাকতে পারেন? তার ওপরে মশার কামড়। যদি ম্যালেরিয়া-ট্যালেরিয়া হয়ে যায় তা'হলেই তো চিত্তির। কি করে মুখ দেখাব?

কার কাছে মুখ দেখাবে? আমার তো আত্মীয়-পরিজন কেউই নেই। জবাবদিহি করতে হবে না তোমার কারো কাছেই। এই মস্ত সুবিধা। আমার অসুখে বিচলিত হওয়ার মতো কাছের মানুষ নেই-ই বলতে গেলে।

আপনার কোনও আত্মীয় নেই?

আপন ভাইবোন নেই। কাজিনস্ আছেন। তবে আত্মীয় শব্দটার মানে তো যে বা যাঁরা আত্মার কাছে থাকেন। সেই অর্থে আত্মীয় কেউই নেই। আর হবে যে কেউ, তারও বেলা নেই আর।

বলেই বললেন, তোমার কাছে আমি কতখানি যে কৃতজ্ঞ কি বলব। সারা জীবনে তো দেশে-বিদেশে অনেক জায়গাতেই বেড়ালাম। মুসৌরী, নৈনিতাল, কোদাই, গোয়া, কাশ্মীর, আন্দামান, কোভালম। অস্ট্রিয়া, সুইটজারল্যান্ড, ওয়াইকিকি, কোবে, সেশ্যেলস। সব জায়গার সবচেয়ে ভাল হোটেলে থাকলাম কিন্তু সে সব জায়গাতে না তোমার মতো কেউই হাত ধরে নিয়ে গেছে, না আমাদের এই জঙ্গুলে ভারতবর্ষ ছিল আমার অনুষঙ্গ হয়ে। এই আমার প্রথম স্বদেশ ভ্রমণ। সত্যিই বলছি।

বাবাঃ। দারুণ বাংলা বলেন তো আপনি। কবিতা-টবিতা লিখতেন না কি?

যৌবনে কবিতা লেখে নি এমন বাঙালি কি একজনও আছেন? আর যাঁরা কাগজে লেখেন নি কলম দিয়ে, তাঁরা মনে মনে অবশ্যই লিখেছেন, বসন্তের বাতাসে, ঝরা পাতাতে, শ্রাবণের মেঘে লিখেছেন, তারপরে উড়িয়ে দিয়েছেন, হারিয়ে ফেলেছেন। কবিতার যারা প্রেরণা তারাই যখন অধিকাংশ ক্ষেত্রে হারিয়ে যায় তখন কবিতা হারিয়ে যাওয়া নিয়ে দুঃখ করে কি লাভ?

তারপরে বললেন, পঞ্চাশের দশকের শেষাশেষি 'দেশ'-এ একটি কবিতা পাঠিয়েছিলাম এবং সেটি ছাপাও হয়েছিল।

সত্যি?

হ্যাঁ।

তারপর আর লিখলেন না?

লিখেছি অনেক কিন্তু পাঠাই নি কোথাওই। আমাদের সময়ে কবি গায়ক চিত্রীদের মধ্যে এমন রাতারাতি বিখ্যাত হওয়ার মানসিকতাটা ছিল না। অনেক গুণই মানুষে নিজস্ব করে রাখতে ভালবাসত—বাজারে পাঠাতে চাইত না পণ্য

হিসেবে। এখন যার গলাতে একটা পর্দাও সুরে বলে না সেও ক্যাসেট করে, সি টি ভি এন চ্যানেলে না কি সেই সব ছেলেমেয়েদেরই গাছ জড়িয়ে বা সিঁড়িতে বসে গান শুনতে ও দেখতে হয় শুনি।

শোনেন মানে? আপনি টিভি দেখেন না?

নাই বলতে পারো। দেখলে বিবিসি, বা ডিস্‌কভারি বা ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক চ্যানেল দেখি।

তারপর বললেন, এমন অত্যাচার আমাদের সময়ে কেউ করতও না, করলে কেউ সহ্যও করত না। প্রত্যেক মানুষেরই মধ্যে একটা শালীনতাবোধ ও লজ্জাবোধ ছিল। যথেষ্ট ভালভাবে কোনও কিছুই না করতে পারলে, না শিখলে, জনসমক্ষে আসতে মানুষে স্বভাবতই কুণ্ঠিত হতো। গুরুরাও ছাত্রছাত্রী যথেষ্ট তৈরি না হলে তাদের পাবলিক পারফরমেন্স করতেই দিতেন না। আর আজকাল শয়ে শয়ে ক্যাসেট-করা, সিডি বের করা শিল্পীর গলাও বেসুরে বলে অথচ নির্লজ্জতার চরম করে তাঁরা মঞ্চ ও টিভির পর্দা দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন।

একটু চুপ করে থেকে এইচ. পি. বললেন, আসলে আমার কি মনে হয় জানো দেবী? ইকনমিক্স-এর Gresham সাহেবের সেই ম্যাক্সিম এখন বাঙালি জীবনের সব ক্ষেত্রে, সাহিত্য, সঙ্গীত, রাজনীতি সব ক্ষেত্রেই প্রচণ্ডভাবে প্রযোজ্য।

সেই ম্যাক্সিমটা কি?

"ব্যাড মানি ড্রাইভস্ এওয়ে গুড মানি"। থার্ড ক্লাস মানুষেরা এসে জীবনের সব ক্ষেত্র থেকেই প্রকৃত গুণী মানুষদের ঝেঁটিয়ে বিদায় করছে। প্রকৃতই যাঁরা গুণী, তীব্র আত্মসম্মান এবং তীব্রতর অভিমান নিয়ে নিজের নিজের বাড়িতে বসে আছেন। এই বাজারি প্রতিযোগিতাতে নামতে তাঁরা ঘেন্না বোধ করেন।

তারপরই বললেন, তুমি যেমন গাও, তুমি তো সহজেই ক্যাসেট করতে পারতে দেবী। রেডিও এবং টিভিতেও গাইতে পারতে। গাও না কেন? ভারি ভাল লাগল তোমার গান।

ঐ যে! বললেন না আপনি! কিছু জিনিস তো আমার নিজস্ব থাকবে। আমার অবকাশের নিশ্চিন্ত পরিসরে বসে আমি আমার গানই হোক কি ছবি কি কবিতা আমি আমাকেই শোনাব বা দেখাব। দশজনের বাহবা যে পেতেই হবে তার কি মানে! নিজের অন্তরের গভীরে যদি আনন্দ পাই তবে সেই তো পরম প্রাপ্তি।

আর তোমার যারা প্রিয়জন তাদেরও কি এই গান শোনাও না, শোনাবে না?

যদি তারা ভালবেসে শোনে তবে তো শোনাব।

মুখ নিচু করে গলা নামিয়ে বলল দেবী।

ঐ গানটি, মানে যেটি গাইছিলে একটু আগে, সেটি ব্রহ্মসঙ্গীত, না? কার কাছে শেখো তুমি? আমি চুপ করে শুনছিলাম বলেই আওয়াজ দিই নি এতক্ষণ। ঘুম তো ভেঙেছে অনেকক্ষণই।

কারো কাছেই শিখি নি তেমন করে। আমার মা খুব ভাল গান করেন। মায়ের গান শুনে শুনে, শুধু মাই-ই কেন, আমার মামা-মামীরাও প্রত্যেকে ভাল গান করেন। শিশুকাল থেকে গানের আবহের মধ্যেই বড় হয়ে উঠেছি তাই গাইলে

বেসুরে গাই না এটুকুই বলতে পারি। আসলে, আমার মা বলেন, সুর সকলের গলাতে থাকে না। যার গলাতে নেই সে যত চেষ্টাই করুক তার গলা, হারমোনিয়াম ভেঙে ফেললেও সুরে বলবে না। আর যার সুরের কান না তৈরি হয় তার পক্ষে সুর-বেসুরের তফাৎটুকুও বোঝা সম্ভব নয়। নয় বলেই, সে মহা জাঁকজমকের সঙ্গে পনেরোটি বাজনা নিয়ে মঞ্চ কাঁপিয়ে গান গাইলেও সে নিজেই বুঝতে পারে না যে তার গান গাওয়াটা গান হচ্ছে না, তার গান গাওয়া আদৌ উচিত নয়।

ঠিকই বলেছ। তোমার মামা বাড়ি কি ব্রাহ্ম? এমন ব্রহ্মসঙ্গীত!

ব্রাহ্ম নন। ব্রাহ্মদের সব কিছুই যে ভাল এমন তো নয়। অবশ্য কারোই সব কিছু ভাল নয়।

না। তবে মামাবাড়ি ব্রাহ্মভাবাপন্ন একথা বলতে পারি। হয়ত মা-মাসীরা সবাই শান্তিনিকেতনে লেখাপড়া করেছেন বলেই কিছুটা প্রভাবিত হয়েছেন। আজকের শান্তিনিকেতনের অবশ্য তেমন কোনও প্রভাব ছাত্রছাত্রীদের ওপরে নেই। প্রতিষ্ঠানেরই নিজস্বতা যদি না থাকে তবে তা ছাত্রছাত্রীদেব মধ্যে চুঁইয়ে আসবে কি করে। সারা পৃথিবীরই সব দুধেই এখন জল। কি আর করা যাবে।

ভিগু একটা প্লাস্টিকের থালাতে বসিয়ে গ্লাসে করে চা আর লেড়ো বিস্কিট নিয়ে এলো। ওর গ্লাসটি তুলে নিতে নিতে দেবী বলল, আরেক গ্লাস খাবেন তো?

খেতে পারি। এই চা খেয়ে আমাদের এক বেলজিয়ান বন্ধুর কথা মনে পড়ে গেল।

কী সে কথা।

এইচ. পি. বললেন, রসিকতাটা রসিকতা হিসেবেই নিও - নো ইল-ফিলিং প্লিজ।

বলুনই না।

উনি বলেছিলেন, "সামথিং ওজ বীইং সোল্ড অ্যাট মিন্সিং লেন, হুইচ লুকড লাইক কোকো, টেস্টেড লাইক কফি, অ্যান্ড ওজ টোল্ড টু বী টি।"

মিন্সিং লেনটা কোথায়?

ও, মিন্সিং লেন হচ্ছে লানডান-এর চা অকশনের জায়গা—পৃথিবীখ্যাত।

ও।

দেবী হেসে বলল, আমাদের সারাঙ্গার চা তা'হলে এক অভিজ্ঞতা। কী বলুন। পাই-পয়সাও বাঁচাতে চাই আমরা। অনেকের চাঁদার টাকাতেই তো চলে সব। নিজের টাকা হলে এসব বিলাসিতা নিয়ে ভাবা যেত।

তারপর বলল, ভিগু, সাবকে লিয়ে ঔর এক গ্লাস চায়ে লাও। উসকে বাদ সাবকো লেকর জঙ্গলকে যানা। লোটামে পানি লে যা না।

জঙ্গলে বাথরুম জীবনে করেন নি। কি করে যে কি হবে এবং হবার পরে যে কি হবে এই চিন্তাতেই চ্যাটার্জি সাহেবের মগজ কাল রাত থেকেই খুবই উত্তেজিত আছে। কঠিনতম মামলার আগেও এমন উত্তেজনা বোধ করেন নি কখনও। যাক, যা হওয়ার তা হবে। তবে কালই তো ইনিশিয়েশন হয়ে গেছে। আজকে অতটা কঠিন কাজ বলে মনে হবে না।

চা খেতে খেতে এইচ. পি. বললেন, কিংশুক কখন আসবে?

এসে পড়বে। অন্তুও আসবে হয়ত। দে সাহেব, মানে ইন্দ্রজিৎদা বলছিলেন। এক জনের সখ আধুনিক কবিতা অন্য জন বাংলা ব্যান্ডের সঙ্গে যুক্ত।

কি? মহীনের ঘোড়াগুলি?

দেবী হেসে বলল, না, সে তো অনেক দিন আগের ব্যাপার। মহৎ ব্যাপারও। অন্তুদের ব্যান্ডের নাম 'ঝঞ্ঝাটিয়া পাখিরা'।

কি? কি?

'ঝঞ্ঝাটিয়া পাখিরা'। ওদের লিড ভয়েস দেয় যে ছেলেটি তার নাম ঝঞ্ঝাট সেন। সে আবার Gay।

তারপরই বলল, আপনাকে একটু সাবধান করে দেওয়া দরকার।

কিসের থেকে সাবধান?

না, ওদের থেকে।

কেন?

ওরা দু'জনেই বয়োজ্যেষ্ঠদের একেবারেই সম্মান দিয়ে কথা বলে না। সম্মান তো দেয়ই না, উল্টে অপমানজনক কথাবার্তাও বলে, মুখের ওপরেই। ওদের ধারণা আমাদের প্রজন্মের যা কিছু দুঃখ-কষ্ট তার সবের জন্যেই দায়ী আপনাদের প্রজন্ম।

সম্মানের যোগ্য যদি কেউ না হন তবে তাকে সম্মান দেবেই বা কেন? তা'ছাড়া ওদের অভিযোগ তো পুরোপুরি মিথ্যাও নয়। আমি দোষ দিতে পারি না ওদের।

তা বলে জেনারালাইজ করা কি ভাল? ওরা যে যোগ্য-অযোগ্যর বিচার করে না। আমি নিশ্চিত যে, আপনি সমাজের যে তলাতে বাস করেন, যাদের সঙ্গে ওঠা-বসা করেন, সেই সমাজকে ওরা জানেই না, আমিও অবশ্য জানি না। সেই সমাজের সঙ্গে কিংশুক আর অন্তুর কোনই মিল নেই। আপনাদের ওরা জানে না, একেবারেই জানে না। জানতে না পারে কিন্তু জানার ইচ্ছেটাও কেন থাকবে না? ওরা সবকিছুকেই উড়িয়ে দিয়ে বলে, বিন্দাআস।

এইচ. পি. বললেন, বিন্দাআস। এই শব্দটার মানে কি? বিন্দাআস? সেদিন সৌরভের খেলা দেখার জন্যে টিভি খুলে ওপেল গাড়ির বিজ্ঞাপনে দেখি ব্যবহৃত হচ্ছে ঐ শব্দটি। মানে বুঝিনি।

বম্বেতে চালু আছে এই বিন্দাআস শব্দটি। দেখছেন না। কিডন্যাপাররা যেমন আসছে বম্বে থেকে, নানা নতুন শব্দও আসছে। কলকাতা এখন পুরোপুরিই রিসিভিং এন্ড-এ।

তা বিন্দাআস শব্দটির মানেটা কি?

ঠিক মানে কি তা আমিও বলতে পারব না। ধরুন ইংরেজিতে could not care less বলতে আমরা যা বুঝি, তাই আর কি!

সবকিছুকেই উড়িয়ে দেওয়া, মানে ওড়ানোর জন্যেই উড়িয়ে দেওয়াটা তো স্বাস্থ্যের লক্ষণ নয়। ওড়াবার জিনিসকে ওড়ানো খারাপ নয় কিন্তু ওড়াবার মতো প্রি-ডিটারমিন্ড মেন্টাল ফ্রেম কি ভাল?

এইচ. পি. বললেন।

ভাল তো নয়ই। কিন্তু এসব ওদের পার্সোনাল ব্যাপার। পার্সোনাল ভিউ অফ লাইফ। আমার সঙ্গে দু'জনের সম্পর্ক জীবনের একটা বিশেষ দিকের। তবে আমিও ওদের উড়িয়েই দিই। আমরা তিন জনে সহাবস্থান করি বটে কিন্তু তা সীমিত আছে জীবনের কিছু বিশেষ ক্ষেত্রেই—যেখানে আমাদের মধ্যে ঝগড়া বা মতবিরোধ এখনও নেই। অন্য সব ব্যাপারে আমরা তিন জনেই ব্যক্তিগত স্বাধীনতার দাম দিই। কিন্তু ওদের বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি এই যে আটার ডিসরেসপেক্ট, এটা আমার ভারি খারাপ লাগে। অসভ্যতা বলেই মনে হয়। অথচ ওরা ভাবে, এটাই সপ্রতিভতা।

এই ব্যাপারটা আমিও অনেক তরুণদের মধ্যে লক্ষ্য করেছি। Arrogance-কেই ওদের মধ্যে অনেকে Smartness-এর সমার্থক বলে মনে করে। এই ধারণাটা ভুল অবশ্যই। আমরাও একদিন তরুণ ছিলাম, আমাদের তারুণ্যের দিনে এমনটি আমরা কখনওই ভাবি নি।

এইচ. পি. বললেন।

জানি স্যার। তাই-ই আপনাকে সাবধান করে দিলাম।

দেখো দেবী, অনেক দুঁদে উকিল-ব্যারিস্টারের সঙ্গে টক্কর দিয়ে আমার দিন কাটে, এতগুলো বছর কাটলো। ওদের আমি ঠিকই ট্যাকল করতে পারব। তোমার চিন্তা নেই কোনও।

না, মানে আমি যা বলতে চাইছি সেটা হচ্ছে, প্রয়োজনে আপনি ওদের "ফিক্স" করে দেবেন। ওদের অসভ্যতা, মানে যদি কিছু করে, তা'হলে আপনি ছেড়ে দেবেন না। ওরা আমার এমন কিছু আপনজন নয়। বলেইছি তো! আমরা তিন জনে এক সঙ্গে থাকি ওনলি ফর কনভিনিয়েন্স। এর চেয়ে বেশি কিছু নয়।

সে কি! স্বামী-স্ত্রীর মতো থাকছ আর বলছ সম্পর্কটা বিশেষ নয়। ওরা তোমার আপনজন নয়।

সত্যিই তাই। মনে করুন, আমরা ট্রেনের এক কম্পার্টমেন্টের যাত্রী। যে কোন স্টেশনে যে কেউই নেমে যেতে পারি। আজকের পৃথিবীতে "চিরকালীন" বলে কোনও সম্পর্ক আর নেই স্যার। সব কিছু সম্বন্ধেই এখন বলা চলে, "বিন্দাআস"! এক জন নারী আর পুরুষের মধ্যে শারীরিক সম্পর্কটাই আগেকার দিনে সম্পর্কের একেবারে শেষ কথা বলে ধরা হতো। আজকাল সেই কনসেপ্ট আর নেই। সব ভেঙেচুরে গেছে। গেছে যে, তা তো আমাদের দেখেই বুঝতে পারছেন স্যার।

এইচ. পি. চায়ের গ্লাসটা শেষ করে বললেন, কি জানি! দেখি তোমাদের বুঝতে পারি কি না। এতো বড় ক্যুইজের মধ্যে এনে ফেলবে জানলে সত্যিই আসবার আগে ভাবতাম।

আহা। আমি তো আপনার দলেই। অন্যায় কিছু যদি করে ওরা তবে আমিই বা মেনে নেব কেন? আফটার অল আপনি তো আমারই অতিথি হয়ে এখানে এসেছেন স্যার।

আর ওরা? ওরা কার অতিথি?

ওদের কেউ নেমন্তন্ন করে নি। দে সাহেবকে মানে ইন্দ্রজিৎদাকে চেনে, একবার আমারই সঙ্গে এসে বারিয়াতুতে ছিল দু'দিন। আমাদের প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটরকে চেনে। তাই আমি আসছি এবং কয়েক দিন ছুটি পড়েছে বলে ওরাও আসছে। হয়ত ছুটি নিয়েওছে ক'দিন। ছুটি নেওয়ার মতো বাঁধা-ধরা কাজ ওরা কেউ করে বলে জানি না অবশ্য। সম্ভবত না। তবে আদৌ আসবে কি না এবং কবে আসবে তা ওরাই জানে। ওদের চলা-ফেরার, কথাবার্তার কোনোই ঠিক নেই।

হুঁ।

এইচ. পি. বললেন, একটু চিন্তিত হয়েই।

৫

এইচ. পি. যখন ভিগুর সঙ্গে প্রাতঃকৃত্য সারতে জঙ্গলে যাচ্ছিলেন তখনই কলকল করতে করতে আদিবাসী মেয়েরা, যারা কাল সন্ধের আগে ফিরে গেছিল কাছাকাছিই নিজেদের গ্রামে এবং সারাঙ্গাতেও, তারা ফিরে এসে দেবীকে ঘিরে ধরল। গতকালই লক্ষ্য করেছেন এইচ. পি. যে, দেবী মেয়েটির মধ্যে নেতৃত্ব দেওয়ার এক স্বাভাবিক ক্ষমতা আছে। কিছু হেসে, কিছু গম্ভীর হয়ে কিছু বকে-ঝকে ওদের কাছ থেকে কাজ আদায় করে নেওয়ার এক বিরল গুণ আছে। ও যথেষ্ট জনপ্রিয়ও। গ্রামের মেয়েদের ব্যবহারে এটা স্পষ্ট যে দেবী যদি এখানে পাকাপাকিভাবে থাকত তবে তারা খুবই সুখী হতো, দেবীকে কম পায় বলেই যখন পায় তখন বোধহয় এমনি করেই পুরোপুরি নিংড়ে নিতে চায়। সকলেই ওকে দেবীজী। দেবীজী। বলে ডাকছিল।

দেবী জঙ্গলের দিকে ভিগুর দিকে এগিয়ে যাওয়া এইচ. পি-কে বলল, স্যার, আমি কিন্তু চলে যাচ্ছি। আপনি ফিরে কখন নাস্তা করবেন ভিগুকে বলে দেবেন।

তুমি নাস্তা করবে না?

নাঃ। আমার সময় নেই। অনেক কাজ। দুপুরে খেতে আসব।

কটাতে?

বারোটা থেকে একটার মধ্যে। তবে আমার দেরি হলে আপনি খেয়ে নেবেন।

দে সাহেবরা কি আজও আসবেন?

সম্ভবত না। আজ ওঁদের বারিয়াতুতে একটা সেমিনার আছে। তবে বলেছেন, চেষ্টা করবেন।

ঠিক আছে।

ওঁদের কেমন লাগল স্যার আপনার?

ফ্যানটাসটিক। আমি গ্রেট ফ্যান হয়ে গেছি ওঁদের। এমন মেড ফর ইচ আদার কাপল আর দেখেছি বলে মনে পড়ে না।

বলেছিলাম না আপনাকে। ওঁরা আমার আদর্শ। আপনিও কিছুটা।

আমি?

অবাক হয়ে বললেন এইচ. পি.।

নাস্তার পরে ভিগুকে নিয়ে চারদিক এবং আমাদের নানা প্রজেক্ট দেখতে পারেন।

আমি এখন তোমার সঙ্গে যেতে পারি না?

আমার কোন আপত্তি নেই। কিন্তু চার কিমি পাহাড়-জঙ্গলের মধ্যের পাকদণ্ডী দিয়ে হাঁটতে হবে। আপনি পারবেন না। খুব উঁচু একটা চড়াই আছে। ব্রিজটাও ভেঙে গেছে শুনছি। নদীতে এখন কত জল কে জানে। নদী পেরিয়ে যেতে হবে।

এইচ. পি. হার স্বীকার করে বললেন, না। হাঁফ ধরে যায়। চড়াই উঠতে পারব না।

পারবেন। কয়েকবার এসে থাকুন, দেখবেন শরীর মন সব বদলে গেছে। বয়স কুড়ি বছর কমে গেছে। তবে এখন পারবেন না বলেই আপনাকে রেখে যাচ্ছি। আমি এগোলাম স্যার। টা-টা।

হাত তুলে দেবীর এই টা-টা বলার ভঙ্গিটা ভারি ভাল লাগল এইচ. পি.-র। যেন কত জন্মের কাছের কেউ ও।

জঙ্গলের দিকে এগোতে এগোতে এইচ. পি. ভাবছিলেন শরীরের চর্চা বহু বছরই ছেড়ে দিয়েছেন। ওঁর ছেলেবেলার বন্ধু মুনা দাস, ফুটবলার, এখনও রোজ সকালে রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে তার নাতিকে নিয়ে জগিং-স্যুট পরে দৌড়োয়। এখনও দারুণ ফিট আছে। সারা পৃথিবীতেই ফিজিকাল ফিটনেস একটা ক্রেইজ হয়ে গেছে এখন। সকলেরই ফিগার-ভাল থাকা চাই-ই। মানুষ যেন পুরোপুরিই শরীর-সর্বস্ব জীব হয়ে গেছে। যতই ফিট থাকুক মুনা দাস, সে তো একটা চিতাবাঘের মতো ফিট হতে কোনদিনও পারবে না। মানুষ তো চিরদিনই তার মনের সুবাদেই উৎকৃষ্টতম জীব। চারদিকের এই শারীরিক ক্রিয়াকাণ্ড দেখে মনে হয় মানুষের মনের চর্চার আর দরকার নেই। মনের চর্চা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু করতে বা বলতে কারোকেই দেখেন না। বিধাতা তো বৈচিত্র্যের জন্যে মোটা মানুষ রোগা মানুষ বেঁটে মানুষ লম্বা মানুয কালো সাদা হলুদ বাদামী নানা রঙা মানুষই সৃষ্টি করেছিলেন। সকলেরই যে আদা নুন খেয়ে রোগা হতে হবেই কেন সে কথা ভেবে পান না এইচ. পি.। কিন্তু নিজের মনের কথা বলে যে হালকা হবেন বা নিজের মতের পক্ষে অন্য কারোকে পাবেন তেমন মানুষ একজনও পান না। তাই এ প্রসঙ্গর অবতারণাই আর করেন নি কারো কাছেই—পাছে লোকে পাগল বলে।

ভিগু তাঁকে একটা প্রস্তরময় জায়গাতে নিয়ে গেল। কাল বিকেলে অন্যদিকে গেছিলেন। বড় বড় নানা আকৃতির পাথর আছে সেখানে। পাশ দিয়ে একটি সরু ঝোরা মতো বয়ে গেছে। তাতে জল চলছে তিরতির করে। ভিগু বলল আপনার পছন্দসই একটা পাথরে বসে পড়ুন, যার পেছন দিকে ফাঁকা। এইচ. পি. বুঝলেন ভিগু কি বলছে। ভিগু এবারে জল ভর্তি ঘটিটা ওঁর হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, আমি ওই মহুয়া গাছটার নিচে থাকব। আপনার হয়ে গেলে আমাকে ডাকবেন। আরও জলের দরকার হলে ওই নালাতে নেমে যাবেন—দু'কদম তো। বহতা জল আছে।

মহুয়া গাছ কোনটা?

বিপদে পড়ে বললেন এইচ. পি.। গাছ-টাছ তিনি চিনবেন কোত্থেকে!

ভিগু আঙুল দিয়ে মস্ত গাছটাকে দেখালো। বড় বড় পাতাতে ভরে আছে। অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন এইচ. পি.। এই মহুয়া গাছ! "মহুয়া" নামের একটি বইও তো আছে রবীন্দ্রনাথের। মহুয়া নামের একটি মেয়েও পড়ত তাঁদের সঙ্গে স্কটিশ চার্চ কলেজে। মহুয়ার মদ-এর কথাও শুনেছেন। কিন্তু মহুয়া গাছ! জীবনে এই প্রথম দেখলেন। কে জানে। আগে হয়ত কখনও দেখেছেন কিন্তু চিনতেন তো না।

ব্যাপারটা যেমন অসাধ্য বলে ভেবেছিলেন কাজে তেমন মনে হল না। হলো না যে তা জেনে পুলকিত হলেন এইচ. পি.। তিনি এখনও পুরোপুরি বর্জ্য পদার্থ হন নি তা'হলে, শহর আর আরামের ঘেরাটোপের বাইরে আসতে ও চলতে ফিরতে তিনি তা'হলে পারতেও পারেন, যদিও কষ্ট খুবই হবে প্রথম প্রথম।

ভিগু বলল, সব ঠিকঠাক না হ্যায় সাব?

সব ঠিক ঠাক। নাল্লামেভি উতর গ্যায়াথা। উঁহা মীট্টিভি মিল গ্যয়া। সাফ পানি থা।

তারপর বললেন, জঙ্গলেই যানা হোতা তো আওরৎ লোগ কওন টাইম মে যাতি?

উনোনে সব সুরজ উঠনেকে পহিলে পহিলেই যাতি হ্যায়। দিদিভি গ্যায়ীথি। ই দেহাত জঙ্গল কি এহি রেওয়াজ। ফির সাম মে সুরজ ঢলনেকো পহিলে পহিলে এক দফে যাতি হ্যায়। জাগে সব অলগ অলগ হ্যায় না। যাঁহা মর্দলোগ যাতা আওরতলোগ হুঁয়া না যাতি।

একটা ছোট্ট পাখি ফিচিক ফিচিক করে ডাকতে ডাকতে উড়ে গেল সবুজ শালের চারায় কাঁপন তুলে। ঐ চারার ওপরেই বসেছিল সে।

কি পাখি ওটা?

এইচ. পি. শুধোলেন।

ফিচফিচিয়া।

এমন সময়ে ট্যাঁ ট্যাঁ ট্যাঁ কর্কশ শব্দ করে কচি-কলাপাতা-সবুজ একঝাঁক টিয়া উড়ে চলে গেল মাথার ওপর দিয়ে।

ভিগু বলল, হারামজাদা।

এইচ. পি. বললেন, এমন সুন্দর পাখিগুলো কি দোষ করল?

দোষ? ব্যাটারা তো ফসল খেয়ে শেষ করে দেয়। আর একমাস পরেই মকাই পাকবে। পেকে গেলে তার ওপরে এক ঝাঁক সুগা এসে পড়লে সব মেহনত আর আশা সাফ হয়ে যাবে পনেরো মিনিটের মধ্যে। ওরা আমাদের দুশমন।

বলে কি ছেলেটি! টিয়া পাখি, চন্দনা পাখি তো শহরের মানুষদের কাছে বড় আদরের ধন আর জঙ্গলের মানুষদের ওরা এমন শত্রু তা তো জানা ছিল না।

দূর থেকে একটা পাখির ডাক টিউ টিউ টিউ করে ভেসে আসছিল।

এইচ. পি. শুধোলেন, ওটা কি পাখি?

কালি তিত্বর। তিত্বরভি হ্যায়। তিত্বর বহুত তেজ বোলতা হ্যায়। বহত হ্যায় হিঁয়া।.

ছবি দেখেছেন বটে পাখির বইয়ে, ব্ল্যাক প্যাট্রিজ। মনে পড়ল এইচ. পি.-র।

এমন সময়ে ক্কেঁয়া - আ - আ করে তীক্ষ্ণ স্বরে খুব জোরে কি একটা ডেকে উঠল সারা বনে অনুরণন তুলে।

চমকে উঠে এইচ. পি. বললেন, ঈ কওন জানোয়ার হ্যায় হো?

ভিগু কলকাতার ডাকসাইটে উকিল সাহেবের অজ্ঞতাতে হেসে ফেলল। বলল, ঈতো মোর বা। শাওন কি মাহিনামে মোর নেহি বোলেগা তো কব বোলেগা?

এই কেকাধ্বনি! অবাক হয়ে শুনলেন এইচ. পি.।

আর একটু এগিয়ে গিয়ে বাঁদিকে চেয়ে দেখলেন অনেকখানি জায়গা জুড়ে নানা গাছ—যেসব গাছের মধ্যে দু'একটি তাঁর চেনা, যেমন কেসিয়া. নড্যুলাস, গোলমোহর। জঙ্গলের গাছ তো উনি চেনেন না কিছুই।

এগুলো তো জঙ্গলের গাছ নয়।

নাই তো। দিদি অনেকগুলো লাগিয়েছেন আর দে সাহেব লাগিয়েছেন দিদিরও পাঁচ বছর আগে থেকে। এগুলো সব ফুলের গাছ। এইসব গাছের চারা ও বীজ কিনতে আসতে শুরু করেছে ডালটনগঞ্জ. রাঁচি এবং হাজারিবাগের মানুষেরা।

গাছগুলো তুমি চেনো?

না, না, আমি চিনি না। দিদি চেনে।

দিদি এখন কোথায় গেল ওই মেয়েদের নিয়ে?

স্কুলে। স্কুল আছে যে।

কোন ক্লাস অবধি পড়ানো হয় এখানে। এই সব মেয়েরাই পড়াশোনা জানে? লিখতে পড়তে জানে?

লিখা-পড়ার স্কুল নেহি সাব। ওখানে নানা হাতের কাজ শেখানো হয়। সেলাই, চামড়ার কাজ, বাঁশের ঝুড়ি বানানো, পোড়া মাটির নানা জিনিস বানানো। এই সব বানিয়ে লাতেহারের কো-অপ্-এ সাপ্লাই দেয় সব। সেখানে বিক্রি হয়। অন্যান্য নানা জায়গাতেও হয়। সেই স্কুলে চাষ-বাসের কাজ, মাছ চাষের কাজ এসবও শেখানো হয়। গোবর-গ্যাসের মেশিনও আছে। সোলার হিটার, সোলার লাইট।

তুমি কি ইংরেজি জানো ভিগু?

দিদি শিখিয়েছেন একটু একটু। এবারে তো আপনি এসেছেন তাই কাল সন্ধেবেলা গল্পটল্প হল। নইলে অন্য সময়ে সন্ধের পরে দিদি আমাকে আর সুরাতিরা দিদিকে ইংরেজি আর হিন্দি পড়ান। ভরতদাদা শিখতে চায় না। বলে, উমর বিত গ্যয়া।

এইচ. পি. একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। উমর বীত গ্যয়া।

আমাদের খাতা-বইও আছে। দিদি এলে খুব মজা হয় আমাদের।

দিদি কি রাঁচি হয়েই আসেন?

ঠিক নেই। অনেক সময়ে টোড়ি হয়েও আসেন, অনেক সময়ে ডালটনগঞ্জ হয়েও আসেন। এখন নাকি শক্তিপুঞ্জ বলে গাড়ি হয়েছে। - কলকাতা থেকে বিকেলে রওনা হলে একেবারে ভোরে ডালটনগঞ্জে এসে পৌঁছয়। আর ডালটনগঞ্জ থেকে বাসে সারাঙ্গার মোড়ে নামলেও রাঁচি হয়ে আসার মতোই সময় লাগে বাসে।

ডেরাতে পৌঁছলে নাস্তা নিয়ে এল সুরাতিয়া। সুরাতিয়া এমনিতে এখানে থাকে না। দেবী এলে দেবীর জন্যেই আসে। হাতেগড়া আটার রুটি আর আলুর চোকা এবং আবার সেই চা। সকালে উঠেই জঙ্গলে হেঁটে যাওয়া-আসাতে ক্ষিদে ক্ষিদে পেয়েছিল এইচ. পি.-র। খিদে যে কাকে বলে তা ভুলেই গেছেন। রাতে দু'তিনটি হুইস্কি খেলে একটু খিদে খিদে মনে হয়, ঐ আর কি। খিদের মুখে ওই খাবারই অমৃত বলে মনে হল। ভিগুকে জিজ্ঞেস করলেন, দুপুরে কি খাওয়া হবে?

চাউল, মুঁগ কি ডাল, বাইগন ভাজি আর চালোয়া মাছ্ ভাজা। মাছ্ যদি পায় চানোয়া। এখন নদীতে অনেক জল। মাছ পাওয়া মুশকিল। নইলে আগুা হতে পারে। ঠিক জানি না। দে সাহেব এলে রাঁচি থেকে রুই মাছ নিয়ে আসবেন বলেছিলেন কাল।

তোমরা কি এই চালই খাও বাড়িতে? মানে, তোমাদের গ্রামে?

আমরা? চাল? চাল তো হুজৌর শাদী-টাদীর খানা থাকলেই খাই। নইলে আমরা ভাত রোজ থোড়ি খেতে পারি। রোজ ভাত তো আপনাদের মতো বড়লোকেরাই খেতে পারে। তবে এখানে কাজ করি বলে আমি, আমরা খাই। বস্তির লোকেরা ভাত পাবে কোত্থেকে।

তা'হলে তোমরা রোজ কি খাও?

বাজরার রুটি খাই, সুখা মহুয়া সিদ্ধ করে খাই, কখনও কান্দা-গেঠিও খাই। সরগুজার তেল দিয়ে ভেজেও নিই অনেক সময়।

কান্দা-গেঠিটা কি জিনিস ভিগু?

জঙ্গলের মূল বাবু। আমরাও খুঁড়ে আনি, শুয়োরেরাও খুঁড়ে খায়। ওলের মতো, তবে তেতো হয় খেতে। সারারাত ঝর্নার জলে ধুয়ে নিলে তেতো একটু কমে। ধান হয় চিনামিনা, সাঁওয়া এই সব। ছোট ছোট চাল হয় তাতে। ওই সব ধান আমরা এই জঙ্গল পাহাড়ের মানুষেরাই চাষ করি, ছোট ছোট জমিতে, আমরাই খাই।

নাস্তার পরে পরেই একটা জীপের শব্দ শোনা গেল। দেখা গেল, ইন্দ্রজিৎ দে সাহেব আর ওঁর স্ত্রী সুমিতা দেবী আসছেন। এখন মনে হচ্ছে এইচ. পি.-র যে, ওপেল গাড়িটা রাঁচিতে ফেরত না পাঠালেই ভাল হতো। বাজার দোকান করানো যেত ইচ্ছে করলে। কিন্তু পরের গাড়ি মিছিমিছি আটকে রাখতে বিবেকে বাধল। যেদিন ফিরবেন সেদিন দুপুরে আবার চলে আসবে এমনই বলে দিয়েছেন সানেকা মুণ্ডাকে। এখানে ইলেকট্রিসিটি নেই বলে মোবাইল ফোনটা রিচার্জ করা যাচ্ছে না। ব্যাটারিটা বসে গেলেই খামোকা খরচ হবে।

দে সাহেব জীপ থেকে নেমেই বললেন, আমাকে ফোনটা দিয়ে দিন, পুরো চার্জ করিয়ে পরশু নিয়ে আসব। আমারটা বরং আপনি রাখুন। পুরো চার্জ দেওয়া আছে।

থ্যাঙ্ক উ্য। তবে আপনারটা রাখার দরকার নেই। দু'দিন ফোন না থাকলে আর কি হবে। ফোন একটা যন্ত্রণা। মোবাইল ফোন আরও যন্ত্রণা।

মিসেস দে বললেন, এখানে কষ্ট হচ্ছে তো?

মিথ্যে বলব না। তা একটু হচ্ছে। তবে আনন্দও কম হচ্ছে না। আনন্দটা কষ্টের চেয়ে অনেকই বেশি।

তা হলেই ভাল। দেবী কোথায় গেল?

বলল, স্কুলে যাচ্ছি।

সেখানে তো জীপ যাবে না। একটা ছোট্ট নালার ওপরে ব্রিজ আছে পথে, সেটা ভেসে গেছে বানের তোড়ে গত রবিবারে। হেঁটে যাওয়া যেতে পারে কিন্তু খুব উঁচু চড়াই আছে পথে — আপনার পক্ষে অসুবিধের হবে।

হ্যাঁ। আমি পারব না।

আপনি জিপে করেই চলুন। আপনাকে ঘুরিয়ে আনি।

দে সাহেব বললেন।

কোথায়?

আরে চলুনই না। আমাদের এখানে যেদিকে পা বাড়াবেন সেদিকেই আনন্দ, সেদিকেই ছুটি, বিশেষ করে আপনার মতো মানুষের কাছে, যাঁরা ইট-চাপা ঘাসের মতো প্রকৃতি-বিবর্জিত জীবন কাটান। প্রকৃতি আর জীবন যে সমার্থক একথা কয়েকবার এলেই বুঝতে পারবেন।

সুমিতা বললেন, ওঃ। আপনার জন্যে একটু মাছ ও পাঁঠার মাংস এনেছেন উনি আর আমি এনেছি ফুল। ভুলেই গেছিলাম।

ফুল? কী ফুল?

আমার বাড়ির ফুল। স্বর্ণচাঁপা।

বাঃ।

বিছানাতে রেখে দেবেন শোবার সময়ে।

ফুলশয্যা হবে বলছেন?

ভাবলে, তাই।

থ্যাঙ্ক উ্য।

তারপর ভিগুকে ডেকে বললেন, আমরা তাহলে যাচ্ছি ভিগু। তুমি এগুলো সব নিয়ে গিয়ে সুরাতিয়াকে আর ভরতকে দাও, যা করার করবে। মাছটা দুপুরে রাঁধতে বোলো আর মাংসটা রাতে। সাঁতলে রাখতে বোলো।

জিপ স্টার্ট করার পরই সুমিতা বললেন, আমাকে বরং ঝরিয়া নালার ভাঙ্গা-ব্রিজের কাছে নামিয়ে দাও। আমি স্কুলেই যাই। দেবী একা হিমসিম খাবে। আজই তো খুলছে স্কুল। অনেকদিন পরে।

ঠিক আছে যেমন বলবে।

দে সাহেব বললেন।

মাহিন্দ্রর কম্যান্ডার জিপ। দে সাহেব স্টিয়ারিং-এ, মধ্যে মিসেস দে আর বাইরের দিকে এইচ. পি.। জঙ্গলের পথে কিছুটা গিয়েই সকালে যে ফুলের গাছে ভরা বনটি দেখেছিলেন এইচ. পি. তারই পাশে এসে জিপ দাঁড় করালেন দে সাহেব। বললেন, দেখুন আমি আর দেবী মিলে যেমন ফ্লাওয়ারিং ট্রি-র বন করেছি। এই সব গাছের চারা আর বীজ বিক্রি করে আমাদের প্রজেক্টের অনেক রোজগার হবে ভবিষ্যতে। রোজগার এখনই আরম্ভ হয়ে গেছে। আসুন, নামুন, গাছগুলো চেনাই। ফুল তো এখন অধিকাংশ গাছেই নেই। আমাদের এই বনের আসল রূপ যদি দেখতে চান তো হোলির সময়ে আসুন একবার। রং-এর দাঙ্গা কাকে বলে দেখতে পাবেন।

জিপ থেকে নেমে সামনেই যে গাছটা ছিল সেটাকে দেখিয়ে বললেন, এই দেখুন সারাঙ্গা। এই গাছের নামেই আমি এই প্রজেক্টের নাম রেখেছিলাম সারাঙ্গা।

সারাঙ্গা কি হিন্দি নাম?

না, তা কেন? বাংলা নাম। ইন ফ্যাক্ট এই গাছের হিন্দি নাম আদৌ আছে কি না জানি না। থাকলেও আমার জানা নেই। এর ইংরেজি নাম আছে অবশ্য অনেকগুলো যেমন নিকারাগুয়ান শেড ট্রি, মাদার অফ কোকো, ইত্যাদি। এদের আদি নিবাস আমেরিকার ক্রান্তীয় অঞ্চলে। পর্ণমোচী গাছ এটি।

মানে?

মানে, ডিসিডুয়াস। যাদের পাতা ঝরে যায় এবং আবার গজায়। ছেলেবেলায় পড়েন নি? "এসেছে শরত হিমের পরশ লেগেছে হাওয়ার পরে" ... আমলকী গাছের পাতা খসানোর সময় এসেছে, এইসব? তিন থেকে আট মিটার অবধি উঁচু হয় গাছগুলো। ফেব্রুয়ারি মার্চ-এ ফুল আসে। তবে তিন সপ্তাহের বেশি থাকে না।

কেমন দেখতে এই সারাঙ্গার ফুল?

হালকা গোলাপি থেকে হালকা বেগুনি। নিস্পত্র গাছে যখন ঠাসা থোকায় ফুল আসে তখন গাছতলি ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করে না। এই অঞ্চল ছাড়া আমাদের প্রজেক্টের প্রায় পুরো এলাকাতেই এই গাছ লাগিয়েছি। আর চার বছর পরে সব গাছে যখন ফুল আসতে আরম্ভ করবে তখন যা দেখাবে তা ভাবলেও রোমাঞ্চ হয়। হর্টিকালচার গার্ডেন হয়ে যাবে।

আমি শুধু এই দুটি গাছকেই চিনি, কেসিয়া নোডোসা আর গোল্ডমোহর মানে কৃষ্ণচূড়া। আমার বাগানে আছে।

কেসিয়া নোডোসা, কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া এখন ক্লিশে হয়ে গেছে। সবাই ওই গাছই চেনে এবং লাগায় অথচ আরও কত ফুলের গাছ যে আছে কী বলব। সেশ্যেলস দ্বীপপুঞ্জে এক রকমের গাছ হয় তাদের নাম ফ্র্যামবয়ান্ট। কী আশ্চর্য লাল ফুল যে ফোটে সে গাছে। আমার এক বন্ধু নিয়ে এসে দিয়েছিল, এখানে এবং বারিয়াতুতেও লাগিয়েছিলাম। কিন্তু বাঁচাতে পারি নি। সেশ্যেলস-এর Endemic গাছ। এখানের কৃষ্ণচূড়ার সঙ্গে ফ্র্যামবয়ান্টের মিল আছে যদিও।

Endemic মানে? এইচ. পি. শুধোলেন।

মানে নেটিভ আর কি।

সুমিতা বললেন। ঐ দেখুন! ঐ যে ম্যাজেন্টা রঙা ফুল ফুটে আছে গাছে, ঐ গাছটার নামই ম্যাজেন্টা। এদেশে এসেছে এ গাছ বেশিদিন নয়। তবে এসেই খুব জনপ্রিয় হয়েছে। প্রায় সব ঋতুতেই ফুল হয়।

ওটা কি গাছ?

ওটির নাম বসন্তী। বসন্তে ফোটে। হলুদ ফুল ... পাতা ঝরে যাওয়া গাছে যখন রাশি রাশি হলুদ ফুল ফোটে তখন ভারি সুন্দর দেখায়।

এইচ. পি. বললেন, এরই একটি চারা এনে দিয়েছে দেবী আমাকে ঝাড়গ্রাম-এর "হর্টিকালচারাল এরেনা" থেকে।

এখান থেকে বীজ নিয়ে গেলেই পারত। পাগলি একটা। বীজ থেকেও এই গাছ হয়। দু-তিন বছরেই ফুল দেয়। এটা ট্যাবেবুইয়া ভ্যারাইটির ফুল, হলুদ যেমন হয়, তেমন সাদা, বেগুনী এবং গোলাপিও হয়। এরা বিগনোনিয়েসী গোত্রের গাছ সব।

এখানে অন্যান্য রঙের লাগালেন না ট্যাবিবুইয়া?

ভুল হয়ে গেছে। আগামী সপ্তাহেই লাগাব। এখনও বৃষ্টি হবে মাসখানেক। ধরে যাবে গাছ।

বলেই বললেন, ওই দেখুন ওই গাছটি। ওর নাম সিলভার ওক। বাংলা নামটি ভারি সুন্দর। কি নাম? রূপসী। আদি নিবাস কুইন্‌সল্যান্ড ও নিউ সাউথ ওয়েলস। আন্দামান দ্বীপপুঞ্জেও দেখা যায় এদের। প্রজাতিগত নাম রোবাস্টা। Robust থেকে। খুব উঁচু হয় গাছগুলো প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিটার মতো। এদের ফুল আসে এপ্রিল থেকে জুন-এ।

এবারে সুমিতা বললেন, আপনার জন্যে যে ফুল নিয়ে এলাম সেই ফুলের গাছ দেখুন, কনকচাঁপা। সেই আমাদের ছেলেবেলার ভুঁড়োশিয়ালির কনকচাঁপা। এর সংস্কৃত নাম কর্নিকারা। বাংলাতে এর আর একটি নাম আছে। মুচকুন্দ। সে নামটা আনরোম্যান্টিক। এই গাছের ফুল কিন্তু হয় বসন্তে ও গ্রীষ্মে। অনেকদিন আগে ফুল শেষ হয়ে যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু আমাদের বারিয়াতুর প্রজেক্ট এরিয়ার মধ্যে একটি গাছ কেন যেন এখনও ফুল দিচ্ছে। হয়ত আপনি আসবেন বলেই।

দে সাহেব বললেন, ওই যে উঁচু গাছটা দেখছেন, ওটি হল স্বর্ণচাঁপা। ভারতীয় বন বিভাগের সমীক্ষা অনুযায়ী এই গাছই ভারতের বনের মধ্যে সবচেয়ে উঁচু গাছ। প্রায় তিরিশ মিটার অবধি উঁচু হয়। চন্দনদস্যু বীরাপ্পনের কোল্লেগালের জঙ্গলে, মানে নীলগিরি হিলস-এ, এরা যত বড় হয় তত বড় আর কোথাওই হয় না।

ফুল কখন হয়?

শরতে আর বসন্তে। পুজোর সময়ে আসবেন। ফুল দেখাব। গন্ধে ম ম করবে বন তখন।

সুমিতা বললেন, সত্যি! এই তোমার দোষ। তোমাকে একবার গাছে পেলে তুমি একেবারে গেছো ভূত হয়ে যাও। গাছ থেকে মোটে নামতেই চাও না। চলো এবার। আমার তো ওখান থেকে হেঁটে যেতেও প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট লাগবে। কখন পৌঁছব, কখন ফিরব, কখন তোমরা খাবে।

তোমরা না ফিরলে খাব না আমরা।

চলো।

চলো, বলে জিপে উঠলেন সকলে।

দে সাহেব বললেন, আপনাকে ফেরার সময় আবার চেনাব গাছ। আকাশমণি বা আফ্রিকান টিউলিপ আছে, শ্বেতচাঁপা, আকাশনিম, নাগলিঙ্গম সব দেখাব।

ওঁকে শিরিষ, কুর্চি আর গুলঞ্চ গাছও দেখিয়ে দিও।

সুমিতা বললেন।

এইচ. পি. বললেন, আপনাদের একবার আমার রাজপুরের বাগানে নিয়ে যাব। কিন্তু বনের মধ্যে গাছপালার যা শোভা, তা কি শহরে খোলে! রাজপুরও আর আগের রাজপুর নেই। শহর হয়ে গেছে।

তার চেয়ে আপনিই বরং এখানে চলে আসুন। ঝাড়খণ্ড হওয়ার পরে তো রাঁচিই ক্যাপিটাল হয়ে গেছে। এখন আপনাদের মতো সিনিয়র কাউনসেল-এর

এখানে চাহিদা হবে। আপনার কথা বলছিলেন বীরু রায় এবং তাঁর জুনিয়র রবি সরকার। আপনাকে তো ওঁরা চেনেন। হয়ত এসেও পড়বেন দু'একদিনের মধ্যে সারাঙ্গাতে আপনার সঙ্গে দেখা করতে।

বীরু রায়? ও হ্যাঁ! হ্যাঁ! চিনি বই কি। ভাল উকিল তো। রবি সরকারকে তো ঠিক চিনলাম না।

খুব লম্বা ছ'ফিট দুই-টুই হবে, কালো, ছিপছিপে, কার্মাটোলিতে বাড়ি।

ওও হ্যাঁ চিনেছি। সে তো কলকাতাতেও আসে প্রায়ই। হাইকোর্টে নয়, অন্যান্য কোর্টে অ্যাপিয়ার করে। আমার জুনিয়র শ্যামল সেন বলছিল, সেদিন রাঁচির কথা ওঠাতে। বীরু কি সেই সার্কুলার রোডেই থাকে? কি একটা হোটেলের পেছনে যেন।

অপ্সরা।

হ্যাঁ হ্যাঁ।

লালপুরে বাড়ি না?

তার দাদা তো জজ ছিলেন রাঁচি হাইকোর্টের। বীরুর বাড়িতে জব্বর নেমন্তন্ন খাইয়েছিল একবার। এবং ভাল হুইস্কি। নিজে নিয়ে এসেছিল চার লিটারের বোতল, জনি ওয়াকার ব্লু-লেবেল-এর, স্টেটস থেকে আসবার সময়। সে সব অনেক দিনের কথা।

তবে তো আপনি জানেন-চেনেনই। এখানে একটা গ্রাম অ্যাডাপ্ট করে সেই গ্রামেই থেকে যান। মাসে দু'তিনটে মামলা করবেন। আপনার যা ফিস তাতে একটা পুরো গ্রামের খোরপোস চলে যাবে।

গ্রামও অ্যাডাপ্ট করা যায় নাকি? আজকাল তো ছেলেমেযে অ্যাডাপ্ট করার হিড়িক পড়েছে।

তা পড়েছে। কিন্তু পুরো গ্রাম অ্যাডাপ্ট করলে তো সব ছেলেমেয়ে এবং তাদের মা-বাবারাও আপনারই পুষ্যি হবে। কত বড় স্যাটিস্‌ফ্যাকশন বলুন তো।

এমন হয় না কি?

হয় না? দেবী কিছু বলে নি আপনাকে?

কই না তো।

তা'হলে বলবে পরে।

অ্যাডাপ্ট করতে কত টাকা লাগে?

এক লাখ মতো। আপনার তো হাতের ময়লা। চলে আসুন। বী ওয়ান অফ আস। প্রকৃতির মধ্যে থাকবেন, কী ডিজেল আর পেট্রলের ধোঁয়ার মধ্যে খাবি খান কলকাতাতে চ্যাটার্জি সাহেব। কলকাতাতে কোন মানুষে থাকে? তার অন্য কোন উপায় থাকলে?

তা ঠিক। অন্যমনস্কর মতো বললেন এইচ. পি.। তারপর বললেন, সম্ভবত অভ্যেসে থাকে। কলকাতা অজগর সাপের মতো। আমাদের গিলে ফেলেছে। এখন সে নিজে যদি দয়া করে উগরে দেয় তা'হলেই মুক্তি, নচেৎ নয়।

ততক্ষণে জিপটি সেই ভাঙা ব্রিজের নদীর কাছে এসে পৌঁছে গেছে। নদীতে

প্রায় হাঁটু জল। বেশ স্রোতও আছে। মধ্যিখানে আরও বেশি হতে পারে। চ্যাটার্জি সাহেব বললেন, সুমিতাকে, ওপারে যাবেন কি করে!

কেন? শাড়িটা একটু তুলে নেব। পায়ে তো গল্‌ফ শু। ভিজে গেলেও শুকিয়ে যাবে কিছুক্ষণের মধ্যে।

এইচ. পি. বললেন, দেবীও কি এই ভাবেই নদী পেরিয়ে গেছে?

অবশ্যই। আর কি ভাবে যাবে! ও কি আজ জিনস পরেছিল?

হ্যাঁ।

তবে ভিজবে ওটা। মেয়েটা শাড়ি যে কেন পরে না কে জানে। এত সুন্দর দেখি আমি ওকে শাড়ি পরলে।

চ্যাটার্জি সাহেব চুপ করে রইলেন। শাড়ি পরা দেবীকে দেখেন নি উনি কখনওই। তবে অন্য পোশাকেও উনি যথেষ্ট সুন্দরীই দেখেন।

তারপর মিসেস দে বললেন, শাড়ি পরার এই সুবিধা।

লুঙিরও।

দে সাহেব বললেন।

ভদ্রলোক লুঙি পরে না।

টা-টা। দুপুরে দেখা হবে।

বলে, সুমিতা জিপ থেকে নেমে নদীতে নামলেন। দে সাহেব জিপটা ঘুরিয়ে নিলেন।

যেতে যেতে মাঝ নদীতে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে বললেন, আমরা মেয়েদের সঙ্গে ওখানেই কিছু খেয়েও নিতে পারি। কাজ যদি শেষ না হয় তবে তাই করব। তোমরা দুটো অবধি দেখে খেয়ে নিও কিন্তু। চ্যাটার্জি সাহেবকে উপোসী রেখো না।

এই গভীর জঙ্গলের মধ্যে একা একা অত খানি পথ যাবেন উনি? যাওয়াটা কি সেফ হবে?

চ্যাটার্জি সাহেব বললেন।

বুনো জন্তুর ভয় দিনে নেই বললেই চলে। তবে বনের জানোয়ারদের ভয় আমরা করি না। মানুষদেরই করি—তাও বনের মানুষদের নয়। শহরের জানোয়ারেরা এমন পথে সুমিতা বা দেবীকে একা পেলে জিপে উঠিয়ে নিয়ে যাবে হয়ত। শহরের মানুষমাত্রই সেক্স-স্টার্ভড। কেন এমন হয় জানি না। হয়ত প্রকৃতি-বিবর্জিত জীবন বলেই হয় এমন। এ নিয়ে গবেষণা হওয়া দরকার। এখানে শহুরে মানুষেরা নেই তাই বাঁচোয়া কিন্তু শহরের প্রভাব খুব দ্রুত এসব জায়গাতেও দূষণ ছড়াচ্ছে।

হঠাৎ? কি করে?

টিভির মাধ্যমে। ভবিষ্যতের কথা ভবিষ্যতই জানে। তবে কলকাতাতে তো হেঁটে গেলে যখন তখন বাস-মিনিবাস-গাড়ি চাপা পড়েও মরতে পারে মানুষ। এখানে বিপদ-আপদ সেই তুলনাতে নেই-ই বলতে গেলে। তা'ছাড়া এই পুরো অঞ্চলে সুমিতা এবং দেবীকে সকলেই চেনে, ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে। আমরা তো

ওদের শোষণ করতে আসি নি। সম্পূর্ণ স্বার্থহীনভাবে ওদের ভাল করতেই এসেছি। এবং ভাল করছিও। মিশনারীদের পর্যন্ত কখনও কখনও কোনও ভেস্টেড ইন্টারেস্ট থাকলেও থাকতে পারে, সে তারা যে ধর্মাবলম্বীই হন না কেন, যেমন· ধর্মান্তকরণের, কিন্তু আমাদের তো কিছুমাত্রই স্বার্থ নেই। সে কথা পঞ্চাশ বগ মাইল এলাকার মানুষে জানে। ওদের বিপদ কেউ ঘটালে তার সাংঘাতিক বিপদ ঘটাবে জঙ্গলের বাসিন্দারাই।

৬

বেলা দেড়টা নাগাদ দে সাহেব হাতঘড়ির দিকে চেয়ে বললেন, জিপটা নিয়ে আমি ওই ব্রিজটার কাছে গিয়ে বরং দাঁড়াই একটু। অন্তত আধ মাইল তো কম হাঁটতে হবে ওদের। যদি ফিরে আসে।

তা ঠিক।

বলেই. ভিগুকে ডেকে বললেন, দো বাজি খনা লগা দেনা। ম্যায় লওট আয়েঙ্গে। খ্যয়ের, ম্যায় নেহি ভি আয়া. তো সাহাবকো বৈঠাকে মত রাখ না, সমঝা? সাহাবকো খিলা দেনা।

জী হুজৌর।

দে সাহেব চলে গেলে এইচ. পি. ভাবছিলেন, স্বামী-স্ত্রীর সমস্ত বিষয়ে সমান আগ্রহ থাকলে দাম্পত্য সম্ভবত এমনই মধুর হয়। তাছাড়া ইন্দ্রজিৎ এবং সুমিতার দম্পতিটিকে প্রকৃতিও এক অন্য মাত্রা দিয়েছে। অবিবাহিত এইচ. পি., দাম্পত্য সম্বন্ধে কিছুই বোঝেন না কিন্তু এই দম্পতিটাকে দেখে বিয়ে যে কেন করেন নি সময়ে তা ভেবে ভারি আক্ষেপ হচ্ছে। তবে সকলেই বলে, বিয়ে তো দিল্লিকা লাড্ডু, যো খায়া উও পস্তায়া, যো নেহি খায়া উওভি। আবার দেবীর দাম্পত্যর রকম সম্বন্ধে যা শুনেছেন তাতে গভীর ঔৎসুক্য জন্মেছে সেই দাম্পত্য সম্বন্ধেও।

তবে ওই সম্পর্ককে কি দাম্পত্য আদৌ বলা চলে?

তারপর ভাবলেন, তবে কি লাম্পট্য বলবেন? না, তাও তো নয়। ওরা তিন জনে লুকিয়ে-চুরিয়ে তো কিছুই করছে না। যা করছে তা তো বুক ফুলিয়েই করছে এবং তিন জনের একে অন্যের মধ্যে সম্ভবত এক আশ্চর্য সমঝোতাও আছে। এমন সম্পর্কর কথা আগে কোন বইতেও পড়েন নি, এইচ. পি., দেখেন তো নিই। মনে হয়, দেবী অত্যন্ত সৎ ও সাহসী মেয়ে নইলে এইচ. পি.-র কাছে তাদের ঐ অদ্ভুত ত্রিভুজ সম্পর্কর কথা সে একটুও লুকোচাপা না করে বলত না। তাছাড়া দেবীর সঙ্গে তাঁর আলাপই বা কত দিনের? তাও তো বলতে গেলে ফোনে ফোনেই। দেবী তো দূরভাষিণীই।

চাঁর গাছ তলাতেই বসেছিলেন এইচ. পি.। আকাশে একটু একটু করে মেঘ জমছে। হয়ত দুপুর বা বিকেলের দিকে বৃষ্টি হবে। ঝিরঝির করে হাওয়া দিচ্ছে একটা নানা বনজ গন্ধ বয়ে। নানা রকম পাখি ডাকছে চারদিক থেকে। নাম জানেন না তাদের। আসলে তিনি কত কিছুই যে জানেন না তা এখানে না এলে বুঝতেনই না। তিনি যতটুকু জানেন তা শুধু টাকা রোজগার করতেই দরকার হয়। সে সব না জানলেও মানুষ হিসেবে তাঁর কোনও ক্ষতিই হতো না। বৃষ্টির আগে দেবীরা না ফিরলে তো ভিজে ঝোড়ো কাক হয়ে যাবে। হাতে তো দু'জনের কারোই কোন

ছাতা-টাতাও ছিল না। এঁদের যতই দেখছেন ততই অবাক হচ্ছেন এইচ. পি.। এঁরা প্রকৃতিরই কন্যা যেন।

এমন সময়ে দুটি ছেলে বছর তিরিশেক বয়স হবে, এক জন দেহাতি মানুষের মাথায় দুটি ব্যাগ এবং কাঁধে একটি গিটার ঝুলিয়ে শাল বনের মধ্যে লালমাটির পথটি যেখানে বাঁক নিয়েছে সেই বাঁকটি ঘুরে ডেরার দিকে এগিয়ে এল। এক জনের পরনে জিনস আর লাল গেঞ্জি। অন্য জনের পায়জামা-পাঞ্জাবি। খদ্দরের। দু'জনের চেহারাই বেশ ভাল এবং মনে হয়, ভাল পরিবারেরই ছেলে। গিটারটা দেখেই এইচ. পি. বুঝতে পারলেন এরাই দেবীর দুই সঙ্গী। গিটারের মালিকই নিশ্চয়ই বাংলা ব্যান্ড 'ঝঞ্ঝাটিয়া পাখিরা'র একজন। তবে গিটারটার মালিকানা জিনস-পরিহিতর না পায়জামা-পাঞ্জাবি পরিহিতর তা বোঝা গেল না।

ওই বাঁকের মুখে এসেই তারা দু'জনে একসঙ্গে হাঁক দিয়েছিল কোঈ হ্যায়? আরে হায় কোঈ? দেবীশ্রী কাঁহা হ্যায়?

এইচ. পি. বুঝলেন, দেবীর পুরো নাম তাহলে দেবীশ্রী। ছোট করে দেবী বলে। ছোট্টই তো নাম তার আবার ছাঁট-কাট-এর প্রয়োজন কি?

যে লোকটি ব্যাগ দুটি আর গিটারটি বয়ে নিয়ে আসছিল সেই গলা তুলে ডাকল আর-এ। হ্যায় কোঈ?

তার গলার আওয়াজে ওরা তিন জনেই একই সঙ্গে রান্নাঘর থেকে বাইরে এল। এতক্ষণ রান্নাঘর থেকে তাদের পুটুর পুটুর কথা শোনা যাচ্ছিল।

আগন্তুকদের মধ্যে একজন বলল, দেবীজী কাঁহা? দেবীশ্রী?

দিদি তো জঙ্গলমে গয়ী।

বয়স্ক ভরত বলল।

জঙ্গল মে মঙ্গল।

অন্য জন বলল।

খানাপিনা কুছ মিলেগা না? উনোনে হাম লোগোঁকো বারেমে কুছ বোলকে তো গ্যয়ী।

জী হাঁ। বোলিনথী যো আপলোগ কাল ইয়া পরশু আওবে কিজিয়েগা।

এক রোজ পহলেই আ পৌছা। পহিলে পৌছ গিয়া ইসলিয়ে ক্যা ভুখা রহনা পড়ে গা?

নেহি নেহি বাবু। ঈ কোঈ বাত হুয়া? সব ইন্তেজাম হো যায়গা।

তুমহারি দিদি কব লওটেঙ্গি?

কোঈ ঠিক নেহি হ্যায় বাবু।

তব হামলোগ কাঁহা আরাম করেগা, কওন কামরামে ঠাহরেগা ইসব বাতায়গা কওন?

ভিগু সেই দেহাতি লোকটিকে বলল, আরে এ লগন ভাইয়া, শামান সব বাঁয়াওয়ালা কামরামে রাখখো।

তারপর আগন্তুকদের দিকে ফিরে বলল, পানি—উনি পিজিয়েগা বাবু? চায়ে উয়ে লিজিয়েগা?

হাঁ। থোড়া পানি পিয়েগা আর থোড়া মাথামে ঢালেগা।

এক জন বলল, রসিকতা করে। কিন্তু ভিগু সে রসিকতা বুঝল না।

অন্য জন বলল, জঙ্গলে এলাম রাফিং করতে, দেবীর মোডাস-অপারাণ্ডি, ওয়ার্কিং প্লেস, লিভিং কম্‌ফর্টস দেখতে। আর সেই হাপিস।

তারপর ভিগুকে বলল, এই সময়ে কেউ চা খায়। দোঠো গ্লাস ঔর পানি লানে সকতা?

এবারে ওদের দেখে এইচ. পি.-র মনে হলো ওরা কিঞ্চিৎ ড্রাঙ্ক হয়েই এসেছে। সম্ভবত পথেই খেয়েছে। বাসে খেলে অন্য যাত্রীরা আপত্তি করতেন নিশ্চয়ই। এখন বাজে প্রায় দেড়টা। লাঞ্চ-এর আগে Boozing-এর সময় তো হয়েইছে।

ভিগু দুটি গ্লাস এবং জলের ঘটি নিয়ে এল।

এক জন বলল, লোটামে পানি। ঈরে বাবা। হামারা গা ঘিনঘিনি কর রহা হ্যায়। যো লেকে টাট্টিমে যাতা ঐ লোটামেই পানি পীতা। আঁ? তুম লোগ সাচমুচ জংলী হ্যায়।

ভিগু বলল, ছাইসে বহত আচ্ছাসে মলকে উসকো বাদ আচ্ছাসে ধোকর তবহি না পিনেকে পানি লেতে আয়া।

অন্য জন বলল, ছাড় তো। সময় চলিয়া যায় নদীর স্রোতের প্রায়। বোতলটা বের কর তোর ব্যাগ থেকে। নিপ দুটো তো শেষ করে দিলাম পথেই।

'নিপ্ট ইন দ্যা বাড' কথাটা কি এই নিপ থেকেই এসেছে না কি রে?

আমি কি করে বলব। আমি কি তোর মতো বিদ্বান, কপি রাইটার।

সেই কথাতে এইচ. পি. বুঝলেন যে, পায়জামা-পাঞ্জাবি পরা ছেলেটিই কিংশুক এবং অন্য জন অন্তু। অন্তুর পুরো নাম বলে নি দেবী তাঁকে।

অন্তু ব্যাগ থেকে একটা ব্লু রিব্যান্ড জিন-এর বড় বোতল বের করল এবং একটি ঠোঙাতে চুরমুর। তারপর কিংশুককে বলল ওরভি হ্যায়। ঘাবড়াও মত।

কিংশুক বলল, নিম্বু হ্যায়? নিম্বু?

ভিগু বলল। নেহি বাবু।

এমন সময়ে সুরাতিয়া বাইরে এল, সম্ভবত আগন্তুকদের ভাল করে দেখতে।

ভিগু বলল, আণ্ডা খাইয়ে গা আপলোঁগ?

কিসকি আণ্ডা?

অন্তু বলল।

তারপরে কিংশুক সুরাতিয়ার দিকে চেয়ে বলল, তুমহারি আণ্ডা?

এইচ. পি. ওখানে বসেছিলেন। এবার কিছু একটা বলা বা করা দরকার। তারা দেবীর লিভ-টুগেদারের পার্টনারই হোক আর যেই হোক, এনাফ ইজ এনাফ।

এইচ. পি. বললেন, আপনাদের পরিচয়?

পরিচয়?

ওরে! পরিচয়। কি পরিচয়? কার পরিচয়? আপনার কি পরিচয়? আপকি তারিফ?

আমার নাম এইচ. পি. চ্যাটার্জি।

ব্যারিস্টার?

এখন সবাই উকিল।

এইচ. পি. বললেন।

মাই! মাই! সরি স্যার। চিনতে পারি নি। অবশ্য আমরা দেখি নি তো আগে। আপনি যে এমন ধুমসো মোটা এক বুড়ো তা ভাবতেও পারি নি। দেবী এত কথা বলেছে আমাদের আপনার সম্বন্ধে।

ও হয়তো আমার পেশার কথা, নেশার কথা বলেছে, চেহারার কথা বলে নি। বলতে পারত।

তা হবে? দেবীকে আপনিই নিয়ে এলেন ফারস্ট এসির ক্যুপেতে করে? আপনিই সেই ফ্যাবুলাসলি রিচ ব্যারিস্টার।

ফিল্‌দি-রিচ বল্‌।

ইয়া। ফিল্‌দি-রিচ। ফর আ চেঞ্জ, তুই ঠিক বলেছিস কমরেড।

তা, দেবীকে কোথায় গুম করে দিলেন চ্যাটার্জি সাব?

কাজে গেছে। হয়ত খাওয়ার আগেই চলে আসবে। কিন্তু আপনাদের পরিচয় তো পেলাম না, যদিও আন্দাজ করতে পারছি।

কেন সারা রাত ধরে দেবীর সঙ্গে এলেন, দেবী আমাদের পুরো পরিচয় দেয় নি কি? সারা রাতেও টাইম হলো না?

দিয়েছে, মানে, সম্পর্কর কথাটা বলেছে কিন্তু ...

বলেছে? তা জানার পরেও মিস্টার ফ্যাটসো কোন সাহসে আপনি ক্যুপেতে দেবীর সঙ্গে রমদা-রমদি করতে করতে এলেন। সাহস তো কম নয়। আপনি শিগগিরি কিডন্যাপড হবেন। আপনাদের মতো খসসরদেরই কিডন্যাপ করা উচিত। তা না করল ব্যাটারা ভদ্রলোক পার্থ রায়বর্মনকে।

কিংশুক বলল, জিন চলবে নাকি একটু?

আমি দুপুরে খাই না বহু বছর। রাতে দুটো হুইস্কি খাই।

দুটো। যারা গুনে গুনে হুইস্কি খায় তারা মানুষ খুন করতে পারে, সুদের কারবার করতে পারে। তোমাকে, থুড়ি কি বলে ডাকা যায় বলুন তো আপনাকে। সতীনের পুংলিঙ্গ কি?

তুই না শালা কপি রাইটার। বাংলাতে না কি তোর দারুণ ফাণ্ডা, কবিতা লিখিস লিটল ম্যাগ-এ, লিরিক লিখিস, আর সতীনের পুংলিঙ্গ জানিস না?

বলেই, বোতলটা দেখিয়ে বলল, ঢাল না, ঢাল।

এইচ. পি. রীতিমত আতঙ্কিত বোধ করলেন। এই দুটি চরিত্রর সঙ্গে দেবী থাকে! দেবী সম্বন্ধেও ধারণা সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। 'স্ত্রীয়াশ্চরিত্রম দেবা নঃ জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ' মনে পড়ে গেল। তারাশংকরের দুই পুরুষ নাটকের ডায়ালগ। সংস্কৃত-টংস্কৃত এইচ. পি. বিশেষ জানেন না।

অন্তু বলল, লিরিক দে লিরিক। তবে না সুর কম্পোজ করব। নে একটা বড় ঢোঁক দে, মাথা খুলে যাবে।

দাঁড়া, দাঁড়া, ভাবতে দে। এ কি শালা তোর সকালবেলার পার্জিং? কমোডে

বসলাম আর হয়ে গেল। পার্জিং অবশ্যই, তবে ক্রিয়েটিভিটির পার্জিং। বাচ্চা প্রসব করার মতোই কষ্ট হয় একটা কবিতা লিখতে। বুয়েছিস। তাও সিজারিয়ান নারে শালা। নর্ম্যাল ডেলিভারি।

গিটারটা বেঁধে নিয়ে পীড়িং পীড়িং করতে লাগল অন্তু। করতে করতে বলল, দে দে। বডি এখন লিরিক চাইছে। লিরিক দে।

হঠাৎ কিংশুক বলল, এসেছে। নে ধর। গরম গরম। দাঁড়ে-বসা মুরগির ডিম যখন মুরগির পেট থেকে পড়ে তখন ক্যাচ করেছিস কি কখনও? করে থাকলে, তেমন করেই ক্যাচ কর।

যত বাতেল্লা পার্টির। দে দে লিরিক দে। বডি এখন গান চাইছে।

আজকে এই বাদল দিনে
সারাঙ্গাতে এসে
বড্ড ভালবেসে
দেখতে পেলাম ঘ্যাম ফ্যাটসো
কাঁটাল যেন ভুঁড়ি, থুড়ি থুড়ি থুড়ি।

এরপর অন্তরা। বল বল। বডি গান চাইছে।

সে যে মোদের সতীন,
তার বাপের নাম যতীন
আর তার সাঁটুলির নাম দেবী-ই-ই-ই...
আঃ। আঃ। আঃ। মাই বেবী-ই-ই...
ঝিংকু চিকুর! ঝিংকু চিকুর! ঝিংকু চিকুর!
কিরে!

এরপর অ্যারেঞ্জার মিউজিক দেবে।

সুর লাগা, কম্পোজিশনটা জমে গেলে 'ঝঞ্ঝাটিয়া পাখিরা'র পরের প্রোগ্রামে এটা গেয়ে দিস।

দাঁড়ানা! পঞ্চম আর ধৈবত এমন করে লাগাব না! শাল্লা! ঐরাবত বের হবে। তোর মুরগীর ডিম নয়। বল, বল, লিরিকটা রিপিট করে যা, সুর কম্পোজ করা কি সোজা কথা রে। এই ক্রিয়েশনের কথা যারা জানে, তারাই জানে!

তারপরই বলল, কিন্তু নোটেশন করবে কে? পরে যে ভুলে যাব। আমার কি মোটা দীনু আছে?

আমি টেপ করে নিচ্ছি, কলকাতা গিয়ে ভালুদাকে দিয়ে করিয়ে নিস।

বলেই, এইচ. পি.-র দিকে ফিরে বলল, স্যার। আপনি কি নোটেশান করতে পারেন? মানে, স্বরলিপি? দেবীজী তো আপনাকে স্যার বলেই ডাকে। আপনি আমাদেরও স্যার।

স্যার? না ষাঁড়?

আঃ হচ্ছেটা কি?

না, না, আমি বেরসিক নির্গুণ। অত বিদ্যা আমার নেই।

এইচ. পি. বললেন।

অন্তু বলল, ন্যাকা! বিনয় হচ্ছে!

কিংশুক বলল, অন্যগুণ না থাকলেও ছারগুণ আছে।

অন্তু বলল, আমাদের ক্ষমা করে দেবেন স্যার। খালি পেটে মাল পড়েছে, আমরা ড্রাঙ্ক হয়ে গেছি। আসলে আমরা ...

কিংশুক বলল, ছাড় তো! অত এক্সপ্লানেশন কিসের? মাল তো খায় মানুষে ড্রাঙ্ক হবার জন্যেই। অত এক্সপ্লানেশান কিসের? কারো বাপের পয়সাতে খাচ্ছি কি? নিজেদের কষ্টার্জিত পয়সাতেই খাচ্ছি।

এইচ. পি. ভাবলেন বলেন, সকলের পয়সাই কষ্টার্জিত। যাদের রোজগার কম শুধুমাত্র তারাই কষ্ট করে না রোজগার করতে। তবে হ্যাঁ, কষ্টের রকমটা আলাদা আলাদা হয় অবশ্যই। কিন্তু এদের এসব বলার মানে কি? এদের ওয়েভ-লেন্থ আর ওঁর ওয়েভ-লেন্থ একেবারেই আলাদা। এরাই যদি বাংলার যুব-সমাজের প্রতিভূ হয় তবে বাংলার ভবিষ্যৎ নিয়ে অবশ্যই চিন্তিত হওয়ার সময় হয়েছে।

এমন সময়ে জীপটা ফিরে এল। দে সাহেব একা। ওঁরা আসেন নি।

জীপ থেকে নেমেই বললেন, ও, তোমরা এসে গেছ। এসেই বসে গেছ।

ওরা বলল, কি করব দাদা, দেবী নেই, চেনা মুখের কেউ নেই, শুধু উনি।

এসেই বসি নি, দাদা। পথেও মহুয়া আর হুইস্কির নিপ খেয়েছি।

মহুয়া পেলে কোথা থেকে?

বাস থেকে নামবার পরে ওই যে মক্কেল মাল বয়ে আনলো, তাকে বলতেই সে যোগাড় করে দিল। হোয়্যার দেয়ার ইজ আ উইল, দেয়্যার ইজ আ ওয়ে।

তোমাদের চেনা করে নিতে আর কতক্ষণ লাগে? আলাপ আছে কি? চ্যাটার্জি সাহেবের সঙ্গে?

ছিল না। হল।

বলেই অন্তু বলল, একটা গান কম্পোজ করেছি এই মাত্র। শুনুন ইন্দ্রজিৎদা। লিরিক কিংশুক বন্দ্যোপাধ্যায়, কম্পোজিশান অন্তু দাস-এর।

বলেই, গানটি ধরে দিল।

গান শুনে ইন্দ্রজিৎ দে বললেন, গান-টান আমি বিশেষ বুঝি না। সুমিতা শান্তিনিকেতনে পড়েছিল, রবীন্দ্রসঙ্গীত গায় ও। তাই শুনে শুনে রবীন্দ্রসঙ্গীতই ভাল লাগে। মানুষের মনের এমন কোনও ভাব নেই যা রবীন্দ্রসঙ্গীতে নেই।

হাঃ রবিন্দরসঙ্গীত আর কে গাইবে? পীযূষদাই মরে গেলেন।

তিনি কে?

পীযূষকান্তি সরকার। তাঁর গান না হয় না শুনলেন, নামও শোনেন নি?

না।

আপনি টিভি দেখেন না?

না।

নিউজ পেপার পড়েন না?

না। সুমিতা আনন্দবাজার পড়ে। অভ্যেস, ছোটবেলার সময় পেলে আমিও চোখ বোলাই। সেখানে কি খবর বেরিয়েছিল?

নিশ্চয়ই।

তা'হলে তেমন ইম্পর্ট্যান্স দিয়ে বেরোয় নি।

আই পিটি উ্য। আর কি বলব।

কিংশুক বলল।

অন্তু বলল, পীযূষদাই মরে গেলেন। রবিন্দরসঙ্গীতও শেষ হয়ে গেল।

দে সাহেব ভিগুকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, ভাত আরও চাপিয়েছে কি না?

ভিগু বলল, ভাত তো চাপিয়েইছে বেশি করে তার ওপর মাছের ঝোলেও জল ঢেলে ঝোল বাড়িয়েছে। আলুও ভেজে দেবে সুরাতিয়াদিদি।

বেশ।

অন্তু বলল, আরেক লোটা জল আনো তো বাবা। শুধু জল দিয়ে খেতে মুখ মেরে যাচ্ছে, লেবু তো নেই-ই, জেরা মিরচা হবে?

লেবুও হবে। আমি নিয়ে এসেছি পথ থেকে। আজকে সঁসএ-র হাট ছিল। সুমিতা এত কিছু কিনল যে সে জন্যেই দেরি হয়ে গেল।

তারপর ভিগুকে ডেকে বললেন, দেখো ভিগু, জিপকা পিছুমে নিম্বু ঔর হরা মিরচা হ্যায়। ধো কর লাও পিরিচমে, বাবুলোগোঁকো লিয়ে।

জী হুজৌর।

এরা কি আপনাদের ক্রীতদাস নাকি? কথায় কথায় হুজৌর বলে কেন? কি বা মাইনে দেন এদের। দেওয়ার মধ্যে দু'বেলা খেতে দেন মাত্র।

সেটা ওদের চরিত্রদোষ, মানে সম্বোধনটা। পুরনো অভ্যেসে বলে। আসলে ওরা জানে যে, আমরা ওদের সহকর্মী। লাভের জন্যে তো এই এন জি ও চালাই না আমরা। তা ওরা ভাল করেই জানে।

এখানে তো এই সারাঙ্গা না বারাঙ্গাতে তো থাকা-খাওয়ার বিস্তরই অসুবিধা। আপনার বারিয়াতুতেই গিয়ে উঠলে পারতাম আমরা। সেখানে সব কিছুই ওয়েল অর্গানাইজড। ইলেকট্রিসিটি আছে, জেনারেটর আছে। খাওয়ার ঘর, টেবল-চেয়ার, রান্নার লোক, খিদমদগার। কমোডওয়ালা অ্যাটাচড বাথ ...

এই সারাঙ্গাতেও সব হবে একদিন। বারিয়াতুতে যখন প্রথম প্রজেক্ট করি তখন উদোম টাঁড় ছিল। আরম্ভ দেখেই মুষড়ে পড়লে কি হয়? আরম্ভটা তো বীজ। এই বীজ থেকেই মহীরুহ হয়।

এই আপনার দোষ দাদা, শুধু আপনারই নয়, আপনাদের সকলেরই, আপনাদের জেনারেশনের দোষ-এই জ্ঞান দেওয়া। একটা সিম্পল কোয়েশ্চেন-এর সিম্পল আন্সার আপনারা কখনও দেবেন না। জ্ঞান ঢোকাবেন, ফিলসফাইজিং করবেন। আপনারা সবাই এক রকম।

দে সাহেব সে কথার জবাব না দিয়ে বললেন, তোমাদের খেতে তো দেরি আছে। আমরা খেয়ে নিয়ে একটু বেরবো। ঠিক আছে তো?

আপনিই তো মালিক। আপনি যা বলবেন তাই ঠিক আছে। আবার এসব ভণ্ডামির দরকার কি?

কিংশুক বলল, তা যাবেন কোন দিকে?

এই জঙ্গলেই। মিস্টার চ্যাটার্জি প্রথমবার এলেন, একটু ঘুরিয়ে সব দেখাই। কত রকম প্রজেক্ট করছি আমরা। পনেরোটি গ্রামের মানুষ এতে সক্রিয় ভূমিকা নিচ্ছে। পঞ্চায়েতও অবশ্য পুরোপুরি ইন্‌ভলভড হয়েছে। ঝাড়খণ্ড হওয়াতে আমাদের কাজের অনেক সুবিধা হয়েছে।

এম সি সি-র ঝামেলা নেই?

প্রথম প্রথম ছিল, ছিল না যে তা নয়। গাছতলাতে বসে গ্রামের মানুষের সঙ্গে মিটিং করছি হঠাৎ অটোম্যাটিক রাইফেল হাতে এম সি সির আট-দশ জন অ্যাক্টিভিস্ট যেন আকাশ থেকে পড়ল। কালো জাম খাচ্ছিলাম আমরা গাছ থেকে পেড়ে। কালো জাম দিয়েই দুপুরের খাওয়া সারছিলাম। ওদেরও দিয়ে, পাশে বসতে বললাম। আমাদের প্রজেক্টের কথা বুঝিয়ে বলার পরে তারা বুঝল। গ্রামের সব লোকজনের সঙ্গেও কথা বলল। জঙ্গল পাহাড়ের মানুষের ভালর জন্যেই যে যা করার তা করছি, নিজেদের মুনাফার জন্যে নয়, সে বিষয়ে ওরা নিশ্চিত হওয়ার পরে বলে গেল, আপনাদের কাজে যদি কেউ বাধা দিতে আসে আমাদের জানাবেন, আমরা তাদের ধড়কে দেব।

বাঃ। হিতোপদেশের গল্পর মতো শোনাচ্ছে মাইরি। না রে কিংশুক।

অন্তু বলল।

ঈশপ্‌স ফেবল।

কিংশুক বলল।

তাই তো শোনাবে। আমরা যে অন্যের হিতই করছি।

দে সাহেব বললেন।

তারপর গলা তুলে বললেন, আমাদের দু'জনের খাবার দাও ভিগু, বেরোব আমরা।

অন্তু বলল, রিয়্যালি, বিশ্বাস করতেও কষ্ট হয়। দেবী যখন আপনার আর বৌদির কথা বলে উত্তেজিত হয়ে, তখন ওর মুখ চোখের ভাব বদলে যায়। নিজের লাভ ছাড়া এই পৃথিবীতে কেউ যে কিছু করতে পারে এ কথা ভাবাও আমাদের পক্ষে অসম্ভব। যারা তা করে বা করতে চায়, তারা পাগল ছাড়া আর কিছুই নয়, নয়ত ভণ্ড। তারা হয়ত কোনও Big bluff-এর অংশ। গুরুদের মতো, অমুক বাবা তমুক মায়ের মতো আপাত বুদ্ধিমান-বিদ্বান মানুষদের মেসমেরাইজ করে তারা যা বাগাবার বাগিয়ে নেয়। এইসব "কাল্ট"-এর বিরুদ্ধে আমরা আন্দোলন করছি। একদিন হয়ত আপনাদের এই ভড়কিবাজীরও শেষ দেখব আমরা। যাঁরা আপনাদের ডোনেশান দেয় তাঁদের কাছে আপনাদের এক্সপোজ করে দেব। আপনারা সেয়ানা পাগল, পাগল নন।

জেনুইন পাগলও তো হতে পারি। আফটার অল, থাকি তো রাঁচিতেই। কাঁকের মেন্টাল হসপিটাল তো কাছেই।

দে সাহেব বললেন।

সে আমরা দেখব। দেবীকে কী গুণ করেছেন আপনি এবং আপনারা জানি না আমরা কিন্তু ওকে এই চক্কর থেকে মুক্ত করবই। সে জন্যেই আসা এবারে। আপনাদের চক্কর আর এই ফ্যাটসোর খপ্পর থেকে। কলকাতার জীবন ছেড়ে, এত রকম এন্টারটেইনমেন্ট ছেড়ে এই জঙ্গলে কিসের খোঁজে বার বার আসে ও, এবার তা ভাল করে বুঝে যেতে চাই।

আশ্চর্য। দে সাহেব একটুও রাগ করলেন না। হাসলেন। বললেন, এবারে তো চার-পাঁচদিন ছুটি নিয়ে এসেছ, ভাল করে বুঝে যাও। দেখো, তারপরে দেবীর সঙ্গে তোমরাও যেন কলকাতার সব মোহ ছেড়ে এই জঙ্গলের নেশাতে মজে এই গরীবীতে সামিল না হও। সাবধানে থেকো। এই প্রকৃতি অক্টোপাসের মতো। যাকে সে ধরে, তাকে আর সে ছাড়ে না।

ওঁদের খাওয়ার নিয়ে এল ভিগু প্লাস্টিকের থালাতে করে। বাটিটাটি নেই, থালারই মধ্যে ভাতের ওপরে ডাল, আলু ভাজা এবং মাছও। ভাত লাগলে আরও দেবে।

থালার একপাশে কাঁচা লঙ্কা কাঁচা পেঁয়াজ। দে সাহেব বললেন, চলুন, আমরা ও দিকে গিয়ে বসি। ওদের হয়ত অসুবিধে হবে।

আমাদের সবেতেই সুবিধে। দূরে যেতে চান, যান, অত এক্সপ্লানেশান কিসের মিস্টার দে?

এগুলো? ওগুলো দেখিয়ে চ্যাটার্জি সাহেব বললেন আতঙ্কিত গলায়।

সাহেবের পাত থেকে পেঁয়াজ কাঁচা লঙ্কা তুলে নিয়ে যাও ভিগু। বললেন দে সাহেব।

তারপর বললেন, আরে কাঁচা পেঁয়াজের মতো এনার্জি-গিভার আর কিছুই নেই। সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের শেষ দিকে বার্মার জঙ্গলে, এখন মায়নামার, জেনারেল উইংগেট ছিলেন ব্রিটিশ আর্মির। জাপানিদের বিরুদ্ধে উইংগেটের কীর্তিকলাপ কিংবদন্তি হয়ে আছে। উইংগেট নাকি শুধু কাঁচা পেঁয়াজ খেয়েই থাকতেন। 'উইংগেটস্ সার্কাস' বলে খ্যাত ছিল তাঁর রেজিমেন্ট।

গন্ধ লাগে না?

আমার তো লাগে না। আর আমাকে চুমুটা খাচ্ছে কে? যে কখনও সখনও খায়, আমার বিয়ে — করা বউ তাকেও পেঁয়াজ কাঁচা লঙ্কা ধরিয়ে দিয়েছি। গন্ধ কাটাকুটি হয়ে যায়।

চ্যাটার্জি সাহেবদের খাওয়া হয়ে গেলে দে সাহেব দেবীর দুই সঙ্গীকে বললেন, তোমরা খুব দেরি কোরো না। কারণ, তোমাদের খাইয়ে ওরা নিজেরা খেয়ে দেয়ে বাসনপত্র মেজে আবার রাতের রান্নার বন্দোবস্ত করবে।

তারপর বললেন, রাতে কি খেতে চাও তোমরা? তোমরা হলে দেবীর গেস্ট, মহামান্য, আমার কাছে।

রাতে রাম্ খাব আমরা। রাম্-এর সঙ্গে খিচুড়ি জমবে ভাল।

মাংসও করতে বলব। কষা মাংস। চলবে?

বাঃ। তা'হলে তো জমে যাবে। আপনি গ্রেট। রিয়্যালি।

দুপুরের খাওয়ার পর একটু বিশ্রাম তো করবে?

একটু মানে? লম্বা ঘুম লাগাব। ট্রেন জার্নি করে এসেছি, ঘুম তো হয় নি। আসারও ঠিক ছিল না। আনরিসার্ভড কামরাতে সেকেন্ড ক্লাসে সারা রাত প্রায় বসে বসেই এসেছি। দেবীর এই ইনফ্যাচুয়েশনটা ইনভেস্টিগেট করতে আমাদের আসাটা খুবই জরুরি ছিল। এই সারাঙ্গা এবং ফ্যাটসো এই দুটি মিথকেই আমরা এক্সপ্লোড করে যেতে চাই।

খুব ভাল। থরোলি ইনভেস্টিগেট করো। বিকেলে বা সন্ধেতে ঘুম ভেঙে উঠে চা চেয়ো, চা দেবে। ওর নাম ভিগু। সুরাতিয়া রান্নাঘর থেকে বেরোয় না। ওকে উত্ত্যক্ত কোরো না ড্রিঙ্ক-ট্রিঙ্ক করে। মাথায় টাঙ্গির কোপ পড়বে।

কে মারবে?

আমাদেরও ক্লোজড—সার্কিট টিভি আছে। আগন্তুকদের সব ক্রিয়াকলাপ মনিটর করা হয়। গার্ডও আছে। দেবী নিজে টাঙ্গি চালালেও আশ্চর্য হয়ো না। আমাদের এখানে আমরা সকলেই, তোমরা যাকে পাগল বলে, তাই। পাগলে কি করে আর কি করে না, তা কি বলা যায়?

ওক্কে। থ্যাঙ্ক উ্য ফর দ্যা ওয়ার্নিং।

কিংশুক বলল।

অন্তু বলল, এইচ. পি. চ্যাটার্জির ওপরে একটা গান কম্পোজ করলি, এবার ইন্দ্রজিৎ দে'র উপরে আরেকটা কম্পোজ কর। ফিরলে, গিটার বাজিয়ে গেয়ে শোনাব। দেবীকেও শোনাতে হবে দুটি গানই।

বলে, দু'জনেই হি হি করে মাতালের হাসি হাসতে লাগল।

৭

জীপে এক কিমি মত গিয়ে একটা চড়াই-এ উঠে খুব ঘন জঙ্গলের মধ্যে মালভূমির মতো একটা সমান জায়গাতে পৌঁছে ইন্দ্রজিৎবাবু বললেন, নামুন এবারে।

তারপর বললেন, আধ কিমি মতো হাঁটতে পারবেন ত? চেষ্টা করলেই পারবেন। রোজই একটু একটু করে যদি হাঁটা বাড়ান তা'হলেই দেখবেন ঠিকই হাঁটতে পারছেন। কোনোই অসুবিধা হচ্ছে না। তা ছাড়া, এখানে পিওর অক্সিজেন। যাঁদের হার্টের অসুখ তাঁরাও এখানে এসে নওজোওয়ান হয়ে যান। আসলে শরীর ত মন বিবর্জিত নয়। মন আনন্দে থাকলেই শরীরও আনন্দে থাকে।

দু'জনে কথা বলতে বলতে আধ কিমি মতো হেঁটে গিয়ে সেই মালভূমির একেবারে শেষে গিয়ে দাঁড়ালো। নীচে গভীর খাদ। অত্যন্ত গভীর জঙ্গল সেখানে। বহু রকম গাছ। দুপুরের রোদে সেই জঙ্গলের বৃষ্টি ভেজা ক্লোরোফিল-উজ্জ্বল গাঢ় সবুজ পাতারা একেবারে ঝকঝক করছে।

একটা ঝরঝরানি আওয়াজ শুনতে পাচ্ছেন চ্যাটার্জি সাহেব?

পাচ্ছি।

এটাই হলো ঝিঙ্গুরঝারি নালা। ঐ নালাতেই বাঁধ দিয়েছি আমরা। ঐ বাঁধের জন্যে যে জলাধার হয়েছে সেই জলাধার থেকে ক্যানাল কেটেছি দু'দিকে। এ বছর যা ফসল ফলবে তা বলার নয়।

তারপর বললেন, আমি যখন পুব-আফ্রিকার তানজানিয়ার লেক-মানিয়ারা ন্যাশনাল পার্ক-এ যাই তখন সেখানের ফরেস্ট লজ-এ প্রথম বার সুইট-কর্ন স্যুপ খেয়ে ভাললাগায় অজ্ঞান হয়ে গেছিলাম। গেছিলাম জুলাই মাসে। তখন আফ্রিকাতে শীতকাল। অত বড় বড় ভুট্টার দানা ভারতের কোথাওই দেখি নি। আসার সময় শুকনো দানা নিয়ে এসেছিলাম। বারিয়াতুতে আমাদের প্রজেক্ট-এরিয়ার মধ্যে একটি আলাদা বেড করে তাতে ঐ ভুট্টার দানা ছড়িয়ে দিয়েছিলাম। তা থেকে যে ভুট্টা হয়েছিল তার পুরোটাই বীজ হিসেবে রেখে নানা জায়গাতে লাগিয়েছিলাম। হাজারিবাগ—গয়া রোডে মারহান ফার্মেও বীজ দিয়েছিলাম। সেই ভুট্টাই আমরা সারাঙ্গাতে লাগিয়েছি। এবারে আসুন শীতে, আপনাকে মক্কিকি রোটী আর শর্ষুঁকি সাগ খাওয়াব। সুইট-কর্ন স্যুপও খাওয়াব। দেখবেন, কত বড় বড় দানা ভুট্টার। আর কী মিষ্টি!

তারপর বললেন, জানেন ত, এই ভুট্টাই জিম করবেট পুব-আফ্রিকার কিনিয়া থেকে এনে উত্তরপ্রদেশের হিমালয়ের তরাই অঞ্চলে তাঁর কালাধুঙ্গির খামার বাড়িতেও লাগিয়েছিলেন।

তাই? আমি কি করে জানব বলুন চ্যাটার্জি সাহেব। বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু

জানি! তা আমাদের দেশের কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারেরা কেন পূর্ব-আফ্রিকা থেকে ঐ ভুট্টা আনান না?

বলতে পারব না। হয়ত আনান। পঞ্জাব গভর্নমেন্ট নিশ্চয়ই আনান। কি করে ফেলেছে ওরা! কৃষি-কাজ করেও যে অমন বড়লোক হওয়া যায় তা পঞ্জাব আমাদের চোখের সামনে করে দেখিয়েছে।

তারপর একটু চুপ করে, এক ঢোঁক জল খেয়ে, চ্যাটার্জি সাহেব বললেন, তবে পঞ্জাবীদের অনেকই গুণ। কঠোর পরিশ্রমী তাঁরা। জেদী। ইজরায়েলিদের সঙ্গে নানা ব্যাপারে মিল আছে ওঁদের।

পঞ্জাবীদের বড়লোক হবার আরেকটা কারণ অ্যাগ্রিকালচারাল ইন্‌কাম-এর ওপরে ট্যাক্স নেই যে!

কেন? ট্যাক্স বসানো হয় না কেন?

কোনো কেন্দ্রীয় সরকারেরই উপায় নেই কৃষি-আয়-এর ওপরে কর বসায় —। রাজ্য সরকার যে ট্যাক্স বসান তা ক্ষুদ-কুঁড়োর সমান। আয়কর আমরা যে-হারে দিই তার ধারে কাছেও আসে না তা। এদিকে কৃষিকাজ করেই এয়ারকন্ডিশানড খামার বাড়িতে থাকছে, এয়ারকন্ডিশানড গাড়ি চড়ছে তারা গত ত্রিশ বছর ধরে।

কেন? উপায় নেই কেন?

উপায় নেই, কারণ ভোট চলে যাবে। ভোট পেলে তবেই না গদীতে থাকা যাবে। আর গদীই যদি চলে যায় তবে দেশের ভাল দিয়ে কি হবে! সেই নেহরু সাহেবের আমল থেকেই এই ট্র্যাডিশন সমানে চলে আসছে। মুখে "গরীবী হাটাও" আর বদলে ভোট বাগাও। দেশের ভাল সত্যিই করতে চাইলে জনসংখ্যা এমন প্রলয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে! আমাদের দেশের সব সমস্যার গোড়াতে ত এই জনসংখ্যাই। স্বাধীনতার এত বছর পরে উৎপাদন কি বাড়ে নি? সবকিছুই বেড়েছে। কিন্তু উৎপাদন যদি অ্যারিথম্যাটিক্যাল প্রগ্রেশনে বেড়ে থাকে তা'হলে জনসংখ্যা বেড়েছে জিওমেট্রিকাল প্রগ্রেশানে। সমস্যার সমাধান হবে কি করে।

আপনারা ফ্যামিলি-প্ল্যানিং সম্বন্ধে কিছু কি করছেন? আপনাদের প্রজেক্টে।

করছি বৈকী। একটা মিজারের কথা বলতে পারি। জঙ্গলে পাহাড়ে আমোদ বলতে মুখ্যত ছিল সঙ্গম। সন্ধে নামার সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢুকে দুয়ার দিয়ে জঙ্গলের মানুষ আর কি করবে? ঐ একমাত্র আনন্দ ছিল।

কি করেছেন আপনারা তার বিকল্প হিসেবে?

আমরা ওদের যা "রোজ" দিই তার দশ পার্সেন্টি কেটে রেখে তার সঙ্গে আমরাও দশ পার্সেন্টি যোগ করে টাকা জমলেই ওদের ব্যাটারির ট্রানজিস্টার কিনে দিচ্ছি। তাতে নানা রকম প্রোগ্রাম শুনছে ওরা। সন্ধের পর সময় কাটছে ভাল। তা'ছাড়া সেক্স-এডুকেশান ক্যাম্প আছে, নানা এন.জি.ও.-কে ইনভলভ করে বার্থ-কন্ট্রোল পিলস, কন্ট্রাসেপটিভস ইত্যাদি বিনা পয়সাতে আমাদের সব প্রজেক্টেই বিলি করছি। চাইল্ড কেয়ার সেন্টার, ক্রেশ, এসবেরও বন্দোবস্ত করেছি। ছোট পরিবারই যে সুখী পরিবার একথা ওরা প্রত্যেকেই এখন জেনে গেছে।

রেডিও কিনে দিচ্ছেন, তো টিভি কি দোষ করল? সোলার ব্যাটারি দিয়ে ইলেকট্রিসিটি আনা যায় না?

যায়। কিন্তু এই টিভি আর টিভির বিজ্ঞাপন আর লাগামহীন সিরিয়াল আর ছবিই ত যা কিছু ভারতীয়ত্ব তার সর্বনাশ করে দিল। পেপসি আর কোক আর নেসলে কি কলগেট বা হুণ্ডাই বা সোনি এরা একটিও কি ভারতীয়? এদের এই রমরমার মানে কি? দেশের টাকা বিদেশে বুক ফুলিয়ে পাচার। এদের এমপ্লয়মেন্ট পোটেনশিয়ালই বা কি? ক'জন মানুষকে চাকরি দিচ্ছে এরা।

তারপর একটু চুপ করে থেকে বললেন, আসলে এত কিছুই করার আছে আমাদের এই সব প্রজেক্টস-এ চ্যাটার্জি সাহেব, আর আমাদের জনবল, অর্থবল এতই কম যে, তেমন কিছুই করে উঠতে পারি নি এ পর্যন্ত।

আমি কি আপনাদের কোনো সাহায্য করতে পারি। ইন্দ্রজিৎবাবু?

না। আর্থিক সাহায্য এখুনি নেব না। এখনও তার সময় হয় নি। আপনাকে বার বার আসতে হবে, আমাদের সঙ্গে হাত লাগাতে হবে। আর্থিক সাহায্যের কথা অনেক পরে। আমরা ইনভলভমেন্ট চাই, টাকা চাই না। এই সারাঙ্গা প্রজেক্টটা দেবীই বলতে গেলে একা হাতে গড়েছে, আমি আর সুমিতা সাহায্য করেছি মাত্র। বাইরের টাকার চেয়েও স্থানীয় মানুষদের উৎসাহ উদ্দীপনা এখানের সবচেয়ে বড় স্ট্রেংথ।

দেবী বলছিল যে, এক লাখ টাকা দিলে না কি একটা গ্রাম অ্যাডাপ্ট করা যায়।

বলছিল বুঝি?

দে সাহেব বললেন।

তারপর বললেন, তা অবশ্যই যায়। কিন্তু তার আগে সেই গ্রামের মানুষদের আপনাকে তো বাবা বলে মানার মতো মানসিকতাও আসতে হবে। এতো আর মাদার টেরিজার আশ্রম থেকে শিশুকে নিয়ে আসা নয়, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সমেত একটা পুরো গ্রামের বাবা হওয়া। সেই সময়টুকু আগে দিতে হবে। যাকে বলে জেস্টেশান পিরিয়ড। আন্তরিকতাও প্রমাণ করতে হবে। তাদের পছন্দ না হলে তারা বাবা বলে মানবেই বা কেন আপনাকে?

ভেবেই উত্তেজিত বোধ করছি। সত্যিই কল্পনাতীত! একজন অকৃতদার মানুষের এত বড় পরিবার!! সত্যি। দেবীর কাছে আমি ভারি কৃতজ্ঞ। ও যদি না নিয়ে আসত তবে ত আসতেই পারতাম না এখানে। নিজের চোখে এসব দেখতেই পারতাম না। জানতেই পারতাম না।

তা ঠিক।

ইন্দ্রজিৎবাবু বললেন।

তারপর বললেন, দেবীর মত অল্পবয়সী একটি মেয়ের এই প্রজেক্টে যা ইনভলভমেন্ট তার প্রকৃত মূল্যায়ন করা আমাদের পক্ষে সম্ভবই নয়। চিন্তাই করা যায় না। ও হয়ত অল্পদিনের মধ্যেই কলকাতা ছেড়ে এখানেই এসে থাকবে পাকাপাকিভাবে। তা'ছাড়া, কলকাতাতে ওর অ্যাট্রাকশানটা কি? যাদের সঙ্গে ঘর করে তাদের ত দেখলেন। ওরাই হচ্ছে আপনাদের কলকাতার নব্য-বুদ্ধিজীবীর নমুনা। কোনো পালের "গোদা" বা "দাদা" ধরে দল পাকিয়ে পারস্পরিক পিঠ-

চুলকোনি করেই জীবন পার করে দেবে এরা। শুধু 'মুখেন মারিতং জগৎ' অ্যাটিট্যুড নিয়েই ত আর চলে না। যদিও আমি প্রবাসী, তবু বাঙালি ত! এদের মতো বাঙালির স্যাম্পল দেখে লজ্জা করে আমার নিজেকে বাঙালি বলে পরিচয় দিতে। আপনারা তো কলকাতাতেই থাকেন। করতে পারেন না কিছু?

আমার বয়স হয়ে গেছে। তা'ছাড়া আমি অন্য জগতের মানুষ। খেটে খেতে হয় আমাকে। আমার কথা এই সব নানা ধান্দাবাজেরা কি শুনবে? তা'ছাড়া ব্যাপারটা কি জানেন? হা-ভাতেদের দেশে বড়লোক হবার মতো পাপ আর নেই। বড়লোক মানেই 'বুর্জোয়া'। বড়লোক মাত্রেই খারাপ। বড়লোক মানেই চোর। বড়লোক মাত্রই নির্গুণ। এই আটারলি নেগেটিভ অ্যাটিটুডই সব কিছু শেষ করে দিল। অথচ প্রত্যেক হা-ভাতের, সে বুদ্ধিজীবীই হোক অথবা শ্রমজীবী – মনের গভীরে কিন্তু একটাই স্বপ্ন।

কি সেই স্বপ্ন?

বড়লোক হবারই স্বপ্ন।

বিশেষ করে বুদ্ধিজীবীদের। বামপন্থা পশ্চিমবঙ্গে নান্যপন্থা নয়। সেটা একটা ভেক। যত দুর্বুদ্ধিজীবী তারাই নানা দল পাকিয়ে লাল পতাকার তলায় গিয়ে জুটেছে। ভণ্ডামির চূড়ান্ত। ভাল মানুষ ও প্রকৃত বুদ্ধিজীবী যে নেই তা নয়, কিন্তু তাঁরা নগণ্য। এখন দুনম্বরীদেরই দিন।

দে সাহেব একটুক্ষণ অন্যমনস্ক হয়ে থেকে হঠাৎই বললেন, ওদের মেরে আমি ঘাড় ধরে বের করে দিতাম জঙ্গলে। রাঁচির বাস-এ চড়িয়ে দিতাম। কিন্তু পারলাম না শুধু দেবীর কথা ভেবে।

তারপর বললেন, কেন এবং কিসের জন্যে দেবী ঐ দুটো লোফারের সঙ্গে থাকে বলতে পারেন?

এইচ. পি. বললেন, না। সত্যিই পারি না। তবে দেবীকে আপনি আর সুমিতা দেবী অনেক বেশি চেনেন। আমি আর কতটুকু জানি ওকে। তবে একথা ঠিক যে ওই নৈকট্য আমার সব বুদ্ধির বাইরে। কোথায় দেবী, কোথায় ওরা! তবে একথাও ঠিক যে ওদের প্রজন্মকে আমরা হয়ত ঠিক বুঝতে পারি না। দোষটা হয়ত আমাদেরই।

তারপর বললেন, মেয়েদের বোঝা সহজ নয় জানতাম কিন্তু তা যে এতখানি কঠিন তা সত্যিই জানতাম না।

থাক ওসব আলোচনা, দেবীর সঙ্গীদের আলোচনা, দেশের বা আপনাদের কলকাতার আলোচনা, এবার একটু ডান দিকে চলুন। দেখেছেন ঐ পাহাড়টা। চারদিকের সবুজের সমারোহের মধ্যে কেমন ন্যাড়া, গাছহীন।

সত্যি ত? কি করে এমন হল?

অনেকদিন আগে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট ওখানে হরজাই বা পাঁচমিশেলি জঙ্গলের ক্লিয়ার-ফেলিং করেছিল কোনো এক রকম গাছের প্ল্যানটেশান করবে বলে। প্ল্যানটেশান না করলেও পাহাড় কি জমি জঙ্গল এমনি ফেলে রাখলেও তাতে হরজাই জঙ্গল গজিয়েই যায় অচিরে। প্রকৃতির মতো বড় জমিদার, বড় লেঠেল

আর দ্বিতীয় নেই। অচিরে প্রকৃতি দখল নেয় ন্যাড়া জমি বা পাহাড়ের। কিন্তু এই পাহাড়ের ওদিকের ঢালে একটি গুহা আছে। সেই গুহাতে "হো"দের এক দেবতা আছেন। ক্লিয়ার-ফেলিং-এর সময়ে বন বিভাগের কাঠুরেরা ঐ গুহাতে ঢুকে দেবস্থান নাকি অপবিত্র করে। সেই রাগে সেই দেও ঐ পাহাড়ে বন বিভাগকে কিছুই করতে দেন নি। তাঁর অভিশাপে ঐ পাহাড়ে বন বিভাগ কোনো একটি গাছকেও বাঁচাতে পারে নি।

ঐ দেবতা কেমন দেখতে?

আমাদের দেশের দেবতারা সবাইত সাকার নন। বনে-জঙ্গলে টোটেম পুজোরই বেশি প্রচলন। নিরাকারও আছেন। এই দেও একটি গোল পাথর কিন্তু উজ্জ্বল সিঁদুরে লাল রং তার।

কী করে?

তা বলতে পারব না। ম্যাঙ্গানিজ আকরের তাল কি না জানি না, জিওলজিস্টরাই বলতে পারবেন! কোনো কোনো বছর ঐ গুহার মুখে যে একটা মাত্র বড় শাল গাছ আছে, তাকে গাছ না বলে মহীরুহ বলাই ভাল, সেই গাছে এক জোড়া লাল-রঙা পাখি এসে বসে চৈত্রর শেষে। যে বছর আসে। সে বছর তারা থাকে দিন দশেক।

কি পাখি?

তা আমি জানি না। জঙ্গলের মানুষেরা বলে পাখি দুটি ঐ লাল দেবতার পূজারী। পাখির ছদ্মবেশে আসে। যে বছর আসে সেই বছর মস্ত মেলা বসে ঐ পাহাড়ের ওদিকে, গুহামুখে। সকলে লালদেওকে পূজা চড়ায়। সারাদিন রাত ভিড় লেগে থাকে, নাচগান হয়। তারপর পাখিরা উড়ে গেলে মেলাও শেষ। স্থানীয় মানুষদের আশা এক দিন লাল দেওর দয়াতে ঐ পাহাড় আবার সবুজ হবে।

আপনি এসব বিশ্বাস করেন দে সাহেব?

বিশ্বাস বলতে আমরা যা বুঝি তা হয়ত করি না, আবার অবিশ্বাসও করি না। কারণ, ঘটনা ত সত্যি। যতক্ষণ না বিজ্ঞান তার কোনো প্রণিধানযোগ্য ব্যাখ্যা দিয়ে এই ঘটনাকে অপ্রমাণ না করতে পারছে ততদিন বিশ্বাস না করার কারণ নেই। যদিও আমার কোনো কুসংস্কার নেই, আমিও ত এই সারাঙ্গার মানুষদেরই মতো একজন জঙ্গলের মানুষই। আমরা তিন পুরুষ রাঁচীতেই। আমার বাবা ডাক্তার ছিলেন। তাঁর খুব শিকারের সখ ছিল আর সে জন্যেই বন পাহাড়ের যত অগম্য জায়গা, পাহাড়-চূড়া, নদী-নালা, গুহা সব জায়গাতে তাঁর যাতায়াত ছিল। বছর দশ বারো বয়স থেকে বাবা আমাকেও সঙ্গে নিতেন। সেই কারণে আমি প্রকৃতির মধ্যেই বড় হয়ে উঠেছি বলতে পারেন। প্রকৃতিকে যেমন ভালবাসতে শিখেছি ছোটবেলা থেকে, তেমনি এক জন সরল সাধারণ আদিবাসীরই মতো তাকে ভয় করতে, মান্য করতেও শিখেছি। মনের মধ্যে এক ধরনের ধারণা তৈরি হয়ে গেছে যে ঈশ্বরবোধের সঙ্গে বিজ্ঞানের কোনো বিরোধ নেই। ব্যাপারটা আমি ব্যাখ্যা করে বলতে পারব না। এটা অনুভূতির ব্যাপার। আপনি যদি বার বার বছরের পর বছর আসেন এখানে আপনি তখনই বুঝতে পারবেন কি আমি বলতে চাইছি।

এইচ. পি. চুপ করে ছিলেন। ভাবছিলেন, কলকাতা থেকে এ কোন রাজ্যে এসে পৌঁছোলেন!

চ্যাটার্জি সাহেব বললেন, এই বনের গভীরে একটা প্রাগৈতিহাসিক কদম গাছ আছে।

কদম গাছ?

হ্যাঁ। যে কদম গাছের নীচে দাঁড়িয়ে কৃষ্ণ কানহাইয়া বাঁশি বাজিয়ে রাধাকে ডাকতেন। দেখেন নি কখনও?

না তো!

লজ্জার সঙ্গে বললেন এইচ. পি.।

ঐ দেখুন।

বলে ডান দিকে আঙুল দিয়ে একটা বড় গাছকে দেখালেন ইন্দ্রজিৎবাবু। হলুদ গোল গোল ফল হয়ে আছে। ছেলেবেলাতে ঐরকম হলুদ পশমের বল দিয়ে তাঁরা ব্যাডমিন্টন খেলতেন তাঁদের যৌথ পরিবারের বাড়ির ছাদে। অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন এইচ. পি.। কত কিই যে জানার আছে অথচ ভেবেছিলেন তিন-চারটি আইনকে নখদর্পণে এনেছেন বলেই তিনি সবই জানেন।

তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, সেই গাছটির কথা বলুন।

হ্যাঁ। এক গাঁওবুড়ো আমাকে নিয়ে গেছিল সেই গাছের নিচে। গাছের নিচে মস্ত চ্যাটালো পাথরের কালো একটি শিলাসন। তার ওপরে আমাকে নিয়ে বুড়ো বসল।

কতদিন আগে?

তা আজ থেকে পঁচিশ-ত্রিশ বছর আগে। তখন বড় বাঘের দাপটে এ জঙ্গলে ঢোকাই বিপদ ছিল। ঢুকলেও বেলা চারটের আগেই বন ছেড়ে চলে আসতেন মানুষ। তবে আমি তো শিকারী। আমি তো বাঘকে ভয় পাই না, বাঘের সঙ্গে মোলাকাত করার জন্যই আসতাম।

তারপর বুড়ো বলল, বুড়ো আমার বাবাকেও জানত। বাবা সেই গাঁওবুড়োর বৌকে দুরারোগ্য চীচক্ রোগ থেকে বাঁচিয়ে ছিলেন বলে বাবাকে ডাগদারসাব হিসেবে খুবই খাতির করত গাঁওবুড়ো এবং পুরো গ্রামের লোকেরা। ওদের গ্রামের নাম ছিল চুঙর।

বুড়ো কি বলল, বলুন তারপরে।

হ্যাঁ। বুড়ো বলল তোর মনে খুব অশান্তি?

তখন আমার বয়স কুড়ি। অশান্তি বলতে, ঐ বয়সেই একটি মেয়ের প্রেমে পড়েছিলাম। বাবা-মা বুঝতে পেরে আমাকে কিছু দিনের জন্যে পাটনাতে সরিয়ে দিলেন। তার ওপর পড়াশুনোর চাপ ত ছিলই। বিদেশ যাওয়ার কথা। সব মিলিয়ে আমার জঙ্গলের স্বর্গ থেকে নির্বাসিত হয়ে পাটনার হৈ-রৈ এর পরিবেশে আমার আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে করত।

বুড়োকে মাথা নাড়িয়ে জানালাম যে, হ্যাঁ। অশান্তি আছে।

জানি না, বাবা, বুড়োকে কিছু বলে রেখেছিলেন কি না।

শীতকাল। চুগুর বস্তির ফসল খেতে বুনো শুয়োর আসত, ওদের খুবই ক্ষতি করছিল বলেই আমরা শুয়োর মারতে গেছিলাম সেই গ্রামে। তখন বাবা জীপ গাড়ি কিনেছেন, গেছিলাম বাবার জীপেই।

বুড়ো বলল, তোর যাকে যা বলার আছে, যার ওপরে যত রাগ আছে, যা-ই তুই চেয়েছিস অথচ পাস নি সব কিছু এক সঙ্গে একটা দলা পাকিয়ে নে।

দলা পাকিয়ে?

আশ্চর্য হয়ে বললেন এইচ. পি.।

হ্যাঁ। বলল, দলা পাকিয়ে।

তারপর?

তারপর সেই দলা মনে মনে ছুঁড়ে মার ঐ গাছের গুঁড়িতে। তারপর একটা নুড়ি তুলে নিয়ে জোরে মার ঐ গাছের কাণ্ডে। তারপর আমি চলে যাব। তুই মনটাকে স্থির করে, ঐ গাছতলাতে এক ঘণ্টা বসে থাক। গাছ তোকে আশীর্বাদ দেবে। তোর সব অশান্তি দূর হয়ে যাবে।

বলে বুড়ো আমাকে সেই পাথরের ওপরে রেখে চলে গেল। বলল, এক ঘণ্টা 'হয়ে গেলে তোর ঘড়ি দেখে আমাকে ডাকবি, আমি আসব। কাছেই থাকব আমি তবে তোর সঙ্গে নয়।

তারপর?

তারপর কি যে হল কি বলব!

আপনি কি জোড়াসনে বসেছিলেন, মানে, কোনো মুদ্রাতে?

আরে না না চ্যাটার্জি সাহেব। চেয়ারে বসার মতো করে পাথরটার উপরে বসেছিলাম। শীতের বিকেল। সূর্যের কমলা আলো এসে গাছপালার ফাঁক-ফোকর দিয়ে সেই পাথরটা এবং আমার গায়েও এসে পড়ছিল। নানা পাখি ডাকছিল। একটা কোটরা হরিণ ব্বাক্ ব্বাক্ করে ডাকছিল নিচের নালা থেকে। বাঘ দেখে থাকবে হয়ত। টিয়ার ঝাঁক দিন শেষের খবর আবীরের মতো ছড়াতে ছড়াতে তীর বেগে উড়ে যাচ্ছিল মাথার উপর দিয়ে। আমি মনটাকে যত সম্ভব শান্ত করে বসেছিলাম।

তারপর?

এক ঘণ্টা কখন হল আমি ঠিক জানি না তবে আমার সত্যিই ভার-মুক্ত মনে হতে লাগল। মনের মধ্যে কোনো ব্যাপারেই আর কোন চিন্তা, দ্বিধা বা সংশয় রইল না। রাগ রইল না কারো ওপরে। মনটা যেন পাখির মতো হয়ে গেল, মনে হল, ওড়াউড়ি করতে পারবে যেন ইচ্ছা করলেই।

গাঁওবুড়ো হঠাৎ ডাকল, ইন্দা।

আমি চমকে উঠে ঘড়িতে তাকিয়ে দেখলাম, দেড় ঘণ্টা হয়ে গেছে। মন আমার অভাবনীয়ভাবে চিন্তাশূন্য হয়ে গেছিল। সত্যি।

পরে আবার কখনও এসেছেন?

হ্যাঁ। সেই গাঁওবুড়ো কবে মরে গেছে। এখন তার ছেলে গাঁওবুড়ো। কিন্তু আমি বছরে কম করে তিন-চার বার আসিই। এ এক আশ্চর্য থেরাপি।

কোন সময় আসেন?

তার ঠিক নেই কোনোই। যখনই মনে ভার জমে, টেনশান, স্ট্রেস, রাগ, অভিমান তখনই চলে আসি এবং সম্পূর্ণ ভার মুক্ত হয়ে ফিরে যাই। সুমিতাকেও নিয়ে এসেছি অনেকবার। দেবীও যাবে বলেছে একবার। তবে ওখানে বসতে হয় একাই। অন্য কেউ সঙ্গে থাকলে হয় না। দূরে চলে যেতে হয় সঙ্গীকে।

কবে?

কী কবে?

মানে, দেবী কবে বলেছে যে যাবে ওখানে?

গতবারে এখান থেকে যাবার সময়ে বলে গেছিল যে এবারে এসে যাবে। ও পথ চেনে তো।

শেষবার এখানে কবে এসেছিল দেবী?

দিন পঁচিশেক আগে।

ও।

এইচ. পি. মনে মনে হিসেব করলেন কবে দেবী তাঁর সঙ্গে আলাপ করেছিল সেই সেমিনারে নিজে এগিয়ে এসে — তা প্রায় ছ'মাস তো হলো।

এইচ. পি. বললেন, জীপটা নিয়ে একবার সেই ভাঙা ব্রিজটার কাছে যাবেন না? ওঁরা যদি না এসে থাকেন তবে আধ কিমি ওদের কম হাঁটতে হবে। বেলাও ত পড়ে আসছে।

হাত ঘড়িতে এক ঝলক দেখে নিয়ে ইন্দ্রজিৎ দে সাহেব বললেন, হ্যাঁ! চলুন। তবে ডেরা হয়ে যেতে হবে। যদি ওঁরা ইতিমধ্যেই ফিরে এসে থাকেন। তবে সে সম্ভাবনা কম। খেতে যখন আসেন নি তখন কাজ পুরো করে সন্ধের মুখে মুখেই ফিরবেন।

জীপ নিয়ে ডেরাতে যখন পৌঁছলেন এইচ. পি.-রা তখন বেলা পড়ে এসেছে। ভিগু আর ভরত বলল মেমসাহেবরা ফেরেন নি।

বাবুরা কখন খেলেন?

দে সাহেব জিগগেস করলেন।

এই তো একটু আগেই।

এত দেরীতে?

জী সাব। পুরো বোতলটা সাফ করে তারপরই না খেলেন।

তোমরা খেয়েছ? হ্যাঁ, খেয়েছি একটু আগে।

তোমরা আগে খেয়ে নিলে না কেন?

মেহমানরা না গেলে কি করে খাই সাহাব। খাওয়ার কোনও জিনিস যদি কম পড়ে যেত। কেমন খান তা জানা নেই না আমাদের!

কোথায়? বাবুরা?

ঘুমুচ্ছেন। বলেছেন, ওঁরা উঠে চা চাইলে চা দিতে। নইলে ওঁদের যেন না ডাকা হয়।

ভাল করে খেয়েছেন ত? তোমরা দেখাশোনা করেছ ত ঠিক মতো।

জী সাব।

যা চেয়েছেন তাই দিয়েছ?

জী সাব। তবে একটা জিনিস ছাড়া।

সেটা কি?

সুরাতিয়ার ডিম।

ঐ বাজনদার বাবুটা ভারি ঝামেলা করছিলেন, সুরাতিয়ার ডিম খাবেন বলে।

তাই?

জী সাব।

দে সাহেবের চোয়াল দুটো শক্ত হয়ে এলো।

ওঁরা যখন সেই ভাঙা-ব্রিজের নদীটার কাছে পৌঁছালেন তখন সূর্য পশ্চিমের জঙ্গলে হারিয়ে গেছে। গাছের পাতায় ভাদ্র শেষের গলানো রোদ মাখামাখি হয়ে আছে। একটা ময়ূর ডেকে উঠল সামনে থেকে। ওঁরা দু'জনে জীপ থেকে নেমে ভেঙে যাওয়া ব্রিজের একটা পিলারের ওপরে বসলেন।

দে সাহেব চ্যাটার্জি সাহেবকে বললেন, এখুনি এসে পড়বে ওরা।

তারপর কি রকম চুপ করে থেকে কি ভেবে বললেন, আমরা সবাই বুনো। দেবীও গত চার বছরে বুনো হয়ে উঠেছে। আমার মন বলছে, শহরের বাঁধন ও এবারে ছিঁড়বে। কিন্তু আমি না হয় বিবাহিত। মেয়েটা বিদেশে চলে যাওয়ার পর থেকে সুমিতাও ওর পুরো সময় দেয় মেয়েদের নানা প্রজেক্টে। কিন্তু দেবীর সামনে লম্বা জীবন পড়ে আছে। ওতো আর মিশনারী নান নয়। ওর জীবনেও তো অন্য চাহিদা আছে, ঘরের মতো ঘর বাঁধার ইচ্ছে আছে। কী করবে, তা ঐ জানে। তবে ভাল্লুক বা শুয়োর বা বাঁদরের সঙ্গে ঘর করার চেয়ে ঘর না করাই ভাল। আপনি কি বলেন চ্যাটার্জি সাহেব?

আমি কি বলব? আমি কিই বা জানি। বিশেষ করে এসব ব্যাপারে, বলুন? তারপর বললেন, দেবী যে সঙ্গীদের সঙ্গে লিভ-টুগেদার করছে তাদের নিয়ে কি ও সুখী নয়?

আদৌ নয়।

আপনাকে বলেছে কখনও?

সরাসরি বলে নি। তবে আভাসে ইঙ্গিতে বলেছে। আসলে, ও আপনাকে বলেছে কি না জানি না, ওর মা'র দুটি কিডনিই খারাপ হয়ে গেছে। ওঁকে সপ্তাহে একবার ডায়ালিসিস করাতে হয়। টাকার ওর খুব প্রয়োজন। বাবার মৃত্যুর পরে বাবারই এক ব্যাচেলর বন্ধুর সঙ্গে থাকেন মা। তাঁর একটা ছোট দোকান আছে যাদবপুরে। তাঁর রোজগার সামান্যই। তবে তিনিও যতটুকু রোজগার তার সব টুকুই দেবীর মায়ের জন্যেই খরচ করেন। ওঁদের সম্পর্কটা অন্যায়ের নয়, নোংরাও নয়। শুনেছি অন্য সূত্র থেকে যে, দেবীর বাবাও জানতেন সেই সম্পর্কের কথা। দুই বন্ধুই ভালবাসতেন একই নারীকে। ছেলেবেলা থেকে এটা দেখে ও জেনেই হয়ত দেবীর কাছে দু'জন পুরুষের সঙ্গে লিভ-টুগেদার করাটা অস্বাভাবিক মনে হয় নি। আমাদের এই প্রজেক্ট থেকে যা ও পায় তার সবই মাকে দিয়ে দিতে হয় ওর।

তাই ওর থাকা খাওয়ার কারণেই হয়ত ওদের কাছে থাকে। তা'ছাড়া যখন থাকবে বলে মনস্থির করে, তখন হয়ত ভালবাসাও ছিল ওদের সঙ্গে। কোন মানুষ জীবনের কোন পর্যায়ে এসে কি করে, কেন করে তা শুধু সেই জানে। অন্যের পক্ষে অনুমান করা হয়ত সম্ভব, জানাটা প্রায় অসম্ভব। তা'ছাড়া এই সব ব্যাপার এতোই ব্যক্তিগত যে, নিজে থেকে না বললে কারোকে ত জিগগেসও করা যায় না!

তাতো ঠিকই।

এইচ. পি. বললেন।

তারপর বললেন, দেবীর মায়ের ডায়ালিসিস কোথায় হয়?

ওদের পাড়ারই একটা নার্সিংহোমে হয়। ওদের মেশিন আছে।

কোন নেফ্রোলজিস্টের আন্ডারে আছেন?

ডঃ বাণী ব্যানার্জি।

নার্সিংহোম-এর নাম কি জানেন?

রাসবিহারী অ্যাভিন্যুতে, ইউনিক নার্সিংহোম, লেক মার্কেটের কাছে শুনেছি।

ও। বললেন, এইচ. পি.। তারপর বললেন, আপনারা তো চলে যাবেন একটু পরে রাঁচীতে, তাই না?

হ্যাঁ। দে সাহেব বললেন।

গত রাতে ত আমি ছিলাম। আজ তো দেবীর সঙ্গীরা সবাই এসে গেছে। কিন্তু ওরা যদি না আসত তবে দেবী একা থাকত রাতে এই জঙ্গলে? ভয় করে না ওর?

ভয়ডর আর নেই দেবীর। ও আমাদেরই মতো হয়ে গেছে। তা'ছাড়া মুসলিম এসে যাবে। মুসলিমই থাকে এখানে। এতক্ষণে হয়ত এসেও গেছে। আজ লাতেহার হয়ে আসবে। হয়ত সন্ধে নামার পরেই আসবে। তা না হলে ওর আসার আওয়াজ পাওয়া যেত।

তারপর বললেন, দেবী যখন আসে তখন দেবীর দেখাশোনা ও করে। সুরাতিয়া, ভিগু আর ভরত তো থাকেই।

এই মুসলিম কে?

সে এক ক্যারেক্টার। ছ'ফিট দু'ইঞ্চি লম্বা। কুচকুচে কালো। অলিভগ্রীন পোশাক পরে। দেখলে মনে হবে কম্যান্ডো। ও ছিল ডালটনগঞ্জের মোহন বিশ্বাসের ছিপাদোহরের জঙ্গল-ম্যানেজার। আই সি সি'র পেপার মিলে লাখ লাখ টাকার বাঁশ যেতো, তার জন্যে শয়ে শয়ে কুলি লাগত আর সেই সব কুলির "মেট" ছিল ঐ মুসলিম। টাইগার প্রজেক্ট হয়ে যাওয়াতে ত সব ফরেস্ট অপারেশনই বন্ধ হয়ে গেল, মোহন বিশ্বাসও মারা গেছেন -- তাই ওকে আমাদের প্রজেক্টের কাজে লাগিয়েছি। সপ্তাহে একদিন করে যায় ছিপাদোহরে। সেখানেই তার পরিবার থাকে। ছেলেরাও বড় বড় হয়ে গেছে। তারা নানা জায়গাতে কাজ ও ব্যবসা করে। কিন্তু মুসলিম জঙ্গলেই সারা জীবন কাটিয়েছে তাই বাকি জীবনও কাটাতে চায়। একটা বহু পুরনো লজঝড়ে বি এস এ মোটর সাইকেল আছে ওর। তাই চালিয়ে জঙ্গলের মধ্যের পায়ে চলা পথ দিয়ে চলে আসে ছিপাদোহর থেকে।

বাঃ।

বাঃ না। ওদিকের জঙ্গলে তো হাতি আছে অনেক। হাতিরা মাঝে মাঝেই গণ্ডগোল করে।

কেন?

ওরা মোটর সাইকেলের শব্দ একেবারেই পছন্দ করে না। ভট ভট ভট শব্দ শুনতে পেলেই তাড়া করে আসে।

তাই?

বলেই, এইচ. পি. বললেন, একি! সন্ধে তো হয়ে এল! এবার আমারই ভয় করছে। আপনার স্ত্রী আর দেবী কি রাত নামলে ফিরবেন? ধন্যি মহিলা ওঁরা সত্যি। আপনিও ধন্যি।

টেনশান করবেন না। বনে এসে কোনো রকম মিছে চিন্তা করবেন না। বী কুল। ওঁরা এসে যাবেন। তা'ছাড়া দেখুন ওদিকে চেয়ে।

এইচ. পি. বর্ষাস্নাত স্নিগ্ধ নির্মেঘ আকাশের দিকে চাইলেন

দেখতে পাচ্ছেন?

চ্যাটার্জি সাহেব বললেন।

কি?

দেখুন পশ্চিমে সূর্য ডুবছে লাল থালার মতো আর পুবে চাঁদ উঠছে হলুদ থালার মতো। আর ঐ দেখুন, পশ্চিমাকাশে সন্ধ্যাতারা। দেখছেন?

মন্ত্রমুগ্ধর মতো এইচ. পি. বললেন, হ্যাঁ।

তারপর বললেন, অনেক জঙ্গলেই বেড়াতে গেছি, বাংলোতে বসে হুইস্কি খেয়েছি, তাস খেলেছি, কলকাতার গল্প, পরনিন্দা পরচর্চা করেছি কিন্তু জঙ্গল দেখার চোখ তো ছিল না। আপনি আমাকে ইনিসিয়েট করলেন। এখন আর মুক্তি নেই মনে হচ্ছে।

এখনই তো আসল মুক্তি। মুক্তির পথই তো আপনাকে আমি চেনালাম। বন্ধনের মধ্যেই ছিলেন ত এতগুলো বছর।

একথা ঠিক। আমার যেন এমানসিপেসান হলো চ্যাটার্জি সাহেব আপনার দয়াতে।

আমার দয়া নয়। দেবীই তো আপনাকে নিয়ে এলো হাত ধরে। আপনার কৃতজ্ঞতা দেবীরই প্রতি থাকুক। আমরা তো উপলক্ষ মাত্র।

তারপর এইচ. পি. বললেন, আপনারা রাঁচীতে ক'টা নাগাদ পৌঁছবেন?

আটটা নাগাদ।

বিজুপাড়া না কি একটা জায়গা আছে না? ওখানে পৌঁছে মোবাইলে বলে দেব কুকুকে গাড়িটা পাঠাতে। কোথায় পাঠাতে বলব?

সেকি! আপনি থাকবেন না রাতে?

না।

কেন?

বলেই বললেন, বুঝতে পারছি -- থাকবেন না ফর আন্ডারস্ট্যান্ডেবল রিজন্স। কিন্তু দেবী যে দুঃখ পাবে।

মনে হয়, দেবী বুঝবে। আমি আজ রাতে এখানে থাকলে দেবীর সামনে আমি অপমানিত হলে দেবীর সম্পর্কটা ওদের সঙ্গে হয়ত চিড় খাবে। দেবীর কোনো রকম ক্ষতি হয় তা আমি চাই না।

আপনি ম্যাগনানিমাস। তবে আমিও আপনার জায়গাতে থাকলে বোধহয় চলেই যেতাম।

তারপরই বললেন, ছেলেদুটো কি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করল? নইলে বিনা প্ররোচনাতে কেন এমন ব্যবহার করবে? দেবী আমার সঙ্গে এসেছে বলে তো ওদের উত্তেজিত হবার কারণ ছিল না।

ওরা তো অত্যাধুনিক। তাছাড়া ওরা তো ম্যারেডও নয়। তেমন কোনো জোরও তো নেই দেবীর উপরে ওদের।

কী জানি! কিছু কিছু জোর থাকে যা দুর্বলতার মোড়কে মোড়া থাকে। সেই মোড়ক খুলে দেখতে পারলেই সেই জোরের স্বরূপ বোঝা যায়।

দে সাহেব বললেন।

হবে হয়ত।

এইচ. পি. বললেন।

এক জোড়া পেঁচা উড়ে উড়ে ঝগড়া করতে করতে চক্রাকারে ঘুরতে ঘুরতে চাঁদের মধ্যে ঢুকে গেল। লালচে-হলুদ অন্ধকার নেমে-আসা রাতে তাদের অপার্থিব গলার স্বর এইচ. পি.-র গায়ে কাঁটা দিল। এমন সময়ে দেবী আর সুমিতার গলার স্বর শোনা গেল। মনে হল, ওরা নদীর ওপারে দাঁড়িয়ে কথা বলছে।

দে সাহেব বললেন, পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যে এসে যাবে।

পাঁচ-সাত মিনিট লাগবে?

হ্যাঁ। এই নিস্তব্ধ জঙ্গলে আওয়াজের দূরত্ব অনুমান করতে পারবেন আপনিও পরে। আমি ততক্ষণে জীপটা ঘুরিয়ে নিই।

বলেই উঠলেন দে সাহেব।

৮

চিঠিটা নিয়ে এসেছিল সোহনলাল বাবুদের ড্রাইভার সানেকা মুণ্ডা একটা ছোট মারুতি গাড়ি নিয়ে।

পরশু বিকেলে স্যার ইন্দ্রজিৎদাদের সঙ্গে চলে গেছিলেন সন্ধের পরেই। কিংশুকরা তখনও ঘুমোচ্ছিল। মিশ্র মদের নেশাতে। ওরা বলে "Sleeping it off". ঘুম থেকে উঠেছিল প্রায় রাত দশটার সময়ে। গত কাল সারা দিন ও রাত ওরা ছিল। তবে দেবী তো কাল ভোরে উঠেই চলে গেছিল সারাঙ্গাতে। ওরা কেউই সেখানে যাওয়ার ঔৎসুক্য দেখায়নি।

গতকাল সন্ধের সময়ে ফিরে শুনেছিল দেবী যে ভিগুকে দিয়ে সুগালিয়া বস্তি থেকে মহুয়া আনিয়ে সারাদিন মহুয়া খেয়েছে এবং গিটার বাজিয়ে গান গেয়েছে ওরা দু'জন। ওরা ওদের মতো করে "Enjoy" করেছে ওদের ছুটি, কিন্তু দেবীর মনে খুবই দুঃখ হয়েছিল যে ওদের মধ্যে কেউই দেবীর কাজ সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র উৎসাহ দেখায় নি। জিগগেস পর্যন্ত করে নি দেবী সারাদিন কি করে।

প্রথম রাতে ইন্দ্রজিৎদাদের জীপ চলে গেলে ঘুম থেকে উঠে ইন্দ্রজিৎদা এবং স্যারের নিন্দাতে মুখর হয়েছিল। একজন জীবনমুখী গায়ক যেমন পরম ঔদ্ধত্যের সঙ্গে তাবৎ বয়স্কদের সম্বন্ধে কথা বলেন, যেমন মনে করেন যে, Arrogance is synonymous to smartness. যেমন মনে করেন যে তরুণরা বুঝি চিরদিন তরুণই থাকবেন এবং প্রৌঢ় এবং বৃদ্ধদের হেলিকপ্টার থেকে ঐ অবস্থাতেই ধরাধামে বিধাতা নিক্ষেপ করেছিলেন কিংশুকরা তেমনই মনে করে। ওরা ভাবে, ওদের সবকিছুই ভাল, ওরা সর্বজ্ঞ, সমস্ত ট্রাডিশনই খারাপ। পূর্বসূরীদের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি পুরনো মূল্যবোধ সবই একেবারেই অর্থহীন। ওরা বলে, বাবা-মায়ের যৌন-সুখের কারণে ওরা পৃথিবীতে এসেছে তাঁদের প্রতি বিন্দুমাত্র দায়দায়িত্ব বা কর্তব্য ওদের নেই। এইসব নানা কারণেই সাম্প্রতিক অতীত থেকে দেবীর দম বন্ধ হয়ে আসছিল। ওদের সঙ্গে থাকবে অথচ বিকল্প নিয়ে যে ভাববে। তার সময়ও ছিল না।

বালিগঞ্জ পাড়ার এক বড়লোকের বউ-এর শাড়ির দোকান পুরোপুরি দেখাশোনা করার ভার তারই উপরে। টাকার জন্যেই করে। অথচ পার্টনার করে নিলেও বুঝত। মাইনে যদিও খারাপ দেন না কিন্তু দিনে কত লাভ হয়, বিশেষ করে পয়লা বৈশাখ ও পুজোর আগে তা দেবী ভালই জানে। তাই যা পায়, তা ওর পরিশ্রম ও যোগ্যতা হিসেবে কিছুই নয়। কিন্তু কী করে! উপায়ও নেই। সারাঙ্গাতে আসে যতখানি আনন্দের জন্যে, ততখানি টাকার জন্যে নয়। নো-প্রফিট অর্গানাইজেশন বেশি টাকা দেবেনই বা কী করে। তবে সারাঙ্গাতে মাঝে মাঝেই আসতে পারে বলেই সে এখনও বেঁচে আছে।

ওরা দুজনেই যে দেবীর সহবাসের সঙ্গী সে কথা এই ভিগু, ভরতদা বা সুরাতিয়াদিদি বা মুসলিমদাদারা জানে না। ভাগ্যিস জানে না! ওরা শুধুমাত্র জানে যে, দু'জনের একজন দেবীর স্বামী। আর অন্যজন তার বন্ধু। কিন্তু চোখের সামনে ইন্দ্রজিৎদাদের দুজনকে দেখে তারা "ভদ্রলোকদের" সম্পর্কে যে ধারণা পোষণ করে এসেছে এত দিন এদের দুজনকে দেখে তা নিশ্চয়ই ভেঙে গেছে। বড় অপমানিত বোধ করেছে দেবী। সুরাতিয়া দিদির প্রতি অশোভন আচরণ করেছে ওরা। একথা ভরতদাদা ও ভিগুর কাছে শুনেছিল দেবী। লজ্জাতে মরে গেছিল। সুরাতিয়া দিদি নিজে অবশ্য কিছুই বলে নি। শুনে, দেবীর আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে হয়েছিল। দেবী শুনেছিল অনেকের কাছে যে, রাঁচির এক নামী বাঙালি ভদ্রলোক নাকি তার নিম্ফোম্যানিয়াক স্ত্রীর নির্লজ্জ বেলেল্লাপনার কারণে, চাকর ড্রাইভার প্লাম্বার মিস্ত্রী সকলের সঙ্গেই সেই মহিলার বিছানাতে যাবার প্রবণতার লজ্জা সহ্য করতে না পেরে, ঘুমের ওষুধ খেয়ে আত্মহত্যা করেছিলেন অনেকবছর আগে।

এই কি শিক্ষার নমুনা! মদ তো এইচ. পি. চ্যাটার্জিও রোজই খান। সেদিন খেলেনও রাতে ট্রেনে। কখনও কখনও ইন্দ্রজিৎদাও খান। দেবী তো একাই ছিল ক্যুপেতে।

কই? কোনো রকম অশালীনতা তো করেননি।

গত দু'রাত সে ঘুমোতে পারে নি। এই দুই নব জীবনের দূতের সঙ্গে দেবী কি করে কাটালো গত দেড়টা বছর! তা ভেবেই ওর বড় গ্লানি হচ্ছে। অথচ মায়ের কাছে থাকাটাও সম্ভব ছিল না। ওর দুঃখের কথা ওই জানে।

তার ভোলে-ভালা বাবার সঙ্গে, বাবার শেষ দিনকটিতে মা খুবই খারাপ ব্যবহার করেছিলেন। তার প্রেমিকেরই জন্যে। সে কথা দেবী ভুলতে পারে নি। পারবেও না কোনোদিন। আজকে সেই পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত হয়ত করছেন মা। যাই হোক, জন্মদাত্রী মা, যে ক'দিন আছেন তাঁর প্রতি সব কর্তব্যই করে যাবে দেবী। পাপ-পুণ্যের বিচার করবেন ওপরওয়ালা, যদি তিনি থেকে থাকেন।

এই ওপরওয়ালা ব্যাপারটা সম্বন্ধে তার কোনো ভয়-ভক্তি ছিল না। গত চার বছর ধরে ইন্দ্রজিৎ এবং বিশেষ করে সুমিতার সঙ্গে বিভিন্ন গ্রামে ঘুরে, ঘুরে-দিন রাত জঙ্গলে পাহাড়ে কাটিয়ে ওর মধ্যে একধরনের প্রকৃতি-সঞ্জাত ঈশ্বরবোধ গড়ে উঠেছে। গড়ে যে উঠেছে, সে বিষয়ে ও নিঃসন্দেহ।

ছেলেবেলাতে মায়ের হাত ধরে পুজোমণ্ডপে অঞ্জলি দিয়েছে ঠিকই। কিন্তু না বুঝে। যাঁরা অঞ্জলি দেন তাঁরা নানা Rituals পালন করেন, তাঁদের বিশ্বাসে দেবী আঘাত দিতে চায় না। কারণ, সেসব ভাল না খারাপ সে কথা জানার মতো বিদ্যাবুদ্ধি বা মানসিকতা ওর এখন গড়ে ওঠে নি। কিন্তু ওর মধ্যে যে প্রকৃতি-সঞ্জাত ঈশ্বরবোধ জন্মেছে তা একেবারেই অন্য জিনিস। সেটাও যে ঠিক কী তা ও ব্যাখ্যা করে বলতে পারবে না। তবে সেই বোধকে সে অন্তরের গভীরে সযত্নে ও সসম্ভ্রমে লালন করে।

৯

এইচ. পি. চ্যাটার্জির চিঠিটা হাতে নিয়ে অনেকক্ষণ বসে ছিল দেবী। আজই দুপুরে চলে গেছে কিংশুক আর অন্তু। রাঁচীর বাস ধরে। রাঁচী গিয়ে রাতে কলকাতার গাড়ি ধরবে হোটেলে খেয়ে।

আজ দেবী সারাঙ্গার বাঁধে যায় নি। বৃষ্টি যদি আরও হয় তবে বাঁধের এক জায়গাতে ফাটল দেখা দিতে পারে। চুলের মতো ফাটল দেখা দিয়েছে। আজকে ওদের বলে এসেছে যে, মুসলিম দাদার তত্ত্বাবধানে বাঁধকে মজবুত করে যেন ওরা। পাথরও অজস্রই আছে, বালিরও কোনো অভাব নেই। ট্রাকে করে সিমেন্টের বস্তা টোড়ি থেকে এনে ট্রাক যতদুর আসে, ততদূর পর্যন্ত নিয়ে গিয়ে তারপর বাঁশের দোলায় বয়ে এনেছে ওরা। কাজটা আজই সারা দরকার। সিমেন্টের বস্তাগুলো একটা চাঁর গাছের তলাতে প্লাস্টিকের চাঁদোয়া খাটিয়ে তার নিচে রাখা হয়েছে। কাল রাত থেকেই আকাশে মেঘ জমছে। বৃষ্টি যে কোনো সময়েই আসতে পারে। এলে সব পণ্ড হবে কিন্তু ঝুঁকি নিয়ে মেরামত না করেও উপায় নেই কোনো। ওরা সকলেই এ কাজে ব্যস্ত থাকবে আজকে। পাতার সারের জন্য যে বড় বড় গর্তগুলো করা হয়েছে সেগুলো আরও বড় করা দরকার। সেগুলোর উপরেও বাখারির আস্তরণ দিতে হবে।

সানেকা মুণ্ডাকে চা খাইয়েছিল দেবী। সে বলল, সাহেব মুরহুতে আচ্ছুরাম কালকাফফ-এর গেস্ট হাউসে আছেন। সকালে নাস্তা করেই বেরিয়ে পড়েন সোহনবাবুর সঙ্গে। আজকে বীরিসা মুণ্ডা যে পাহাড়ে থাকতেন তা দেখতে যাবেন খুঁটি থেকে তামারে, গভীর বনের মধ্যে দিয়ে যে রাস্তা চলে গেছে সেই রাস্তাতে। কাল যাবেন টেবো ও চক্রধরপুর। পরশু যাবেন বলরামপুর।

সাহেব ভাল আছেন তো?

দেবী জিজ্ঞেস করেছিল।

বহুবছর হয়ে হয়ে গেল অনাত্মীয় কারোর জন্যই এমন উদ্বেগ বোধ করে নি সে। নিজেকে দেখে নিজেই অবাক হল দেবী। সেদিন হাওড়া স্টেশনে এসে হাওড়া-হাটিয়া এক্সপ্রেস-এ চড়ার পর থেকে তার মধ্যে নানা রকম পরিবর্তন লক্ষ্য করছে যার কোনো ব্যাখ্যা সে জানে না।

মানেকা বলল, জী মেমসাব। সাহাব বহুত মজেমে হ্যায়।

সানেকা একটা প্যাকেট নিয়ে এসেছিল হাতে করে। তাতে নেসকাফের টিন, নর-এর চিকেন এবং টোম্যাটো স্যুপের গোটা বারো প্যাকেট, এক প্যাকেট লপচু চা এবং বিস্কফার্ম আর ব্রিটানিয়া কোম্পানির বিস্কিট।

মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠল দেবীর। মনে মনে বলল, এসব বাহ্য ব্যাপারের

প্রয়োজন বহু দিন হলো ফুরিয়ে গেছে ওর। এসবের কোনো দরকার ছিল না। এইচ. পি. তাকে অন্তরের যে উষ্ণতাটুকু দিয়েছেন সেটাই যথেষ্ট। তাতেই সে স্ফুরিত হয়েছে। আসলে এইচ. পি.-র সঙ্গে আলাপ না হলে ও জানতেও পেতো না যে তার ভিতরে এত ফাঁক-ফোকর ছিল, এত ফাঁকি ছিল।

মানেকা চলে গেলে গাছতলার বেদিতে বসে সে চিঠিটা খুলল। একটু পরেই সন্ধে হয়ে যাবে। কিংশুকরা এতক্ষণে হয়ত বিজু পাড়ার কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। ওদের সঙ্গে বিশেষ কথাবার্তা হয় নি আজকেও। আজকেও ওরা সকাল থেকে মহুয়া আনিয়ে জঙ্গলের মধ্যে একটি পাথরে বসে ছিল। অনেকগুলো গান; ওদের ভাষায় 'লিরিক' কম্পোজ করেছে নাকি—কিংশুক অন্তুর জন্যে। পরের মাসে নজরুল মঞ্চে 'ঝঞ্ঝাটিয়া পাখিরা' একটি অনুষ্ঠান করবে তাই অনেক গানের দরকার অন্তুর।

দেবীকে সবচেয়ে যেটা বেশি আহত করেছে তা হল ওদের দুজনের কারো মধ্যেই একটুও অনুশোচনা না দেখে। রাতে খোয়াঁরি ভাঙলে উঠে বাইরে এসে ফুটফুটে জ্যোৎস্না দেখে ওরা খুব খুশি হয়েছিল। কিংশুক বলেছিল, দেবী তোমার সেই নেকু নেকু রবীন্দ্রসঙ্গীত গাও তো একটা।

দাঁড়াও! রাম্-এর বোতলটা নিয়ে আসি। রাম্ খেতে খেতে শুনব।

অন্তু বলেছিল, ভুত পেত্নী তাড়াতে তো রাম নামই করতে হয়।

তারপরে বলেছিল, রাতে খিচুড়ি হচ্ছে তো?

সেরকমই তো শুনলাম। ইন্দ্রজিৎদাও তাই বলে দিয়েছেন। খিচুড়ি করতে আর অসুবিধা কি? সঙ্গে আর কি কি খাবে? আলু ভাজা আর ডিম ভাজা হচ্ছে।

সুরাতিয়ার ডিম?

দেবী প্রচণ্ড চটে উঠে ইংরেজিতে বলেছিল, এনাফ ইজ এনাফ। বিহেভ ইওরসেভলস। সকালে যা করেছ তা করেছ। আর নয়। তোমাদের ব্যবহারে আমার অতিথি অসম্মানিত হয়ে চলে গেলেন এখন আমার এখানকার সহকর্মীদেরও আমি অপমান করতে দেব না। যদি একটুও অসভ্যতা আর করো তা'হলে তোমাদের এই রাতেই বড় রাস্তাতে পাঠিয়ে দেব। তারপরে বাঘেই খাক কি ডাকাতেই ধরুক তোমরা বুঝবে।

বাবাঃ। এত পীরিত।

অন্তু বলেছিল।

কাদের ভয় দেখাচ্ছ তুমি দেবী? আমাদের? মেয়েছেলের কি অভাব আছে আমাদের? কলকাতাতে ফিরে অ্যাড্রেস বদল করো। আমরাও আমাদের স্বাধীনতায় এহেন মেয়েছেলের এমন হস্তক্ষেপ সহ্য করব না।

সত্যি বলছি, কিছু মনে কোরো না। তোমাদের প্যারেন্টেজ নিয়ে আমার মনে নানা প্রশ্ন জাগছে কিছুদিন হল। সব স্বাধীনতার মধ্যেই স্বেচ্ছারোপিত কিছু পরাধীনতা সুপ্ত থাকেই। তোমরা এমনই বালখিল্য যে, সেটুকু বোঝার মতো ক্ষমতাও তোমাদের হলো না। অথচ তোমরাই নিজেদের সর্বজ্ঞ ভাব।

এসব জ্ঞান পরে দিও। এখন গানটা গাও।

ইয়েস। অন্তু বলল, গানটা। সেই গানটা জোসনা রাতে সোবাই।

অন্তু বলল, গ্যাসসে বোনে।

অর্ডার দিয়ে গান হয় না।

কে বলেছে হয় না?

বলল অন্তু।

আমরা কেউ বাজারের পাখিকে অর্ডার দিলে সে গায় না গান?

সব পাখি সমান নয়।

ওক্কে। ওক্কে। কাল সকালেই আমরা ফুটে যাব।

এক্ষুণি যাও না। দ্যা সুনার উ গো দ্যা বেটার ফর এভরিওয়ান।

ইয়ার্কি পেয়েছ? কত খরচ করে এতদূর এলাম। তোমার ইচ্ছেতে ফিরে যাব? নিজেদের ইচ্ছেতে এসেছি, নিজেদের ইচ্ছেতেই যাব। আমরা স্বাধীন বাঙালি।

অন্তু বলল।

না রে! এখানে থাকব না।

কিংশুক বলল।

এখন চেপে যা। বর্ষাকাল! বড় বড় সাপ আছে। শেযে সাপের কামড় খেয়ে মরবি? তোদের শো-এর কি হবে?

গ্লাস আনতে বল না। এই ভিভু।

ও নাম ভিগু।

দেবী বলল।

ঐ হলো। আমি যে নামে ডাকব তাই ওর নাম হবে। তোমার নামও তাই হবে। তোমার নাম দেবী নয় বিদে।

ভিগু প্লাস্টিকের থালায় বসিয়ে দুটো গ্লাস এবং জলের ঘটি নিয়ে এল। তারপর দেবীকে ও জিগগেস করল, খিচুড়ির সঙ্গে কি পেঁয়াজি করবে? ভরতদাদা জিগগেস করছে।

করতে বলো। করতে বলো।

অন্তু বলে উঠলো।

পেঁয়াজী ভাজো, কিন্তু পেঁয়াজী মেরো না।

এমন সময়ে মুসলিম এসে দাঁড়াল। আলোছায়ার বুটি-কাটা জমিতে আধো আলো আধো ছায়ায় তার কুচকুকে কালো ছ'ফুট দুইঞ্চি মূর্তি দেখে ওরা দুজনেই বেশ ভড়কে গেল।

এ আবার কোন কাঁড়িয়া পিরেত বা?

কিংশুক বলল।

কাঁড়িয়া পিরেত ত ধুতি পিন্দতে থে। তুমি কে বাওয়া লুঙ্গি পরা ভূত?

ওঁর নাম মুসলিম ভাই। আমাদের এখানের ম্যানেজার। শুধু হাতে একটা চিতাবাঘকে মেরে ফেলেছিল। গায়ে এত জোর।

হাঃ আমরা পশ্চিমবঙ্গের ক্যালকাটার রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার।

আই। "কলকাতা" বল। সুনীলদা শুনতে পেলে খুব রাগ করবে।

দেবী ভাবল, এরা ছেলেবেলাতে সেই লাইনগুলিও কি পড়ে নি? 'নিজে যারে বড় বলে বড় সেই নয়, লোকে যারে বড় বলে বড় সেই হয়!' পশ্চিমবঙ্গকে এই দোষেই খেল। কী মন্ত্রী, কী আমলা, কী কেরানী, কী ফোর্থ ক্লাস কর্মচারী সকলেই গুমোরে মরল। নিজের রাজ্য ছেড়ে অন্য রাজ্যে কেউই যায় না, গেলেও সম্ভবত চোখ বন্ধ করেই যায়। নিজেদের গর্তে নিজেদের গুমোর নিয়েই পচে মরল সকলে। না করল কোনো কাজ, না পালন করল কোনো কর্তব্য, নিজ মুখেই, চেঁচিয়ে গেল আজীবন। আমাদের মতো ভাল আর কেউই নয়। দেখো। দেখো। উফঃ!! রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার! আমাদের মত আত্মমগ্ন, দুপুরবেলার মাঠে চরে-বেড়ানো ছাগলের মতো আত্মতুষ্ট, অপরিণামদর্শী, অনিয়মানুবর্তী, আত্মসম্মান-জ্ঞানহীন জাত আর ভারতে আছে কি না সন্দেহ। দুর্বুদ্ধিজীবী আর ভণ্ডদের ডিপো এই রাজ্য। স্বার্থান্বেষীদের স্বর্গ। বাঙালির যা কিছু ভাল তা আছে প্রবাসী বাঙালিদের মধ্যে। হয়ত বাংলাদেশীদের মধ্যেও।

ঝিরঝির করে হাওয়া দিচ্ছিল একটা পাতায় পাতায় সড়সড় শব্দ তুলে। আকাশের দিকে চেয়ে প্রার্থনা করল দেবী, আজ আর কাল যেন বৃষ্টি না হয়। দুটো দিন পেলে বাঁধটা মেরামত হয়ে যাবে। মানে মেরামতের জায়গাগুলো শুকিয়ে যাবে। দু'দিন পুরো রোদ পেলেই হবে। পরক্ষণেই ভাবল দেবী, ওর মনের ফাটা-বাঁধ কি মেরামত আদৌ হবে?

চিঠিটা এবারে খুলল দেবী। আলো থাকতে থাকতেই চিঠিটা পড়ে ফেলবে। যদিও চিঠিতে কি থাকতে পারে তা অনুমান করেছে মোটামুটি, তবু কি লিখেছেন এইচ. পি. তা জানতে ইচ্ছে তো করছেই খুব। বড় লজ্জা দেবীর, বড় লজ্জা।

দেবী,

কল্যাণীয়াসু,

আমি জানি যে চলে এলাম বলে তুমি খুব দুঃখ পেয়েছ কিন্তু ভাল করে ভেবে দেখলে বুঝতে পারবে তোমাকে এমবারাসমেন্টের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যেই আমি চলে এলাম।

নিজ গুণে আমাকে ক্ষমা কোরো।

দোষটা কিংশুক অথবা অন্তর নয় (তার ভাল নাম তুমি আমাকে জানাওনি এবং আমারও জানার সুযোগ হয়নি) দোষটা পুরোপুরি আমারই। কিংশুকরা ওদের 'ঝঞ্ঝাটিয়া পাখিরা'র জন্যে আমার নামে যে গান কম্পোজ করেছে সেটা কি শুনেছ? না শুনে থাকলে শুনে নিও।

গলার স্বর এবং সুর গান জ্ঞান দুইই ভাল এবং ওদের ভাষায় 'লিরিক'ও ভাল।

দোষটা আমার এই জন্যেই বলছি যে, প্রশংসা শুনে শুনে এবং আমার চারপাশে কিছু আজ্ঞাবহ স্বার্থান্বেষী চাটুকারও জমে যাওয়াতে আমি এই হরপ্রসাদ চ্যাটার্জি মানুষটার যে কোনো নেগেটিভ দিকও থাকতে পারে তা ভুলেই গেছিলাম। আমি এক কাঁচের স্বর্গের বাসিন্দা ছিলাম এতদিন। যে স্বর্গে শুধুমাত্র আমার বশংবদ মক্কেল আর আজ্ঞাবহ জুনিয়র এবং কর্মচারীদেরই বাস। অন্যভাবে বললে বলতে হয়, কোনো কোনো সফল ব্যবসাদার ও ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট সব সম্পর্ককেই মনিব ও

চাকরের সম্পর্ক বলেই মনে করেন এবং কোনো সম্পর্কই যাঁদের কাছে সমতার নয়, এবং মমতারও নয়, তাঁদের অন্য কেউ হঠাৎই তাঁদের বয়স, বৈভব, তাঁদের নিজস্ব ছোট্ট জগতের খ্যাতি ও ক্ষমতার দুর্ভেদ্য বর্ম ভেদ করে যদি তাঁদের নিছক অন্য একজন সাধারণ মানুষ হিসেবেই দেখতে চায় ও দেখে, তখন সেই প্রথমোক্তদের মোহভঙ্গ হয়। গুমোরে ধাক্কা লাগে। মোহভঙ্গ হওয়া আর অপমানিত হওয়া ত এক কথা নয়।

তোমার বন্ধুরা, যাদের সঙ্গে তুমি থাকো, যাদের কাছে তুমি দ্রৌপদী, আমাকে অন্যায় কিছুই বলে নি। আমার যে বয়স হয়ে গেছে, ওপারের ডাকের জন্যেই যে আমার বসে থাকা, আমি যে কুদর্শন, পৃথুল এবং "ধুমসো" "ফ্যাটসো" সে কথাও তো একশ বার সত্যি। আমি যে ওদের তুলনাতে সচ্ছল এটাও সত্যি।

আমাদের এই গরীব দেশে আমার মতো অতি সাধারণ সফল মানুষকেও দূরবীণের উল্টোদিক দিয়ে দেখে মস্ত বড়লোক বলে মনে হতে পারে। তা হতে পারে এইজন্যেই যে, বড়লোক কাকে বলে তা আমাদের মধ্যে কম মানুষই জানি। পশ্চিমী দুনিয়াতে যারা প্রকৃতই বড়লোক তাদের নিজের পাহাড় থাকে, দ্বীপ থাকে, নিজস্ব সমুদ্র ও সৈকত থাকে, আকাশ এবং জলে যাতায়াতের জন্য এযারোপ্লেন, হেলিকপ্টার এবং সী-প্লেন থাকে। বহু গণ্ডা গাড়ি থাকে, যার একটার দামই এদেশের সবচেয়ে দামী যে গাড়ি তার কুড়িটার দামের সমান। তাই আমাকেও বড়লোক ঠাউরে ওরা ভুল যদিও করেছে, অন্যায় করে নি কোনো। কারণ, আমাদের দেশে এখনও মানুষ অভুক্ত থাকে। আমাদের দেশে বড়লোক হওয়াটাই যথেষ্ট দোষের, তার অন্য কোনো দোষ থাক আর নাইই থাক।

ওদের সবচেয়ে বেশি রাগ হয়েছে আমি তোমাকে নিয়ে ফার্স্ট এসির ক্যুপেতে এসেছি বলে।

যেটা তুমি বোঝো, ওরা হয়ত বোঝে না। এক জন মানুষের কাছে মনটার দাম যে শরীরের দাম-এর চেয়ে অনেকই বেশি এ কথা ওরা সম্ভবত ওদের রগরগে যৌবন এবং শরীর-সর্বস্বতার দিনে বোঝে না। বোঝে না বলে আমি ওদের কোনো দোষও দিই না। আমার যদি ওদের মতো বয়স হতো এবং আমার ভালবাসার সঙ্গিনীর কাছাকাছি যদি কোনো কুদৃশ্য বয়স্ক মানুষ আসার চেষ্টা করত তবে আমারও রাগ হতে পারত ওদেরই মতো। ওদের রাগটা আদৌ দূষণীয় নয়।

এত কথা বললাম এই জন্যে যে আমি চলে আসায় তুমি দুঃখ যাতে না পাও তাই সুনিশ্চিত করতে। এই "ফিলদি রিচ ফ্যাটসোর" সঙ্গে সম্পর্ক তুমি নাই বা রাখলে। না রাখলেও আমার জীবন যেমন চলছিল তেমনই চলবে। যার জীবনে প্রাপ্তি বলতে প্রকৃতই কিছু নেই তার হারানোর ভয়টাও কম। যার অনেক আছে, হারানোর দুঃখ তাকেই বাজে। যার কিছুই নেই সে কোনো উপরি পাওনা থেকে বিচ্যুত হলে তার দুঃখ হবার কোনো কারণ ঘটবার কথা নয়। আমার জন্যে তুমি ভেবো না।

তুমি যে আমাকে তোমাদের সারাঙ্গাতে হাত ধরে নিয়ে এসেছিলে সে জন্যে আমি তোমার কাছে অশেষ কৃতজ্ঞ। ঠিক কতখানি যে কৃতজ্ঞ তা তোমাকে বলে

বোঝাতে পারব না। তোমাকে আমি প্রকৃতির মধ্যে আবিষ্কার করলাম—। যে রূপ তোমার আসল রূপ, সেই রূপকে প্রত্যক্ষ করলাম। কলকাতার যাদুঘরের আশুতোষ সেন্টিনারি হল-এর সেই সেমিনারের শেষে হলুদ শাড়ি আর কালো ব্লাউজ পরে একটা হলুদ বসন্ত পাখির মতো এসে তুমি আমার সঙ্গে আলাপ করেছিলে, আমার প্রশংসা করেছিলে, তারপর শুধু টেলিফোনের মাধ্যমেই তোমার সঙ্গে একটা আশ্চর্য মিষ্টি সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। এক দিন আমার সঙ্গে লাঞ্চ খাবার কথা ছিল, তাও হয় নি আমার বিচ্ছিরী কাজের জন্যে। আমরাই কাছাকাছি এলাম শুধু হাওড়া-হাটিয়া এক্সপ্রেসের ট্রেনের কামরাতে। এক সঙ্গে লাঞ্চ খেলে যেমন টেবিলের উল্টো দিকে বসে গল্প করতে করতে খেতে তেমনই ট্রেনেও রাতের খাবার খেয়েছিলে তারপর উপরের বাঙ্ক-এ উঠে শুয়েছিলে। সেই টুকুই আমার সঙ্গে তোমার 'সান্নিধ্য' যদি তাকে সান্নিধ্য আদৌ বলা যায়। তবে সেই টুকুই আমার কাছে অনেক। সত্যিই অনেক। সেই সুখস্মৃতিটুকু ভাঙিয়েই অনেক দিন কেটে যাবে আমার।

সেদিন তোমাকে মিথ্যে বলেছিলাম, যখন ট্রেনটা টাটিসিলোয়াই স্টেশনে দাঁড়িয়েছিল। আসলে আমি সারারাত তোমারই স্বপ্নে বুঁদ হয়েছিলাম। এই প্রৌঢ়র জীবনে তোমার মতো যুবতীর সঙ্গে এক কামরায় রাত কাটানো এক অভিজ্ঞতা। এই কথাকটি তোমাকে আমার বলা দরকার, নিজেকে ছোট করেও। দরকার এই জন্যে যে, পরে হয়ত আর সময় পাবো না। আমার হাতে তোমার মতো অঢেল সময় নেই দেবীশ্রী। তোমার এখন তো সবে শুরু হল জীবন. আর আমি শেষের কাছে পৌঁছেছি, জীবন-নদীর মোহানাতে দাঁড়িয়ে আছি।

এই চিঠি তোমাকে ধন্যবাদ দেওয়ারও জন্যে। তুমি এখানে না নিয়ে এলে ইন্দ্রজিৎ ও সুমিতা দের সঙ্গে আলাপ হতো না। মানুষের জীবনে প্রকৃতির ভূমিকা কি এবং কতখানি, নিজের বিত্ত, নিজের আরামের চেয়েও যে আমাদের এই গরিব দেশের মানুষদের সাচ্ছল্য, তাদের সুখবিধানের জন্যে কিছু করাটা অনেক বেশি আনন্দর, তা এখানে না এলে নিজ চোখে তোমাকে এবং ইন্দ্রজিৎবাবুদের না দেখলে জানতেও পেতাম না। এই দেবীকে দেবীর ভূমিকাতে জানতাম না। অনেক এন. জি. ও.কে জানি, কিন্তু দে সাহেবের ও তাঁর স্ত্রীর এই প্রজেক্টের মতো প্রজেক্টও যে হয় সে কথা জানতাম না। মানুষের জীবনের উপরে, সব বয়সী মানুষেরই জীবনের উপরে প্রকৃতির যে কি অভিঘাত, তার যে কি সুদূরপ্রসারী প্রভাব তাও জানতাম না। সত্যি বলছি, অনেক কিছুই জানতাম না।

তুমি হাত ধরে নিয়ে না এলেও আমি এখানে আবার আসব। হয়ত তোমার সারাঙ্গাতে আসব না। আশাকরি, একথা জেনে কিংশুক ও অন্তু খুশি ও আশ্বস্ত হবে।

আমি একটি গ্রাম অ্যাডাপ্ট করব ভাবছি। জাস্ট ভাবছি। এখনও মনস্থির করিনি। Still toying with the idea। যদি শেষ পর্যন্ত করিই তবে সেই গ্রামকে আমি সত্যিই দেখার মতো গ্রাম করে গড়ে তুলব। খরচের কোনো কার্পণ্য করব না কিন্তু সেই খরচের মধ্যে অশিক্ষিত বড়লোকের আত্মপ্রচারের রেশও থাকবে না। আর

আমার সেই প্রজেক্টের নাম দেব দেবীশ্রী। পাছে, তোমার দুই সঙ্গী তোমার উপরে চটে যায় তাই তোমাকে দূরে রেখে তোমার নামটা নিয়েই থাকব বাকি জীবন। তাতেও নিশ্চয়ই আপত্তি হবে না তোমার। তবে আমার প্রজেক্টের যতই সব কিছুই সাধারণ হোক না কেন যে বন বাংলোতে আমি আর আমার অতিথিরা থাকবেন সেটিতে অ্যাটাচড বাথরুম থাকবে। কমোডও থাকবে। সেপটিক ট্যাঙ্ক করে বাথরুম করব। এবং পুরনো সব বন-বাংলোতে যেমন থাকত, বাংলোর তিনদিকে ঘোরানো বারো ফিট চওড়া বারান্দা থাকবে। সব কটা বেডরুমেরই একটি করে দরজা থাকবে সেই ঘোরানো বারান্দার দিকে মুখ করা। সেই বারান্দাতে বড় বড় ডেক চেয়ার থাকবে—যাতে সারা দিনের পাহাড় জঙ্গল উপত্যকা পরিক্রমার পর সকাল থেকে সন্ধে পরিশ্রমের পর ইজিচেয়ারের হাতলে দুই পা তুলে দিয়ে ক্লান্তি অপনোদন করা যাবে। সারাঙ্গাতে তোমাদের দেখেই বুঝেছি যে, আরাম করা তাদেরই সাজে যারা শুধু মাথার কাজ নয়, অনেক শারীরিক পরিশ্রমও করে।

গত সন্ধেতে তোমরা যখন সারাঙ্গা থেকে ফিরে আসছিলে, আর আমি আর দে সাহেব তোমাদের অপেক্ষাতে ভাঙা ব্রিজের পিলারের উপরে বসেছিলাম তখন একটা আশ্চর্য দৃশ্য দেখালেন দে সাহেব। সূর্য ডুবছে আর চাঁদ উঠছে। কাল বুঝি পূর্ণিমা ছিল? পূর্ণিমা অমাবস্যা তো শহরে বোঝাই যায় না। ঠাকুমার যেদিন বাতের ব্যথা বাড়ত তখন আমাকে বলতেন, পঞ্জিকাটা দেখত হপু, আজ নিশ্চয়ই পূর্ণিমা কি অমাবস্যা। নিদেন পক্ষে একাদশী। ঠাকুমার বাতই ছিল পূর্ণিমা অমাবস্যা জানবার নিশ্চিত উপায়। আজকের কলকাতাতে পূর্ণিমা অমাবস্যা তো অনেক বড় ব্যাপার সকাল ও সন্ধে কখন আসে যায় তার খবরই বা কে রাখে। ক্ষুন্নিবৃত্তি আর আরও চাই আরও চাই এর দৌড়ে সকলেই ঘানি ঘোরানো চোখ বাঁধা বলদের মতো জীবন কাটাই। যার যা রোজগারই থাক সেই রোজগার সুষ্ঠুভাবে খরচ করার শিক্ষা আমাদের কারোওই নেই।

রিডার্স ডাইজেস্টএ একটা লেখা পড়েছিলাম, How evening comes। সন্ধে কিভাবে আসে, রাত কিভাবে শেষ হয় এইসব নির্জনে মনোযোগ দিয়ে দেখার মধ্যে দিয়ে সম্ভবত মানুষ নিজের মনুষ্যত্বকে উপলব্ধি করতে পারে। লেখাটা পড়েছিলাম বহু বছর আগে কিন্তু মানে বুঝি নি। লেখাটার তাৎপর্য যেন হঠাৎ করে বুঝলাম সারাঙ্গাতে এসে।

দে সাহেব বলছিলেন, গুহার মধ্যে লাল দেবতা ও লাল পাখিদের কথা। বলছিলেন সেই মস্ত প্রায় প্রাগৈতিহাসিক কদম গাছ তলার বড় কালো চ্যাটালো পাথরটার কথা—সেখানে একা এক ঘণ্টা বসে থাকলে মন থেকে সব টেনশন, দ্বেষ, মালিন্য, ঈর্ষা, ক্ষোভ ধুয়ে মুছে যায়। কদম-গাছ থেরাপি। সত্যি! একটা দিনেই যে কত কিছু জানলাম। শুধু জানাই নয়, কত কিছু উপলব্ধি করলাম। উপলব্ধি করলাম তোমাকেও। তোমাকে একজন প্রখর বুদ্ধিমতি, সপ্রতিভ এবং গভীর যুবতী বলেই জেনেছিলাম কলকাতাতে, তুমি যে এমন একজন ব্যক্তিত্বময়ী, কর্মী, অঘটন-ঘটন-পটিয়সী মহিয়সী নারী সে সম্বন্ধে সামান্যতম ধারণাও ছিল না। জওহরলাল নেহরুর 'দ্য ডিসকভারি অফ ইন্ডিয়া' পড়েছিলাম, যখন স্কুলে পড়ি।

পড়েছিলাম এ এল ব্যাশাম-এর 'দ্য ওয়ান্ডার দ্যাট ওজ ইন্ডিয়া'। কিন্তু কালকে তোমার সঙ্গে এসে এবং দে সাহেবদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে আমার দেশ, ভারতবর্ষকে নতুন করে আবিষ্কার করলাম। আমরা পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষিত বাঙালিদের মধ্যে অনেকেই পশ্চিমবঙ্গকেই ভারতবর্ষ বলে ভুল করি। পশ্চিমবঙ্গ যে ভারতবর্ষের একটা রাজ্য মাত্র এবং ভারবর্ষ যে অনেকই বড়, অনেক পুরনো, অনেকই যে আঁটে তার মধ্যে, অনেক বাধা, অনেক ব্যবধান, অনেক পরিধান, অনেক মতামত, এই সত্য উপলব্ধি করতে হলে গ্রামীণ ভারতবর্ষে বার বার আমাদের যাওয়া দরকার, থাকা দরকার, বিভিন্ন সাধারণ মানুষের সঙ্গে মেশা দরকার।

তুমি হয়ত বলবে, তোমার স্বভাবসিদ্ধ রসবোধের সঙ্গে। "একদিনের পক্ষে জানাটা একটু বাড়াবাড়ি রকমের বেশি হয়ে গেল না?"

আমি বলব, অবশ্যই। তবে সবটুকু জানাই এখুনি চর্বণ করার জন্যে নয়। গবাদি পশুরা যেমন যাই গেলে, তাই সঙ্গে সঙ্গে চর্বণ করে না, গলার থলেতে ভরে রাখে এবং অনেক পরে একটু একটু করে সময় সুযোগ ও প্রয়োজন মতো গলা থেকে মুখে এনে খাদ্যকে চর্বণ করার পরই তা উদরস্থ করে, তেমন করেই এই একদিনের জানাকে জমিয়ে রেখে জারক রসে ভিজিয়ে, ধীরে ধীরে হজম করব।

তোমাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি এ চিঠি। এতো চিঠি নয়, আমার চলে আসার কৈফিয়ৎ। অত মানুষের সামনে তো এতো সব কথা বলা যেত না। তোমার দুই ইন্টারেস্টিং সঙ্গীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসতে পারলাম না, আসার সময়ে। ওদের বোলো যে আমি কিছুই মনে করি নি। ওরা বরং এই মোহগ্রস্ত স্বপ্ন দেখা বুড়োকে সজোরে ধাক্কা দিয়ে বাস্তব কি তা বুঝিয়ে দিয়েছে। ওদের আমার ধন্যবাদ জানিও।

কলকাতা ফিরে, যদি ইচ্ছে হয়, তবে একটি ফোন কোরো। তোমাকে লাঞ্চ খাওয়াব বলেছিলাম। সে নেমন্তন্ন আছে এখনও। মনে করালাম সে কথা। যদি আসতে চাও, তো এসো।

আমি মুরহুতেই থাকব। কাল টেবো ঘাটে যাব এবং চক্রধরপুরেও। কলকাতা থেকে যখন ছুটি করেই এসেছি বহুদিন পর তখন যেমন কথা ছিল তেমনই ফিরব। সত্যি কথা বলতে কি সারাঙ্গাতে যাওয়ার পরে এবং তোমার সঙ্গে আর ইন্দ্রজিৎ ও সুমিতার সঙ্গে আলাপিত হবার পরে প্রকৃতির পরশ এমনভাবে জীবনে প্রথমবার পেয়ে কলকাতাতে আর ফিরতেই ইচ্ছে করছে না।

দে দম্পতি বারবার বলেছিলেন বলে আজই সকালে বারিয়াতুতে গেছিলাম। দে সাহেবদের প্রজেক্ট সত্যি খুব ভাল লাগল দেখে। ইন্দ্রজিৎ শুধু পণ্ডিত ব্যক্তি নন, একজন অত্যন্ত প্রাণবন্ত প্রকৃতি-পরায়ণ অতিথি-পরায়ণ পুরুষ। আর ঠিক ততখানিই ভাল সুমিতা। এদের দু'জনের মধ্যে যেন পুরুষ ও প্রকৃতির বাস্তবায়ন হয়েছে। তোমারই জন্যে আলাপ হলো আমার ওদের সঙ্গে। সে জন্যেও কৃতজ্ঞতা জানাই আবার। এ এক পরম প্রাপ্তি আমার জীবনে। তুমি কি আমাকে বলেছিলে

যে, সুমিতার আদিবাসী মহিলাদের নিয়ে যে ক্রিয়াকাণ্ড তার নাম "ভূমিকন্যা"? ওঁরা একটি মহিলা ফাউন্ডেশানও করেছেন, নাম দিয়েছেন, ভূমিকন্যা ফাউন্ডেশান। তোমরা যে কেঁচো সার বা Vermi-Compost, পাতা-সার বা Leaf-Compost করছ, কেমিক্যাল পেস্টিসাইডস এর বদলে Bio-Pestisides করছ, নিম-করৌঞ্জ, রসুন, লংকা ইত্যাদি থেকে সে সব তো আমার জানাই ছিল না। শুনলাম যে করৌঞ্জ আর নিম-এর সার বাজার ইতিমধ্যেই ধরে নিয়েছে। সারের নাম হয়েছে ভূমিজ। ভূমিকন্যা ফেডারেশনই ঐসব প্রডাক্ট মার্কেট করছে। এছাড়াও আদিবাসী মেয়েদের কাঁথা স্টিচ-এর কাঁথা করছে এবং তাও বাজারে সমাদৃত হয়েছে। ইকোলজিকাল ফার্মও দেখালেন দে সাহেব। মাশরুম, ডেয়ারি, পোলট্রি, র‍্যাবিট্রি, ডাকারি এবং সেরিকালচারও দেখলাম। এও শুনলাম যে ভবিষ্যতে লাক্ষা নিয়েও কিছু করার ভাবনা চিন্তা চলছে।

সব দেখে শুনে মনে হয়েছে মিথ্যেই শামলা এঁটে পাথর আর ইটের লাল দালানে জীবনটা "মী লর্ড। মী লর্ড!" করে কাটিয়ে দিলাম। প্রকৃতির মধ্যে থেকে প্রখর গ্রীষ্মের পরে মাটির নিচের বীজ থেকে অঙ্কুরোদ্‌গম দেখা, শুকনো ডালে ডালে প্রথম গুঁড়ি গুঁড়ি কিশলয় আসতে দেখা যে কত বড় এক গা-শিরশিরানি অভিজ্ঞতা তা কি এখানে না এলে কখনওই জানতাম।

বারিয়াতুতে ন্যাড়া পাহাড়টিতে আর্মিকে রাজি করিয়ে হেলিকপ্টার থেকে ঘাসের বীজ ছড়িয়ে দে সাহেব কি করে সেই পাহাড়ের সবুজায়ন করেছেন তা শোনা আর কোনো যুদ্ধ জয়ের অভিজ্ঞতা একইরকম। আমি তো পুরুষ, গর্ভবতী হবার অভিজ্ঞতা কখনওই আমার হবে না। কিন্তু দে সাহেবের এই ন্যাড়া অথবা নেড়ি পাহাড়কে সবুজাভ করে তোলার মধ্যে আমি যেন গর্ভাধানের অভিজ্ঞতাই পরোক্ষে অনুভব করলাম।

নাঃ! ঠিক করেছি এই ক্রিয়াকাণ্ডে আমিও দু'হাতে আস্তিন গুটিয়ে লেগে পড়ব। এখনও জীবনে যেটুকু সময় বাকি আছে তা কাজের মতো কাজে লাগাব। ইন্দ্রজিৎবাবুর ত সুমিতা আছেন, তুমি কি আমার ওই যজ্ঞে আমার কর্মসহচরী হবে? নর্মসহচরী তুমি কিংশুক আর অন্তরই থাকবে—আমার কর্মসহচরী হলেই আমি সুখী।

পুনশ্চ :

একটা কথা আমার মনে হয়েছে তাই বলি।

অন্তু আর কিংশুক হয়ত পরিকল্পনা করেই নিজেদের ভিলেইন প্রতিপন্ন করাতে এসেছিল এখানে। ওরা হয়ত দেখতে চেয়েছিল আমার সম্বন্ধে তোমার মনোভাবের প্রকৃতিটা কিরকম? ওদের ঐরকম ব্যবহারে তোমার রি-অ্যাকশন কেমন হয়? আমি বিশ্বাস করি না, বিনা প্ররোচনাতে কেউ অপরিচিত কোনো বয়স্ক মানুষের সঙ্গে এমন ব্যবহার করতে পারে। এটা হয়ত পুরোপুরিই ভান ওদের, তোমাকে বোকা বানাবারই জন্যে।

আমার অনুরোধ এই যে, ওদের উপরে কোনো অবিচার কোরো না। আমার কারণে অন্তত কোরো না। করলে, নিজেকে অপরাধী বলে মনে করব।

আফটার অল, ওরাই ত তোমার সব। আমি কে? আমাকে ত তুমি ভাল করে চেনোই না। ঘাটে বাঁধা থাকলে জোয়ার এলে ঢেউয়ের ছলাৎ ছলাৎ ধাক্কা লাগেই। ভুল করে সেই দোলানিটুকুকেই বিপজ্জনক ভেবে যদি নৌকো খুলে দিয়ে ভেসে পড় তবে বড় বড় ঢেউয়ে ছোট তরী ডুবে যাবে। ঘাট যে পেয়েছে, সে মাঝনদীর ভয়ের কথা জানে না বলেই তার অমন ভুল করা উচিত নয় কোনো মতেই।

আমি তোমার চেয়ে অনেক বড়, বয়সে। তোমার চেয়ে আমার অভিজ্ঞতা বেশি বলেই এই কথা লিখলাম। কিংশুক আর অন্তু খুবই ভাল ছেলে, খারাপ ছেলের অভিনয় করতে এসেছিল ওরা এবারে তোমার সারাঙ্গাতে।

১০

এইচ. পি.-র চিঠিটি পড়ার পর দেবীর শরীর মনে এক অভূতপূর্ব মন্থরতা এলো। এক ধরনের অবসাদ। দূরপাল্লার দৌড়বীর দৌড় শুরু করার আগে যেমন স্থির হয়ে যান, সংকল্পে কঠিন, শরীর মনের সমস্ত পেশী শিথিল হয়ে যায় তাঁর, পরে পরম কাঠিন্য আনার জন্যেই, দেবীর শরীর মনেরও এখন ঠিক তেমনই অবস্থা।

এ চিঠির জবাব কি দেবে। কেমন করে দেবে ভাবল ও সারারাত। জবাব না দিলেও হয়। উনি তো চিঠিতে কোনো প্রশ্ন রাখেন নি যে জবাব দিতে হবেই। তাঁকে জবাব দেওয়ার চেয়েও বড় সমস্যা হয়ে উঠছে এখন তার নিজের জীবন। তার জীবন এমনই এক প্রশ্নর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে যে সেই প্রশ্নর জবাব তাকে খুঁজে বের করতেই হবে। দেরী করার উপায় নেই কোনো। এবং সেই জবাবের উপরেই তার ভবিষ্যৎ নির্ভর করবে।

কি করবে দেবী?

বড় উতলা বোধ করতে লাগল ও।

রাতে সুরাতিয়া খেতে ডাকলে বলেছিল, কিছু খাবে না, শরীর ভাল নেই। এমনি তে ওরা রান্নাঘরেই খায় মেঝেতে বসে। আমকাঠের পিঁড়ি বানানো আছে, তাতেই বসে প্লাস্টিকের থালা বাটিতে খেয়ে নেয়। বাটিও অধিকাংশ সময়ে ব্যবহার করে না। গরম গরম, যাই রান্না হয় থালাতেই দিয়ে দেয় হাতা করে। অতিথিদের জন্যে বাইরে কাঠের টুল এনে দেওয়া হয়। চেয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয় গাছতলার বেদিকেই।

সারারাত মেঘ-ছেঁড়া চাঁদের আলো খেলা করে গেল তার চিন্তিত মুখের উপরে। ঘুমুতে পারল না দেবী। শুয়ে শুয়ে নানা রাত-চরা পাখি আর ছোট বড় জানোয়ারের আওয়াজ শুনল। প্রথম প্রথম ভয় পেত। আজকাল অভ্যেস হয়ে গেছে। স্বাভাবিক ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক-এর মতো মনে হয়। তারপর শেষ রাতে দুটি র‍্যাকেট টেইলড ড্রঙ্গোর ধাতব কর্কশ আওয়াজে চমকে উঠে বসল চৌপাই-এর উপরে। তখনও অন্ধকার।

সারারাত ধরে মনের মধ্যে একটা চিঠির খসড়া করেছে শুধু। সেই চিঠি 'এইচ. পি.'র চিঠির উত্তরও বটে এবং কিংশুক ও অন্তুকেও লেখা বটে, যদি শেষ পর্যন্ত লিখে উঠতে পারে। তবে এ চিঠি ওরা হাতে পাবে না। আজ মুসলিমদাদা যাবে রাঁচীতে, ইন্দ্রজিৎদার কাছে। গত কাল লাতেহারের কো-অপ থেকে নিম আর করৌঞ্জের Bio-Pesticide বিক্রির টাকা নিয়ে এসেছে হিসেব শুদ্ধ। তাই পৌঁছে দিতে যাবে। কারণ ইন্দ্রজিৎদা বেশ কিছু দিন ও পথে আসতে পারবেন না। উনি লোহারডাগার কাছের একটি গ্রামে ভূমিকন্যার একটি নতুন প্রজেক্ট-এর পত্তন নিয়ে

ব্যস্ত থাকবেন। যদি উত্তর একটা লিখতে পারে তবে মুসলিমদাদার হাতেই পাঠিয়ে দেবে রাঁচীতে। বারিয়াতুতে পৌঁছলে সুমিতাদি অথবা সুমনাদি ব্যাহেল সাহেবদের রাঁচীর বাড়িতে পাঠিয়ে দিতে পারবেন। আর ওঁরা পেলে, সে চিঠি মুরহু পৌঁছতে. সময় লাগবে না। কিন্তু কি লিখবে দেবী?

আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গেই বন জাগল। হাজারো পাখির কলকাকলিতে ভরে উঠল বনভূমি। দেবী ঠিক করল, চিঠিটা লেখা শেষ করে মুসলিমদাদার হাতে দিয়ে সে একবার সেই গাছতলাতে যাবে। সেখানে গিয়ে নুড়ি ছুঁড়ে দিয়ে এক ঘণ্টা বসে থাকবে। তার মন কাল থেকে বড়ই অশান্ত হয়েছে নানা কারণে। মনের শান্তি এবং মনের মধ্যে ঝড়-তোলা নানা প্রশ্নর উত্তরের জন্য তাকে আজ সেখানে যেতেই হবে। এর আগে, ওর মায়ের ডায়ালিসিস আরম্ভ হবার পর পরই একবার গেছিল সেখানে। সে সময়ে সে মায়ের এবং কাকুর কাছে গিয়ে থাকবে কি না কিংশুকদের সঙ্গ ছেড়ে তা নিয়ে মনের মধ্যে বড় টানাপোড়েন চলেছিল ওর। সেই টানাপোড়েনের হাতে থেকে বাঁচতেই গেছিল সে। আজকে তার জীবনে তার চেয়েও অনেক বড় সংশয় উপস্থিত। এই সংশয় এই সমস্যার সমাধান তাকেই করতে হবে। এই সিদ্ধান্তর উপরে তার পুরো ভবিষ্যৎ নির্ভর করবে। তাকে পরামর্শ দেবার কেউই নেই।

তারপর ভাবল, চিঠিটা এখন লিখবে না। ওই পাহাড় থেকে ঘুরে এসে তারপরই লিখবে। মনস্থির করে নিয়ে সুরাতিয়াকে বলে, দেবী চলে গেল।

ফিরে যখন এল প্রায় ঘণ্টা দুই পরে, যেতে-আসতে এক ঘণ্টা ত লাগেই, তখন রোদ উঠে গেছে। কাল বিকেল থেকে জমতে-থাকা মেঘের আস্তরণ সরে গেছে। মুসলিমদাদা, ভিগু, ভরতদাদা, সুরাতিয়া সকলের মুখেই হাসি ফুটেছে। আজকের দিনটা যদি এমন রোদ-ঝলমল থাকে তবে মেরামতী-করা বাঁধটাকে নিয়ে আর চিন্তা নেই। মুসলিম দাদাও বাঁধে যাওয়ার জন্য তৈরি।

দেবী বলল, মুসলিমদাদা তুমি আজ সুরাতিয়া দিদিকে নিয়ে যাও। এবাবে বেচারী আসার পরে রান্নাঘর থেকে এক দিনও ছুটি পায় নি। আজ ভরতদাদাই রেঁধে রাখবে, তোমরা দুপুরে এসে খেও। রাঁচী রওয়ানা হওয়ার আগে তুমি আমার কাছ থেকে একটা চিঠি নিয়ে যেও মনে করে। ভুলে যেও না। আমি আজ যাব না বাঁধে সকালে। বিকেলে যাব। আমার কিছু নিজস্ব কাজ আছে।

ওরা চলে গেলে, চা খেয়ে চানটান করে এল দেবী। এখানেই যখন থাকবে তখন চান করে উঠে—একটা লাল আর কালো খড়কে-ডুরে শাড়ি পরল। উলঙ্গ থাকা যায় না তাই কিছু একটা পরতে হয়ই। মেয়েরা শাড়ি বা গয়না পরলে তা অ্যাপ্রিসিয়েট করার মতো কেউই যদি না থাকে তবে এসব পরতে একেবারেই ইচ্ছে করে না। কিংশুক ও অন্তু এক দিনের জন্যেও তার পোশাক নিয়ে কোনো মন্তব্য করে নি। সুসজ্জিত, সালঙ্কারা দেবীর দিকে কখনও ভাল করে চেয়েও দেখে নি। ভাব দেখে মনে হয়, কিছু না পরলেই যেন ছিল ভাল।

কিংশুক এক দিন বলেও ছিল মেয়েদের সব সাজই তো খুলে ফেলার জন্যই। মানে, মেয়েদের নিরাবরণ রূপটিই একমাত্র বিবেচনার। কিছু বলে নি দেবী।

ভেবেছিল, যারা এত বড় প্রাচীনপন্থী তারাই আধুনিকতার বুলি কপচায়। প্রকৃত আধুনিকতার সঙ্গে সৌন্দর্য-পিপাসার কোনো বিরোধ আছে বলে জানে না দেবী কিন্তু ওরা তাই মানে। যাবৎ ট্রাডিশনের বিরুদ্ধেই ওদের জেহাদ। দুর্বিনয়, অভব্যতা, চিরাচরিতের বিরোধিতা করার মধ্যেই ওদের সব আনন্দ। কোনো কিছু ভাবাভাবি ওদের কাছে সময়ের নিছক অপব্যবহার। ওদের এই could not care less অ্যাটিটুডের সঙ্গেই দেবীর বিরোধ। দেবীর মনে হয়, পুরনো ট্রাডিশনকে ভাঙার আগে নতুন ট্রাডিশনের ভিত করে নেওয়া উচিত। নইলে, মানুষের সঙ্গে কচুরিপানার কোনো তফাত থাকে না আর।

অনেক ভেবে টেবে চিঠিটা আরম্ভই করে ফেলল দেবী। সম্বোধনে লিখল, মাননীয়েষু। শ্রীচরণেষু লিখতে পারলে খুশি হতো কিন্তু বঙ্গভূমে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করার মতো মানুষ ভারতের একশৃঙ্গ গণ্ডারেরই মতো অতি বিরল হয়ে গেছে। তা ছাড়া, যতখানি ভাল করে জানলে এবং ভক্তি করলে শ্রীচরণেষু লেখা যায় কারোকে এইচ. পি. স্যারকে ততখানি ভাল করে তো এখনও জানেনি দেবী।

তাই লিখল :

মাননীয়েষু,

সারাঙ্গা
পালামু
ঝাড়খণ্ড
২৫/০৮/০১

আপনার চিঠি পেয়ে বড় লজ্জা পেলাম। লজ্জিত হয়েই ছিলাম, সেই লজ্জার বোঝা আরও বাড়ল।

সেদিন মিউজিয়ামের আশুতোষ সেন্টেনারী হলে নারী প্রগতির উপরে আপনার বক্তৃতাতে আপনি যা বলেছিলেন তাই প্রকৃত নারী প্রগতি। তবে দুঃখের বিষয় এই যে ভারতীয় নারীরা এখনও ততটা স্বয়ম্ভর ও স্বাধীন হয় নি যতটা হলে "প্রগতি" শব্দটার যাথার্থ্য থাকে। তা ছাড়া নারীর অনুষঙ্গ এবং পরিবেশের অনেকখানিই পুরুষ নিয়ন্ত্রিত। এখনও। এবং পুরুষ জাতটার মধ্যে যে আপনার মতো পুরুষ বিধাতা বেশি সৃষ্টি করেন নি। নারী যদি আধুনিক হতে চায় তবে তার চারপাশের পুরুষদেরও আধুনিক হতে হবে। শারীরিক এবং অর্থনৈতিক দৌর্বল্যের কারণে এ দেশের নারীকে পুরুষের উপরে এখনও অনেকই দিন নির্ভর করতে হবে। এবং সেই পুরুষদের অধিকাংশই কিংশুক আর অন্তরই মতো।

আপনার প্রতি এবং ইন্দ্রজিৎদার প্রতিও ওদের দুর্ব্যবহারটা যে একটা পোজ মাত্র তা কিন্তু আমার মনে হয় না। ওরা আসলে এতই দুর্বল যে, বয়সে আপনি ওদের চেয়ে অনেক বড় এবং অন্য সব দিক দিয়েও। তা জানে বলেই আপনাকে সরাসরি অপমান করে আমার কাছ থেকে আপনাকে চিরদিনের মতো সরিয়ে দিতে চেয়েছিল।

প্রাণে না মেরেও মানুষকে সরানো যায় মানে মেরে। পুরুষের আত্মসম্মানজ্ঞান আজকাল নারীর সতীত্বরই মতো সদা-বিপন্ন।

আপনার সম্মানে আঘাত লেগেছিল বলেই তো আপনি সেই সঙ্কেতেই ইন্দ্রজিৎদার সঙ্গে চলে গেলেন। যা দিনকাল পড়েছে, এখন পুরুষের সম্মানও নারীর সম্মানেরই মতো সযত্নে অনুক্ষণ বাঁচিয়ে রাখতে হয়। একটু অসাবধানী হলেই তা হারিয়ে যেতে পারে। সম্মানহৃত নারী বা পুরুষের বাঁচাতে আর যাই থাক, আনন্দ থাকে না। আর আনন্দেই যদি না বাঁচা গেল তা হলে বাঁচাই বা কেন?

ওদের প্রসঙ্গ এবার বন্ধ করি। আমার জীবনের এক বিপজ্জনক অধ্যায়ে কিংশুক আমার জীবনে এসেছিল। তাই কৃতজ্ঞতাবশেই মা-মরা বাপ-খেদানো ছেলের সঙ্গে থাকতে রাজি হয়েছিলাম। আমারও তো পটভূমি খুব একটা সুস্থ ছিল না। আমার বাবার এক বন্ধুর সঙ্গে আমার মায়ের ঘনিষ্ঠতা ছিল। আমার মাও দ্রৌপদী ছিলেন। তাতে দোষ দেখিনি কিন্তু দোষ দেখেছিলাম অসুস্থ ও অসহায় বাবার সঙ্গে মা এবং তাঁর প্রেমিক যে ব্যবহার করেছিলেন তারই মধ্যে।

আমি আর কিংশুক দমদমে সস্তাতে বাড়ি ভাড়া নেবার পরে অন্তু স্রেফ অর্থনৈতিক কারণেই আমাদের সঙ্গে এসে জুটল। আমাদের দু জনেরও নুন আনতে পান্তা ফুরোচ্ছিল কিন্তু যৌবনের অকৃপণ উষ্ণতাতে একে অন্যকে বুকে জড়িয়ে আদর করে আমাদের অন্য অনেক অভাবই আমরা পুষিয়ে নিতাম। যৌবনের দান অকৃপণ। অনেক অভাবকেই একজন যুবক ও যুবতীর শারীরিক সান্নিধ্যর আনন্দ অবলীলায় ভুলিয়ে দিতে পারে।

অন্তু প্রথমে এসে জুটেছিল প্রাণের দায়ে। ওর বাড়ি বহরমপুরে। মামাবাড়িতে থাকত। রাজনীতি করত। গান গায় বলে বাম দলে নাম লিখিয়েছিল। এখন তো নাম লেখালেই হল। অর্থ যশ পৃষ্ঠপোষক সবই জুটবে। গলায় সুর থাকুক আর নাই থাকুক। তবে ওই করে তো বেশি দিন চলে না। ঝঞ্ঝাট সেন-এর খপ্পরে পড়ে "ঝঞ্ঝাটিয়া পাখিরা" নাম দিয়ে ব্যান্ড তো করল কিন্তু ঝঞ্ঝাট যেন ঝঞ্ঝাট বাধাতে লাগল। রোজগারের সিংহভাগই তার পকেটে যেতে লাগল, কারণ পার্টিতে তাকেই চেনে সকলে পুরনো ক্যাডার হিসেবে। ফলে ওর পক্ষে ওই সামান্য রোজগারে কলকাতাতে বাড়ি ভাড়া করে একা থাকা অসম্ভব ছিল। প্রথমে অর্থনৈতিক কারণে আমাদের সঙ্গী হল, পরে সে আমার শরীরের সঙ্গীও হল। কিংশুকেরও আপত্তি ছিল না কারণ ব্যাপারটা ওর ভাষাতে দারুণ "Mod" হল। অন্তুও নিজেকে Mod প্রমাণিত করার জন্যই ভিড়ে গেল, যতখানি না আমাকে ভাল লাগার জন্যে।

স্যার। আপনি বিয়ে করেন নি কিন্তু শারীরিক সম্পর্কও কি করেন নি কোনো নারীর সঙ্গে? করে থাকলে, অবশ্যই জানবেন যে, মন-বিবর্জিত শারীরিক সম্পর্ক কুকুর বা গোরুকে যতখানি মানায় মানুষকে ততখানি মানায় না। তা ছাড়া সিকিওরিটির ব্যাপারটাও থাকে। মেয়েরা বহু হাজার বছর ধরে সিকিওরিটির কারণেই পুরুষের কণ্ঠলগ্না হয়েছে এবং একই পুরুষের ঘর করেছে। এই নির্ভরতা-প্রবণতা তার রক্তে বইছে। আমাদের তিন জনের রোজগার এক করে তবেই বাড়ি

ভাড়া খাওয়া-দাওয়া টেলিফোন ইলেকট্রিক বিল মেটাই আমরা। আমিও সমান টাকা দিই। রান্নাবান্নাও তিন জনে ভাগ করে করি। আমি উপরন্তু দিই শরীর। সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে আমারই ঠকা হয়। ওরাও সেটা জানে।

আসলে সমস্ত সম্বন্ধর গোড়ার কথা হল শ্রদ্ধা। সে দাম্পত্যই হোক, কি অপত্য, কি বন্ধুত্ব। স্বামী বা স্ত্রীকে, বাবা বা মাকে, বন্ধুকে শ্রদ্ধা করতে না পারলে তাকে ভালবাসা যায় না। সাম্প্রতিক অতীত থেকে আমার কেবলই মনে হতো যে, ওরা আমাকে ইচ্ছে করে ঠকাচ্ছে। আমার মন-বিবর্জিত শরীরটাকে ওরা পারকুইজিটস্ এর মতো ভোগ করছে। পারফ্যুম বা শাড়ি বা অন্য উপহারের কথা বাদই দিলাম, ওদের মধ্যে কেউ আমাকে ভালবেসে কোনো দিন একটু ফুলও এনে দেয় নি।

আপনার বক্তৃতা যেদিন শুনতে যাই আশুতোষ সেন্টেনারী হল-এ তখনই আমার মধ্যে এক বিদ্রোহ বাসা বেঁধেছিল। বারুদে ঠাসা ছিল আমার মনের ঘর। আপনার বক্তৃতা তাতে দেশলাই কাঠি ঠুকে দিল। এই ফাঁকি আমি আর বইব না বলেই ঠিক করেছি আমি। আপনাকে যে আমি বলেছিলাম কিছু দিনের মধ্যে আমি কন্‌সিভ করব সেই কথাটা মিথ্যে কথা ছিল। তবুও যদি ওদের সঙ্গে থাকতাম তবেও না হয় ব্যাপারটা ঘটতে পারত কিন্তু ওরা এখানে যা করে গেল তারপরে ওদের সঙ্গে আমি একদিনও থাকতে পারব না। ফিরে গিয়ে আমার এক বান্ধবীর সঙ্গে বাগবাজারে একটি মেয়েদের মেস-এ উঠব। তারপর কি করব তা পরেই ভাবব। ভাবছি, কলকাতা ছেড়ে চলে আসব এখানেই চিরদিনের মতো।

এসব কথা থাক। শুধু একটি কথা বলি। তা হল আমি যদি ঘুণাক্ষরেও জানতাম যে, ওরা আপনার সঙ্গে এমন করবে তবে আপনাকে আদৌ আসতে বলতাম না। আমাকে আপনি যদি ক্ষমা না করেন স্যার তা'হলে আমি বড় অপরাধী হয়ে থাকব।

আপনাকে এখানে নিয়ে এসেছিলাম অনেক কল্পনা নিয়ে। গতবারে যখন এসেছিলাম তখন ইন্দ্রজিৎদা সুমিতাদি আর আমি লোহারডাগার কাছে একটি গ্রামে গেছিলাম নতুন একটি প্রজেক্ট শুরু করা যায় কি না তার প্রসপেক্টিং করতে। সেখানে পৌঁছে তো আশ্চর্য হয়ে গেলাম আমরা। সেখানে একটি পুরো রাজধানী আবিষ্কৃত হয়েছে। রাজবাড়ি, বাহিরমহল, অন্দরমহল, পুকুর। একটা পুকরের জলে রানী মুখ ধুতেন, অন্য পুকুরে চান করতেন। সেই পুকুর থেকে সোনার মাছ পাওয়া গেছে তিনটি। সরকারি আমলারা এসে নিয়ে গেছেন। ভাল করে খুঁড়লে আরও কি না জানি বেরোবে কিন্তু এখন পর্যন্ত যা খোঁড়াখুঁড়ি তা গ্রামের মানুষেরাই করেছেন। আর্কেওলজিকাল সার্ভের অফিসারেরা এখনও সেখানে পৌঁছন নি।

সত্যি! ভাবা যায় না। আপনি দুটি বই পড়তে বলেছেন কলকাতাতে ফিরে—তার মধ্যে The Wonder that was India বইটি ফিরেই পড়ব ঠিক করেছি। আমাদের দেশের বন-পাহাড়ে যে কত এবং কতরকম ধনরত্নই ছড়ানো আছে তার খোঁজ আমরা নিজেরাই রাখি না।

কোন উপজাতির রাজবাড়ি ওটি, কে জানে! এখানে, এই পালাম্যুতে কত উপজাতির বাস, চেরো, খাঁরওয়ার, ওঁরাও, মুণ্ডা, হো। আপনি কি 'কোয়েলের কাছে'

বইটি পড়েছেন? না পড়ে থাকলে, অবশ্যই পড়বেন। তাতে পালাম্যু ফোর্ট-এর প্রসঙ্গে কিছু প্রাক-ইতিহাস আছে। 'পালাম্যু' শব্দটি আসলে দ্রাবিড় শব্দ। 'পল+আম্ম+উ' এই তিনটি শব্দ থেকে সাহেবদের উচ্চারণে PALAMU হয়েছে। এই শব্দ তিনটির মানে হল দাঁত বের করা নদী। পালাম্যু ফোর্টের পেছন দিক দিয়ে ঔরঙ্গা নদী বয়ে গেছে। বর্ষার সময়ে জল যখন বাড়ে তখন নদীর বুকে বড় বড় কালো পাথর জেগে থাকে কলরোলে বয়ে-যাওয়া জলের মধ্যে, তখন মনে হয় নদী দাঁত বের করে আছে। সেই কারণেই, জায়গার নাম পালাম্যু।

জানেন স্যার, ঐ গ্রামের মানুষেরা যে ভাষাতে কথা বলে তার নাম কুরুক্। মুণ্ডাদের ভাষারই একটি উপ-ভাষা। ইন্দ্রজিৎদা আমাকে একটি বই পড়তে দিয়েছেন ফাদার হফফ্ম্যান-এর উপরে নানা জনের লেখা। লুথেরান জার্মান মিশনের ফাদার ছিলেন ফাদার হফফ্ম্যান। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে তিনি জার্মান বলেই তাঁকে ডিপোর্ট করা হয় কিন্তু অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় জাহাজে করে। মুণ্ডাদের বা ওঁরাওদের ভাষার কোন লিপি নেই। যুগযুগান্ত ধরে এই সব ভাষা মুখে মুখে বাহিত হয়ে বেঁচে আছে। লোহারডাগার ঐ গ্রামের কুরুক ভাষাও তেমনই এক ভাষা।

আমি ভেবেছিলাম আপনাকে নিয়ে যাব ঐ গ্রামে। গ্রামের নামটা আমি জানতাম কিন্তু মনে পড়ছে না। ইন্দ্রজিৎদা বলতে পারবেন।

জানি না, আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন কি না এবং ক্ষমা করে সত্যি সত্যি আবারও আসবেন কি না। যদি আসেন, তা'হলে কত কিছু যে দেখাবার আছে আপনাকে। আমি বাকি জীবন এখানেই কাটাব আর সর্বজ্ঞদের শহর কলকাতাতে ফিরব না ঠিক করেছি। দু'জায়গার খরচ চালানোও আমার পক্ষে সম্ভব নয়, বিশেষ করে ওদের সঙ্গে যখন আর থাকব না বলে সিদ্ধান্ত নিয়েইছি।

আপনি কি যেদিন ফেরার কথা সেদিনই ফিরছেন? তাই ফিরবেন। আমার ফেরার ঠিক নেই কোনো। আগেও যেতে পারি, পরেও। গিয়ে নিজের একটা অস্থায়ী বন্দোবস্ত করে নিয়ে আপনাকে ফোন করব একদিন।

কী আর বলব! আপনার মতো মানুষের ভালবাসা, থুড়ি, ভালবাসা নয় অকৃপণ স্নেহ যে পেয়েছি এ আমার পরম সৌভাগ্য। ভাল থাকবেন স্যার। আমাদের মতো অনেক মানুষের জন্যে আপনার ভাল থাকাটা দরকার।

প্রকৃতির মধ্যে চলে আসুন স্যার। অনেক তো উপার্জন করেছেন। আর কেন? এবার কষ্টার্জিত ধন যোগ্য কারণে ব্যয় করুন। দেখবেন, আনন্দে আপনার মন ভরে উঠবে। ইন্দ্রজিৎদা আর সুমিতাদি'র সঙ্গে যোগাযোগ রাখবেন, দেখবেন নতুন এক সবুজ অনাবিল জগৎ খুলে গেছে আপনার সামনে। জীবন আর প্রশ্বাস নেওয়া আর নিঃশ্বাস ফেলা যে এক নয় তা অবশ্যই বুঝতে পারবেন।

রাঁচীতে বারিয়াতুতে যখন গেলেন তখন সুমনা চক্রবর্তী দত্তর সঙ্গে দেখা হয় নি আপনার প্রজেক্ট অফিসে? দারুণ! না, মহিলা? উনিও একজন ডিরেক্টর—তবে অন্য নানা বিষয় দেখেন। কালোর মধ্যে অমন সুশ্রী, একমাথা চুলওয়ালা মহিলা আপনি ভারতে বেশি দেখেন নি নিশ্চয়ই!

কলকাতা ফিরে আপনাকে একটি বই পড়াব। ভেরিয়ার অলউইনের উপরে লেখা—রামচন্দ্র গুহর Savaging The Civilized। এখন আপনিও তো জঙ্গলে আসবেন বারে বারে—এসব বই পড়তে হবে initiation এর জন্য। জঙ্গলও তো এক বিশ্ববিদ্যালয়। এখানে ভর্তি হতেও ত কিছু প্রস্তুতি লাগবেই।

ভাল থাকবেন স্যার।

১১

এইচ. পি.-কে মুরহুর গেস্ট হাউসে পৌঁছে দিয়ে সোহনলালবাবু চলে গেছেন রাঁচীতে। যদিও এঁরা সর্দার পাঞ্জাবী কিন্তু ওঁদের পুরো পরিবারই নিরামিষাশীই শুধু নন, জৈনদের মতো সুর্যাস্তর আগেই খাবার খেয়ে নেন। মশা মাছিও মারেন না। তা'ছাড়া পথটা নির্জন। একটা ছোট ব্রিজ আছে, সরু, যেখানে গাড়ির গতি কমাতেই হয় এবং সে কারণেই সেখানে প্রায়ই না কি ডাকাতিও হয়।

চানটান করে তারপর খাবেন উনি। ভারি ভাল লাগল টেবো ঘাটের জঙ্গল পাহাড় এবং হিরনি জলপ্রপাতটি। চক্রধরপুরে গিয়ে বিয়ার কিনে দুপুরের খাবার আগে জঙ্গলে পিকনিক করলেন। সোহনলালবাবু এসব ছোঁন না। চমৎকার শুকনো পরোটা, আলুর ও পটলের শুকনো তরকারি, ক্যাপসিকাম স্টাফড, ছানা দিয়ে, নানা রকম আচার এবং বড় ফ্লাস্কে করে মশলা দেওয়া চা। মুরহুর এই গেস্ট হাউসে খাওয়া নিরামিষ হলে কি হয়, খাঁটি ঘিয়ে সব কিছু তৈরি। ইংল্যান্ড থেকে জার্সি গরু আনিয়েছিলেন। সেই গরুর বন্যার মতো দুধ। চমৎকার বাগান। আটজন মালি কাজ করে। সকাল-বিকেল চায়ের সঙ্গে মাঠ্‌রী খান। খুব ভালবেসে খান এইচ. পি। তিনি যে খেতে এত ভালবাসেন তা নতুন করে জেনে সুনিশ্চিত হলেন। যে মানুষ খেতে ভাল না বাসেন, যাঁর সব ঔৎসুক্য মরে গেছে তিনি যথার্থই বুড়ো। বার্দ্ধক্য শরীরের ব্যাপার নয়, মনেরই ব্যাপার পুরোপুরিই।

রোগ অনেকই রকম হয়েছে কিন্তু কোনো রোগকেই বিশেষ পাত্তা দেন না উনি। উনি বিশ্বাস করেন দে'জ মেডিকেলের ভূপেনবাবুরই কথায়। আর বিশ্বাস করেন মানুয বাঁচেও মনের জোরে, ডাক্তারের দয়ায় নয়।

মাঝে মাঝে তাঁর জীবনের গন্তব্যহীনতা, পরিণতিহীনতা তাঁকে হতাশ করে দেয়। বড় একা বোধ করেন। পাগল পাগল লাগে। তখন তাঁর বাঁচার ইচ্ছাটা পুরোপুরি অন্তর্হিত হয়। এমন কি মাঝে মাঝে আত্মহত্যা করতেও ইচ্ছা হয়। এইচ. পি. চ্যাটার্জির মতো প্রত্যেক সফল মানুষই জানেন যে, সাফল্যও মানুষকে ফ্রাস্টেট করে। ফ্রাস্টেশান শুধুমাত্র অসফল মানুষদেরই অসুখ নয়। সাফল্য যখন ফ্রাস্টেট করে তখন পুরোপুরিই করে। অসফল মানুষের নানা স্বপ্ন থাকে। সেই সব স্বপ্ন সফল করার ভাবনাতে বুঁদ হয়ে তাঁরা নতুন করে বাঁচার চেষ্টা করতে পারেন। কিন্তু সফল মানুষেরা ডেড এন্ড-এ পৌঁছে যান বলেই তাঁদের বাঁচার মতো কোনো তাগিদই আর থাকে না।

তবে মিথ্যে বলবেন না তিনি, দেবীর সঙ্গে আলাপিত হবার পর থেকেই তার মনে নতুন করে সুন্দরভাবে বাঁচার একটা ভীরু ইচ্ছা প্রবলভাবে মাথা চাড়া দিয়ে

উঠেছে। অর্থহীন নানা সুখকল্পনাতে নিমজ্জিত আছেন তিনি। চান করতে করতে গান গাইছেন প্রায়ই গুনগুন করে।

কলেজ জীবনে গান গাইতেন। গান বলতে শুধুই রবীন্দ্রসঙ্গীত এবং অতুলপ্রসাদের গান। একটা গানের স্কুলে কিছু দিন গান শিখেও ছিলেন। কিন্তু কাজের জগতে ঢুকে পড়ার পরে গান তাঁর জীবন থেকে ছুটি নিয়েছিল। কিন্তু সাঁতার কাটা বা সাইকেলে-চড়ারই মতো, গান এক বার শিখলে মানুষ জীবনেও তা ভোলে না। স্বর হয়ত নড়ে যায়, দম হয়ত কমে যায়, তবলার সঙ্গে না গাওয়াতে তালের হয়ত গণ্ডগোল হয়, উঁচু স্কেল-এ হয়ত গাওয়া যায় না কিন্তু গান ঠিকই বেঁচে থাকে সেই মানুষের বুকের মধ্যে। বসন্তর আগমনে বা আষাঢ়ের প্রথম বর্ষণে সেই সুপ্ত বীজ হঠাৎই অঙ্কুরিত হয়ে অপ্রস্তুত মানুষকে চমকিত করে।

একটি গান আজকাল তিনি প্রায়ই গুনগুন করে গাইছেন। করছেন। সচেতনভাবে যে গুনগুন করছেন তা নয়। তাঁর অবচেতন থেকে গানের কলিগুলি স্বতঃস্ফূর্তভাবে হাজির হয়ে তাঁকে একেবারে আপ্লুত, সিক্ত করে দিচ্ছে। দেবব্রত বিশ্বাস এই গানটি ভারি ভাল গাইতেন, মানে যে গানটি কিছু দিন হল গুনগুন করছেন উনি। জর্জ বিশ্বাসের মৃত্যুর পরে হঠাৎ এতো মানুষ ওর ছাত্র ছিলেন বলে সোচ্চারে দাবি করছেন যে লজ্জাতেই এইচ. পি. কারোকেই বলেন না যে জর্জদার রাসবিহারী অ্যাভিন্যুর উপরের ত্রিকোণ পার্ক-এর পাশের বাড়িতে গিয়ে তিনিও বেশ কিছুদিন গান শিখেছিলেন।

সেই গানটি হল, 'আমার বেলা যে যায় সাঁঝ বেলাতে তোমার সুরে সুরে সুর মেলাতে/ একতারাটির একটি তারে গানের বেদন বইতে নারে / তোমার সাথে বারে বারে হার মেনেছি এই খেলাতে / তোমার সুরে সুরে সুর মেলাতে/' ......

গানটি পূজা পর্যায়ের কিন্তু রবীন্দ্রনাথের অনেক পূজার গানই প্রেমের গান বলে ধরে নেওয়া যায়, যেমন অনেক প্রেমের গানকেই পূজার গান বলে। আসলে, প্রেম আর পূজাতে তো কোনো তফাত নেই। বিরোধ ত নেইই!

কেন যে এই গানটিই আজকাল ঘুরতে ফিরতে, স্বপনে জাগরণে ফিরে ফিরে মনে আসে তা তিনি বলতে পারবেন না কিন্তু এই গানটির "SPELL"-এর মধ্যে বাস করছেন তিনি কিছুদিন হল। নিশিতে ডাকার মতো এই গানটি তাঁকে অনুক্ষণ ডাকছে রাতে দিনে।

যাঁরাই একটু আধটু গানবাজনা করেছেন কখনও তাঁরাই জানবেন এমনটা সত্যিই ঘটে। আর যখন ঘটে, তখন "নিশিতে পাওয়া" মানুষের মতোই অবস্থা হয় সেই মানুষের।

এইচ. পি. ঠিক করলেন যে, কিছুক্ষণ পায়চারি করে তারপর চান করবেন। তারপর কলকাতাতে কটি ফোন করতে হবে মোবাইল ফোনে। এখানে যদিও ফোন আছে তবে তা ব্যবহার করতে অফিস ঘরে আসতে হয়। কী দরকার! তাঁর স্যুইটের ড্রইং রুমের সোফাতে বসেই যখন করা যাবে মোবাইল-এ। এখানে এসেই মোবাইল ফোনটা চার্জ করে নিয়েছেন।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পায়চারি করা হল — বিশুদ্ধ পরিবেশে। প্রায় সারাদিনই

গাড়িতে বসে ছিলেন। কোমরে ব্যথা হয়ে গেছে। পলিউশান বলতে কিছুমাত্রও নেই। সারা দিনে হয়ত এই পথ দিয়ে পনেরো কুড়িটা গাড়ি ও বাস যাওয়া-আসা করে। পরিবেশ বিশুদ্ধ কিন্তু বড় ন্যাড়া হয়ে গেছে এই অঞ্চল। বন নষ্ট করে ফেলা হয়েছে। সেই তুলনাতে সারাঙ্গাতে দুটি দিন কাটিয়ে যে এলেন তাকে স্বর্গ বলে মনে হচ্ছে এখন।

এমন সময়ে একটা সাদা ফোর্ড আইকন এসে ঢুকল কারখানার গেট-এ। গেস্ট-হাউসটি কারখানার চৌহদ্দিরই মধ্যে। ওর কাছে যখন এল গাড়িটা মস্ত চওড়া ড্রাইভ ওয়ে বেয়ে, তখন দেখলেন সোহনলালবাবুর ছোট ছেলে বাব্বি যার ভাল নাম জগদীপ এবং তার ভালবেসে বিয়ে করা গুজরাটি স্ত্রী বিন্দু। বিন্দুর কাকা এইচ. পি-র সঙ্গে কলেজে এক সঙ্গে পড়তেন।

গুড ইভনিং আঙ্কল।

বলে. গাড়ি থেকে নামল বাব্বি।

গুড ইভনিং। তুম কব আয়া কলকাত্তা সে?

আজই সুব্বে আঙ্কেল। ম্যায় আয়া, ঔর কুকু গ্যয়া।

তো আঙ্কেরামে কিঁউ আয়া খুবসুরৎ বিবিকো লে কর? ড্যাকাইতি তো হোতে হি রহতা হ্যায় হিয়াঁ। পিতাজী বলতে থেঁ।

জী হাঁ! মগর ক্যা করু? আপকে লিয়ে জরুরি খত আয়াথা বারিয়াতু সে। দে সাহাবনে ভেজিন। উসি লিয়ে পোস্টম্যান বনকর উও খত লেতে আয়া। বহতই জরুরি খত হোগী।

খত?

অবাক হলেন এইচ. পি.।

তারপর বললেন দে সাহাব তো ফোনসে ভি বাত কর সকতে যে ইতমিনান সে।

খ্যয়ের উনকি লিখা হুয়া খত্ নেহি না হ্যায়। দু'সরা কোঈ ভেজা হোগা।

চিঠিটা হাতে নিতে নিতে বললেন, এইচ. পি. আও অন্দর চলো। খানা খা কর যাও না হামারা সাথ।

বলেই, লজ্জা পেলেন।

বললেন, ম্যায় তুমহারা মেহমান হুঁ ঔর বাত অ্যায়সী কর রহা হ্যায় কি, যো লাগতা হ্যায় তুম দোনো হামারি মেহমান হো।

উও বাত তো বিলকুল সাহি হ্যায়। আপহি কো তো হ্যায়ই হ্যায় সব কুছ। পিতাজীকি ছোড়কর হামলোগোকি শর মে হাত রাখনেওয়ালা আদমী ঔর হ্যায় কিতনা?

এইচ. পি. বললেন, খানা নেহি খানা তব হিঁয়া জাদা দের তক রোকো মত। জলদি লওট যাও। সান্নাটা রাস্তে হ্যায়, রাস্তে লম্বে ভি হ্যায়। সাথমে বহুজী হ্যায়।

বাব্বি ও বিন্দু গাড়ি থেকে নেমে পড়েছিল।

হেসে বলল, দুধ লেনা না হোগা। দুধ ঔর ফুল। সুবা সাম দো দফে দুধ ঔর ফুল লেনেকে লিয়ে কিসিকো না কিসিকো আনাহি পড়তা। ঔর আজকালকি বিবি শাসকি সাথ জাদা দের তক রহ নেহি শক্তি।

বিন্দুকো রাস্তেমে চাট ঔর ভেলপুরি খিলা কে তবহি না ঘর যাও গে।

উও ডিউটিতো আনেকা ওয়াক্তই পুরি কিয়া।

বলে, হাসল বাব্বি। বিন্দুও হাসল।

বিন্দু বলল, আক্কেল সাদী-শুদা আদমী নেহি হোনেসে ক্যা হোগা, সবহি চিজকি খয়াল রাখতে হেঁ।

ওয়াহ! ওয়াহ! বাহাদুর লেড়কী হো তুম।

তারপর বললেন, ইসসাল বিজনেস ক্যায়সা? এক্সপোর্ট? এক্সপোর্টকি অ্যাওয়ার্ড ইস সালভি মিলেগী না?

ইস সাল লাগতা হ্যায় কি সমর সিং জয়সোয়াল কোহি অ্যাওয়ার্ড মিলেগী।

এইসী বাত?

জী হাঁ। হর সাল মিলনা ভি নেহি চাহিয়ে। সবহিকো মিল-জুলকে মিলনা চাহিয়ে। শেল্যাককি ট্রেডমে জেলাসি ক্যাফি হ্যায়। সবকুছ শোচ-সমঝকর করনা চাহিয়ে।

বাঃ বেটা। তুমতো বাহাদুর বন গ্যয়ে। বহত খুউব।

ওরা দু'জনে গাড়ি থেকে নেমে পা ছুঁয়ে প্রণাম করেছিল আবার যাবার সময়েও পা ছুঁয়ে প্রণাম করল।

তার মক্কেলদের মধ্যে ভারতের সব প্রদেশীয়রাই আছেন, কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারীর। বাঙালি ছাড়া, এই সহবৎ, এই বিনয়, অন্য সব প্রদেশীয়র মধ্যেই দেখতে পান এইচ. পি.। বিশেষ করে যিনি তাঁদের চোখে "কাজের মানুষ" তাঁর প্রতি সম্মানের কোনো ঘাটতিই থাকে না। শুধু বাঙালিরাই পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম তো দূরস্থান, নমস্কারও করেন না। এইচ. পি.-র কাকা, ব্যারিস্টার নরেন চ্যাটার্জি বলতেন, বাঙালি ব্যবসা কী করবে রে! ওরা দু'হাত জোড় করে সুন্দর করে নমস্কারই করতে শিখল না আজ অবধি। আদৌ কোনো দিন শিখবে কি না কে জানে! ব্যবসার নব্বই ভাগই হচ্ছে ব্যবহার, বিনয়। এই সরল সত্যটুকু বাঙালি যত তাড়াতাড়ি বোঝে ততই মঙ্গল।

এখন যে নবজাগরণের ঢেউ উঠেছে। তারা তো মনে হচ্ছে বাঙালিকে জাগিয়েই ছাড়বে।

সেদিন বার লাইব্রেরীতে ঘোষ সাহেব বলছিলেন।

তাকে মৈত্র বলেছিল, যে-জাত আত্মহত্যা করে নিজেরাই কবরে সেঁধিয়েছে সেই জাতের 'নবজাগরণ' হওয়া মুশকিল। যীশুখ্রিস্ট Ressurrected হয়েছিলেন বলে সকলেই তো আর তা হতে পারেন না।

গাড়ির ডিকি ভর্তি ফুল আর বড় বড় মুখবন্ধ স্টেইনলেস স্টিলের পাত্রে দুধ নিয়ে ওরা চলে গেলে তীব্র উৎসুক্যে ড্রাইভওয়ের হ্যালোজেন লাইটের তলাতে দাঁড়িয়েই খামটা ছিঁড়লেন এইচ. পি.। খামের উপরে গোটা গোটা অক্ষরে মেয়েলি হাতের লেখাতে লেখা ছিল প্রতি/শ্রী হরপ্রসাদ চ্যাটার্জি, মুরহু। প্রেরক দেবীশ্রী ভট্টাচার্য, সারাঙ্গা।

চিঠিটা খুলতেই দেখলেন সম্বোধনটি : মাননীয়েষু স্যার,

হাসি পেল ওঁর। কখনওই অধ্যাপনা না করেই এমন 'স্যার' হবার ভাগ্য সকলের হয় না। কে জানে! একটা দূরত্ব বজায় রাখার জন্যেই বোধহয় এইচ. পি.-কে স্যার বলে দেবী, দেবীশ্রী। কই ইন্দ্রজিৎ দে-কে তো স্যার বলে না ও, 'ইন্দ্রজিৎ দা' বলেই সম্বোধন করে। আসলে তিনি দূরের মানুষ বলেই তাঁকে দূরে দাঁড় করিয়ে রাখবার জন্যেই এই স্যার সম্বোধন।

চিঠিটা পড়া শুরু করেও পড়লেন না তিনি। ঠিক করলেন, চান করে উঠে খাওয়ার আগে সোফাতে বসে কুশান দেওয়া স্টুলের উপরে পা তুলে দিয়ে একটা হুইস্কি ঢেলে নিয়ে তারপরই পড়া শুরু করবেন চিঠিটা। কি লিখেছে দেবী কে জানে!

সোডা দিয়েই হুইস্কি খান। সারাঙ্গাতে সোডা ছিল না। সোহনবাবু লেহারের প্লাসটিকের বোতলের দু'ডজন সোডা আনিয়ে রেখে দিয়েছেন। রান্না যে করে, তাকে এবং খিদমদগার দু'জন আদিবাসী মুণ্ডা ছেলেকে বলে দিয়েছেন চারটে করে ফ্রিজে ঢুকিয়ে রাখতে, অন্যগুলো স্টোর রুম-এ থাকবে।

যে কোনো চিঠিই খুলে ফেললে তা তুলে-ফেলা ফুলেরই মতো হয়ে যায়। তারপর অবশ্য চিঠি পড়তে শুরু করলে আবার নতুন নতুন ফুল ফুটতে থাকে মনের বাগানে। রঙ-মশালের নানারঙা আলো উড়তে থাকে চারদিকে। নিজে চিঠি আদৌ ভাল লিখতে পারেন না, বাংলায় চিঠি লিখতে ত জানেনেই না, কিন্তু ভাল চিঠি পেতে ভারি ভাল লাগে ওঁর। অসমের গোয়ালপাড়ার গৌরীপুরের এক পাতানো-বৌদি এমন সুন্দর সব চিঠি লিখতেন এইচ. পি.-কে যে, সেই সব চিঠি পড়েই তাঁর সঙ্গে গভীর এক প্রেমের অশরীরী সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। মনে মনে সেই মহিলাকে অদেয় তাঁর কিছুই ছিল না।

সেই পাতানো বৌদি মাত্র পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়ায় মারা যান। বেঁচে থাকলে কি হত বলা যায় না। এই ফোন, ফ্যাক্স, ইমেইল-এর দিনেও চিঠিব কোনোই বিকল্প নেই, মনে হয় এইচ. পি.-র। ঐ সব হচ্ছে ব্যবসার উপকরণ আর চিঠি হচ্ছে ব্যক্তিগত সম্পর্কের সেতু। জাপানিজ গার্ডেনের লিলিপুলের উপরে যেমন সুদৃশ্য কাঠের পুল থাকে তেমন সেতু। সে সেতুর চারপাশে ভ্রমর আর প্রজাপতি ওড়ে, চেরী ফুল আর অমলতাস ফোটে। চিঠির মধ্য দিয়ে এক জন মানুষ অন্য জনকে যেমন করে সুগন্ধি প্রজাপতির মতো ছুঁয়ে যেতে পারে, তেমন করে আর কোনো মাধ্যমই পারে না বলেই মনে হয় ওঁর। তবে উনি ব্যাক ডেটেড - 'ফ্যাটসো', 'ধুমসো' এক জন মানুষ। এই নব্য যুগে একেবারেই বাতিল। তাঁর মতামতের দাম হয়ত কারো কাছেই নেই।

চান করতে করতে এইচ. পি. ভাবছিলেন, ইন্দ্রজিৎবাবুদের নানা প্রজেক্ট দেখার পর এই লাক্ষার কারখানা দেখা আর এক অভিজ্ঞতা। সোহনলালবাবুর কাছ থেকে সারা দিনে অনেকই শিখলেন। লাক্ষাকে এখানে বলে 'লা'। 'লা' কোনো ফল নয়, ফুলও নয়। লা নানা গাছের এক রকমের পোকার ক্রিয়াকাণ্ড থেকেই হয়। নানা রঙের লা বা লাহি হয়। এই লাহিরই ইংরেজি নাম Seed-Lac. এই Seed-Lac থেকেই Shellac উৎপাদিত হয়। যারা লাহি উৎপাদন করে, মানে Seed-

Lac- এর গাছ করে, তাদের বলে গাছোয়াল। কুল, কুসুম, পলাশ, এই সব নানা গাছে লাহি হয়। পাঞ্জন এবং লিপ্‌সি গাছেও হয়। বাংলাতে যে-গাছকে পাকুড় গাছ বলে সে গাছেও হয় না কি। পাকুড় গাছ দেখেন নি কখনও এইচ. পি.। কিই বা দেখেছেন! পোকা-লাগা ডাল থেকে চিলতে কেটে সে গাছেরই অন্য ডালে লাগিয়ে দিলে কলমের মতো সেখানেও পোকা হয়। লাহি নানারঙের হয়। আষাঢ় মাসে কুসুম গাছে যে লাহির কলম বাঁধা হয় তা কাটা হয় কার্তিক মাসে। সেই লাহির নাম কাত্‌কি। কার্তিক মাসেই সেই ডাল কাটে। পোকা-ধরা ডাল চলে যায় হাটে হাটে আর সেখান থেকেই পাইকারেরা তা সংগ্রহ করে বিভিন্ন Shellac ফ্যাক্টরিতে চালান দেয়। 'কাত্‌কি'কে "রঙিন"ও বলে। রঙিন কুল ও পলাশ গাছেও হয়। এই রঙিন লাহি পলাশ ফুলের মতো লাল বা লালের বিভিন্ন শেডস-এ হয়। কার্তিক মাসে কুল গাছে যে কলম করা হয় তা ওঠে বৈশাখ মাসে। তাকে বলে "বৈশাখি"। কুসুম গাছে যে লাহি হয় তার নাম "কুস্‌মি"। হাটে যে লাহি যায় তাকে লাহি বলে না, বলে খাদন। খাদন হচ্ছে Impurities. পাটের যেমন 'ধলতা', সোনার বা কাঁসা পেতলের যেমন 'গলতা', লাহির খাদনেরও তেমন 'খাদ'। হাটে হাটে গাছের ডালের টুকরোগুলোই আসে। খাদন শুদ্ধু লাহি। খাদন থেকে লাহি আলাদা করে ওজন করা হয় কে জি হিসাবে। সেই লাহিকে, মানে খাদন ছাড়া লাহিকে বলে চৌরী। চৌরীর দাম স্বভাবত বেশি হয় খাদনের চেয়ে। সোহনলালবাবু বলেছিলেন যে, দার্জিলিং, আসাম আর সিঙ্গাপুরে লাহি নাকি অড়হর গাছেও হয়।

কত কিছুই জানার আছে। সত্যি। জানার ইচ্ছা যদি কারো থাকে তা'হলে জীবনে জানার শেষ নেই বোধহয়।

চান করে উঠে একটি হুইস্কি ঢেলে নিয়ে সোডা মিশিয়ে চুমুক দিলেন। সারা দিনের দৌড়াদৌড়ি বা কাজের পরে গরম জলে চান করে উঠে দু'তিনটি স্কচ খাবার আনন্দই আলাদা। তবে, তাঁদের কলেজের অধ্যাপক পি. এম. নারিয়েলওলা বলতেন, "You must earn your scotch." এই কথাটা কিংশুক অথবা অন্তুর সঙ্গে আবার যদি কখনও দেখা হয় তবে ওদের বোঝাবেন এইচ. পি.। "Nothing comes from nothing, nothing ever could. I must have done something good in my youth or in childhood." জীবনের প্রত্যেকটি জিনিসই অর্জন করতে হয়। ওরা সেই অর্জনের কষ্ট হয়ত স্বীকার করে নি তাই অনেক কিছুই হারাবে। অথবা এও হতে পারে যে ওরা জীবনে সুযোগই পায়নি নিজেদের প্রমাণ করার। এইচ. পি. যেমন পেয়েছিলেন। যদি তাই হয়, তবে সেটা ওদের দুর্ভাগ্য। এই সমাজেরই গ্লানি সেটা। সমান সুযোগ প্রত্যেকেরই থাকা উচিত, তারই পরে যোগ্যতা বা অযোগ্যতার বিচার হওয়া উচিত। আজকেও লক্ষ লক্ষ তরুণ-তরুণীদের সামনে সেই সুযোগ এনে দেওয়া যে গেল না সেটা এই সমাজব্যবস্থার ও রাষ্ট্রেরই অযোগ্যতা। স্বাধীনতার পরে এত বছরে সেই সুযোগ আসা ও থাকা অবশ্যই উচিত ছিল।

এসব কথা সব সময়ে যে ভাবেন তা নয় কিন্তু যখন ভাবেন তখন মন খারাপ হয়ে যায়।

কিন্তু এখন তিনি দেবীর চিঠিটা পড়ছেন তারিয়ে তারিয়ে শিশুরা যেমন করে আইসক্রিম খায়। এখন তিনি দেশ কাল সমাজ কিংশুক বা অন্তু কারো ভাবনাই ভাবতে চান না। For a change উনি একটু, না একটু নয়, ভীষণই স্বার্থপর হয়ে উঠতে চান। জীবনের কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্বার্থপর না-হওয়াটা পরম মুর্খামি। এই কথাটা বুঝতে বড় বেশি সময় নিলেন এইচ. পি.।

মাননীয়েষু স্যার...,

চিঠিটা পড়তে আরম্ভ করলেন এইচ. পি. চ্যাটার্জি, মুরহুর আচ্ছুরাম কালকাফ্‌ফ-এর লাক্ষা কারখানার নির্জন গেস্ট হাউসে বসে। এখন বিরাট ল্যাঙ্কাশায়ার বয়লারটার একটানা নীচুগ্রামের আওয়াজ ছাড়া আর কোনো আওয়াজ নেই। চারদিকে সুষুপ্তি। কারখানার হাতার মধ্যে বিরাট বিরাট সব গাছ, কোনোটাতে এখন ফুল আছে, কোনোটাতে শরতে বা বসন্তে আসবে। গাছগুলো চেনেন না এইচ. পি. কিন্তু তারা যে প্রহরীর মতো তাঁকে এই নির্জনে পাহারা দিচ্ছে তা তিনি বুঝতে পারছেন। এক একটি বড় গাছ সব দেখে, সব বোঝে, ভালবাসে। এই কথা সারাঙ্গাতে না এলে এ জীবনে অজানাই থাকত এইচ. পি-র কাছে।

১২

সোহনলালবাবু বলেছিলেন, রাঁচীতে গরম গরম খেয়ে ওঁদের বাড়ি থেকে রওয়ানা হতে। অবাঙালি ব্যবসায়ীরা যে ব্যবসাতে কেন এত সফল তা তাঁদের স্ত্রী, পরিবার এবং রান্নাঘর দেখলেই বোঝা যায়। এটা বানানো কথা নয়। যাঁরা লক্ষ্য করে দেখেছেন তাঁরা সকলেই জানেন।

মুর্‌হু থেকে চান টান করেই বেরিয়েছিলেন। রাঁচীর বাড়ি 'বৃন্দাবনে' পৌঁছতেই কুকু ও রেশমী, বাব্বী ও বিন্দু এসে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল। ছোট ছেলে গুল্লু আর তার স্ত্রী তখন ছিল না। রেশমীর বাবা রাজা সাহেব ছিলেন এন. সি. ডি. সি.-র ম্যানেজিং ডিরেক্টর। আর বিন্দুদের পারিবারিক ব্যবসা ছিল কয়লাখনির। জাতীয়করণ হয়ে যাবার পরেও তাঁরা কয়লার ব্যবসাই করেন। সোহনলালবাবুর স্ত্রী কৃষ্ণা দেবী বসার ঘরে এসে আপ্যায়ন করলেন। নাতি ও নাতনিরাও সবাই পড়া ছেড়ে প্রণাম করতে এল। এই সব ট্র্যাডিশন শিশুকাল থেকেই গড়ে ওঠে ওদের মধ্যে। বাঙালিদেরও অনেক সব সুন্দর ট্রাডিশান ছিল কিন্তু এইচ. পি.-র মনে হয়, অকারণ ঔদ্ধত্য ও অজ্ঞতা ও বুলি কপচানো রাজনীতিই সব কিছু Rituals-এর গভীরতা ও সৌন্দর্যকে শেষ করে দিল।

ওঁরা শুনলেন না। খাবেন না যখন তখন তিনটি হট কেস-এ গরম খাবার দেওয়া হল। ফ্লাস্কে গরম দুধ। এইচ. পি. হেসে বললেন, জার্সি গরুর দুধ কি বাঙালির পেটে সইবে? তা'ছাড়া, রাতে দুধ খাই না আমি। হুইস্কি খাই।

কুকু বলল, সোডা ফ্রিজে রাখা আছে বের করি নি। গাড়িতে বসার সময়ে বের করব, যাতে ঠাণ্ডা থাকে। তারপর জিজ্ঞেস করল আঙ্কল জী, হুইস্কি ত হ্যায় না? নেহি ত আভিভি ফোন করবে মাঙ্গা লেতা হুঁ-সিধা স্টেশন মে পৌঁছ যায়েগা ব্ল্যাক ডগ।

নেহি নেহি বেটা, সব কুছ হ্যায়। ফিক্কর মত, করো।

কুকুর খিদমদগারি দেখলে কেউ বিশ্বাস করবে না সে স্টেটস্‌এ পনেরো বছর ছিল এবং ফিজিক্স পড়িয়েছে তার মধ্যে পাঁচ বছর। এই বিনয়ই বাঙালি ছেলেদের শেখার ছিল ওদের কাছে।

সবাই'র কাছে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন এইচ. পি.। সঙ্গে দুই ছেলে চলল তাঁকে ট্রেনে উঠিয়ে দিতে। আসবার সময়ে ওদের সকলের আন্তরিকতা ও ভালবাসাতে একা-থাকা ব্যাচেলর এইচ. পি.-র মন দ্রব হয়ে উঠল।

দুপুরে ইন্দ্রজিৎ আর সুমিতার সঙ্গে কথা হয়েছিল। ওঁরাও স্টেশনে আসবেন বলেছিলেন, এইচ. পি. মানা করেছিলেন। অনেক কথাই হয়েছিল কিন্তু সঙ্কোচে

জিজ্ঞেস করতে পারলেন না যে দেবী ফিরে গেছে কি না, না কি সারাঙ্গাতেই আছে? না ফিরে গিয়ে থাকলে, কবে যাবে? সঙ্কোচটা কেন যে হলো তা নিজেই বুঝতে পারলেন না। কিন্তু সঙ্কোচই হলো না, সঙ্কোচটা লজ্জা হয়ে তাঁকে পীড়িতও করল। তবে এই পীড়াতে কোনো জ্বালা ছিল না, একধরনের আনন্দ ছিল। ঠিক এই ধরনের সঙ্কোচ ও লজ্জার শরিক উনি বহু বছর হন নি।

ওরা একটা রিসেপশনে যাবে স্ত্রীদের নিয়ে, ছোটভাই গুল্লুর শ্বশুরবাড়ির কারো বিয়েতে, ঐ কারণেই গুল্লু ছিল না বাড়িতে, তাই এইচ. পি.-র ব্যাগ দুটি এবং তিনটি হট কেস এনে দিয়ে আবার প্রণাম করে বলল, গাড়ি ছাড়তে দশ মিনিট দেরি আছে। আমরা কি যেতে পারি আঙ্কলজী? আপনার ঠাণ্ডা সোডা ও জল সব কোচ অ্যাটেনড্যান্টকে দিয়ে দিয়েছি। আর এই রাখুন আপনার টিকিট।

কুকু বলল, আপনার সঙ্গে যিনি এসেছিলেন, উনি যাবেন না? ওঁর টিকিটও তো কাটা হয়েছে। আপনার আসার টিকিট তো আমার কাছেই রেখে দিয়েছিলাম সেই জন্যেই, যখন এলেন তখন গেটে দিই নি চেকারকে।

এইচ. পি. বললেন, খুব অন্যায় হয়ে গেছে আমার। তোমাদের বলে দেওয়া উচিত ছিল। এখন ফেরত দিলে ত এক পয়সাও ফেরত হবে না। সরি।

যাকগে। ভালই হল। খেয়ে দেয়ে দরজা লক করে শুয়ে পড়তে পারবেন। মুড়িতে বা টাটাতে কেউ ঝামেলা করতে পারবে না এসে। চলি আমরা। নমস্তে আঙ্কলজী।

এইচ. পি. ওদের মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। সময়ে বিয়ে করলে ওঁরও এইরকম ছেলেরা ও বৌমারা থাকতে পারত। কিন্তু থাকলেও তারা এতো ভাল ও বিনয়ী কি হতো? কলকাতার সংস্কৃতি থেকে বিনয়, সহবৎ সব উধাও হয়ে গেছে। কিংশুক আর অস্তুদের শহর এখন ওটি।

ওরা চলে গেলে যখন একা হয়ে গেলেন তখনই দেবীর কথা মনে হল তাঁর। কবে ফিরে গেল কে জানে মেয়েটা। গেলেও হয়ত নন-এসি থ্রি টিয়ারে যাবে গুঁতোগুঁতি করে। ওর মতো মেয়ের অত কষ্ট করা ঠিক নয়। জঙ্গলে কষ্ট করে, ঠিক আছে। কিন্তু হৃদয়হীন শহরের পথে-ঘাটে, ট্রেনে-বাসে ঝুলোঝুলি করাটা ওকে মানায় না। সাদা সীট কভার লাগানো একটি সাদা রঙা ওপেল-করসা গাড়ি থাকা উচিত ছিল ওর। সাদা উর্দি পরা ওয়েল-ম্যানারড স্মার্ট এক জন ড্রাইভার। ওর ওঠা-নামার সময়ে যে দরজা খুলে ওকে ওঠাবে এবং নামাবে।

ভাবনা শেষ হবার আগেই অ্যাটেন্ড্যান্ট এসে বললেন, স্যার, সোডা কখন লাগবে বেল টিপে জানাবেন, আর এম. এস. ডি. ভট্টাচার্জি যাবেন কি? সময়ত আর মাত্র পাঁচ মিনিট আছে।

হয়ত কাজে আটকে গেছেন কিন্তু উনি না আসতে পারলেও পয়সা দিয়ে টিকিট যখন কাটা হয়েছে তখন অন্য কারোকে ক্যুপেতে ঢোকাবেন না। খাওয়ার পরে আমি লক করে শুয়ে পড়ব।

ঠিক আছে স্যার।

আচ্ছা একটা সোডা আর একটা গ্লাস দিয়েই যান।

এখুনি আনছি।

সোডা ও গ্লাস দিয়ে যেতেই ব্রিফকেস-খুলে টিচার্স-এর বোতলটা বের করে একটা হুইস্কি ঢেলে নিয়ে সোডা ভরে নিলেন। অ্যাটেন্ড্যান্ট দরজাটা টেনেই দিয়ে গেছিলেন। কোচটা ফাঁকাই। ভিড় নেই তেমন। এ সি কোচ-এর জানালা দিয়ে রাতের বেলা কিছুই দেখা যায় না। বড় অস্বস্তি লাগে। বাইরে থেকে ভিতরেও কিছু দেখা যায় না। পর্দাগুলো টেনে দিলেন উঠে। ওয়াশ বেসিনের ওপরের আয়নাতে তাঁর মুখটাকে দেখা গেল। একেবারে সান-ট্যানড হয়ে গেছেন। চেনা যায় না। টাকটা যেন আরও বড় হয়েছে। নাঃ সামনে ও জুলপিতে রূপোলি চুল ঝিলিক মারছে। তা মারুক। কলপ করাতে তাঁর রুচি নেই। কলপ করা মানুষদের মধ্যে কারো কারোকে উনি জানেন। সে মানুষগুলো কপট এবং ভণ্ড। তা বলে সবাইই কি তেমন? তা নিশ্চয়ই নন।

গ্লাসে একটা চুমুক দিলেন। ভাবছিলেন, দেবী যদি ওঁর সঙ্গেই ফিরত, বেশ হতো। অনেক কথা ছিল তাঁর ওর সঙ্গে। যা হবার নয় তা হবার নয়। একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল এইচ. পি.-র। আবার সেই গানটা নিশির মতো তাঁকে ডাকল। মাথার মধ্যে গুঞ্জন তুললো। "আমার বেলা যে যায়, সাঁঝবেলাতে তোমার সুরে সুরে সুর মেলাতে।"

এমন সময়ে দরজাতে কেউ নক করল। সম্ভবত টিকিট-চেকার। ওপাশ থেকে কোচ অ্যাটেড্যান্ট-এর গলা শোনা গেল, স্যার!

ইয়েস। কাম ইন। বললেন, এইচ. পি.।

দরজাটা খুলে গেল। অ্যাটেন্ড্যান্ট বললেন, উনি এসে গেছেন স্যার। আর দু'মিনিট দেরি হলে ট্রেন ফেইল করতেন।

এইচ. পি. উঠে দাঁড়ালেন।

দেবী হেসে বলল, আমি এসেছি।

ভাল। আসবে যে সেটা একটু জানিয়ে আশ্বস্ত করলে ভাল হতো না কি?

আসতে যে পারব তার কোনো ঠিক ছিল না। তারপর মন বলল, হয়ত আপনি ফেরার টিকিটও এক সঙ্গেই কেটেছেন। হয়ত না এলে আপনি দুঃখ পাবেন। কি করে যে এসেছি তা আমিই জানি। মুসলিম দাদা তার প্রিহিস্টরিক মোটর সাইকেলে বসিয়ে চান্দোয়া-টোড়িতে পৌঁছে দিল, সেখান থেকে চাতরা থেকে রাঁচী যাওয়া একটা বাস ধরে রাতু রোড-এর বাস স্টপেজ। সেখান থেকে সাইকেল রিকশা করে স্টেশনে। রিজার্ভেশন চার্ট-এ দেখলাম আপনার নাম তো আছেই আমার নামও আছে। তাই উঠে এলাম।

যদি নাম না থাকত, কি করতে?

আনরিজার্ভড সেকেন্ড ক্লাসে চড়ে যেতাম।

বসার জায়গা না পেলে?

দাঁড়িয়ে যেতাম। কতবার গেছি এসেছি। বই পড়তে পড়তে রাত কাবার করে

দিতাম। কত মানুষই তো ওমনি করেই যান, আমার চেয়ে অনেক বিদ্বান, বুদ্ধিমান সব মানুষ।

তারপরই বলল, বাথরুম থেকে একটু পরিষ্কার হয়ে আসি। আজ সারাদিন যা গেছে। দুপুরেও খাওয়া হয় নি। আমাদের কেঁচো কম্পোস্ট-এর পিট-এ একটি মেয়েকে কিং-কোবরাতে কামড়ে দিল।

কী সাংঘাতিক! তারপর?

তারপর কি? বাঁধন দিয়ে মুসলিমদার মোটরসাইকেলের পেছনে তাকে ধরে বসে জঙ্গলের শর্টকার্ট দিয়ে লাতেহারে হাসপাতালে। তাও আবার ইনজেকশন ছিল না। অনেক খোঁজাখুঁজির পর একটা বেরল...।

মেয়েটি বেঁচেছে ত?

তা বেঁচেছে। মেয়ের জাত। কপালে আরও কত কষ্ট আছে সারা জীবন, অত সহজে কি পার পাবে? তবে কষ্টর এখনও শুরুই হয় নি।

মানে?

মানে বিয়ে হয় নি এখনও।

ওঃ।

বললেন, এইচ. পি.।

স্যার, ফারস্ট এ সি-তেও খাওয়ার দেয় না? কি খিদে যে পেয়েছে। অন্য ক্লাসে দেয় না। জানি।

নাঃ। কিন্তু তুমি অভুক্ত থাকবে জেনেই সোহনলালবাবুর স্ত্রী তোমার জন্যে সব গরম খাবার দিয়ে দিয়েছেন। চার রকম আচারই আছে।

দেবী, বাচ্চা মেয়ের মতো জিভটাকে টাগরাতে ঠেকিয়ে টাক্ করে একটা শব্দ করল। তারপরই বলল, যাই।

যাচ্ছো কোথায়? তোয়ালে নিয়ে যাও। লিকুইড সোপ তো বাথরুমেই আছে। আর কেক চাও তো আমার সাবান নিয়ে যাও নতুন। ব্যবহার না-করা।

ব্যবহার করলেই বা কী! কিন্তু লাগবে না।

দেবী চলে গেলে এইচ. পি. বটম-আপ করলেন। আরেকটা হুইস্কি ঢাললেন, বড় করে। সোডা মেশালেন। তারপর মনে মনে বললেন, কিংশুক না অন্তু কে যেন বলেছিল, যারা গুনে গুনে হুইস্কি খায়, তারা মানুষ খুন করতে পারে, সুদের কারবার করতে পারে। ঠিকই বলেছিল হয়ত। আজ থেকে না-গুনে হুইস্কি খাবেন এইচ. পি.। কী খুশি যে লাগছিল তাঁর, তা বলার নয়। যেদিন লানডান-এর ওয়াটসন অ্যান্ড ওয়াটসন-এ জয়েন করেছিলেন গ্রে'জ ইনন থেকে ব্যরিস্টার হবার পরে সেদিন যেমন আনন্দ ও উত্তেজনা হয়েছিল আজ যেন ঠিক তেমনই হচ্ছে।

প্রায় মিনিট দশেক পরে ফিরল দেবী ঝকঝকে হয়ে। ক্যুপের আলোতে ওকে দেবীর মতোই দেখাচ্ছিল। শুধু দেবী ত নয়, দেবীশ্রী। মেয়েরা যে এক জন পুরুষের জীবনের সব শূন্যতা কী দীপ্তির সঙ্গে পূরণ করে তা দেবী শেষ মুহূর্তে ট্রেনে এসে ওঠাতে এইচ. পি. যেন প্রথম বার বুঝতে পারলেন।

দেবী বলল, স্যার, আপনাকে এবার বাস্তুহারা করব।

মানে?

মানে একটু বাইরে যেতে হবে। আমি চেঞ্জ করে নেব। শাড়ি টাড়ি ত আনি নি। যে সালোয়ার-কামিজ পরে এসেছিলাম সেটা আর পরার মতো নেই। সকাল থেকে পরে আছি জিনস্। যা ঘেমেছি না সারাটা দিন। মেয়েদের গরমে বড় কষ্ট। পুরুষেরা সেই কষ্টর কথা কখনও জানবেন না। কাল সকালে ত নাইটি পরে প্লাটফর্মে নামতে পারব না। এই জিনসই পরতে হবে। রাতটা তো কাটাই নাইটি পরে।

এইচ. পি. দ্বিতীয় হুইস্কিটাও শেষ করে বললেন, কতক্ষণ বাস্তুহারা করে রাখবে?

দু-তিন মিনিট। হয়ে গেলেই আমিই দরজা খুলে ডাকব আপনাকে।

বেশ।

বলে, এইচ. পি. দরজা খুলে বাইরে গেলেন কামরার। ভেতর থেকে দরজা লক করার আওয়াজ হলো।

যখন দরজা খুলে ভিতরে ডাকল তাঁকে দেবী তখন কামরাটা সুগন্ধে ম ম করছিল একটি হালকা-বেগুনি রঙা কটন-এর নাইটি পরে আছে দেবী। স্লিভলেস। বুকের, গলার ও ঘাড়ের কাছে লেস এর ফ্রিল দেওয়া।

বাঃ।

এইচ. পি. বললেন।

এটা গত বছরে পুজোর আগে পছন্দ করে কিনেছিলাম। এটা কি রং জানেন?

না। কি রঙ?

ফলসা। পড়েননি রবীন্দ্রনাথের কবিতা? "ফলসাবরণ শাড়িটি চরণ ঘিরে।"

তুমি ত সুন্দরই।

এইচ. পি. ভাবছিলেন, ভাবলেন। নাইটি ত বাইরের মানুষদের দেখাবার জন্যে নয়। স্বামীকে অবশ্য জন্মদিনের পোশাকই দেখায় দেবী এবং মানবীরাও।

মুখে বললেন, কথা পরে হবে। আগে খাও।

হ্যাঁ। খাব আজ খুব।

ক্যাসারোল খুলতেই খাঁটি ঘিয়ের রান্নার খুশবু ম ম করে উঠল দেবীর শরীরের সুগন্ধকে পাল্লা দিয়ে। দেবী নাক কুচকে ঠোঁটের একটা সুন্দর ভঙ্গী করে বলল উ ম্-ম্-ম্-ম্। ডিল্লীসাস্।

না খেয়েই?

ঘ্রাণেন অর্ধভোজনম্।

তুমি চুপ করে বোসো। অত ছটফট কোরো না। আমি পরিবেশন করছি, তুমি খাও।

বাবাঃ। এত আদর কি সইবে? আমার বাবা আমাকে এমন করেই খাওয়াতেন ছোটবেলাতে। ভুলেই গেছি এসব।

কেন মা খাওয়াতেন না?

নাঃ। আমার মা...।

নাও খাও পরোটা, দেখি তো, কি কি দিয়েছেন কৃষ্ণা ভাবী? এই যে, মুচমুচে পরোটা, উনি জানেন যে আমি মুচমুচে ভালবাসি, তাই, মটরশুঁটি আর আলুর তরকারি, বেগুন বাসন্তী, পটলের দোলমা। ভিতরে কি সব দিয়েছে, কিসমিস বাদাম পেস্তা এসব। পনীর বাটার মশালা, ধোঁকার ডানলা, আলুবখরা আর আনারসের চাটনি, লেবু, আম, আমলকি আর লঙ্কার আচার। রাবড়ি। পেট ভরবে তো?

দেবী বলল, আপনার প্লেট কই? প্লেট তো একটাই দিয়েছে।

তুমি খেয়ে নাও, চামচ আর কাঁটা নাও, এই। তোমার খাওয়া হয়ে গেলে প্লেটটা ধুয়ে নেব আমি তারপর খাব। যা খাবার দিয়েছে তাতে চার জন খেতে পারে। তুমি শুরু করো, আমি ততক্ষণে আর একটা হুইস্কি খাই।

কটা হল?

এটা নিয়ে তিনটে।

চারটের বেশি খেতে দেব না আপনাকে।

এইচ. পি. চুপ করে রইলেন।

বললেন, নাও শুরু করো।

ভাবছিলেন আজ অবধি মা-বাবার মৃত্যুর পরে এমন শাসন করে কেউই তাঁর সঙ্গে কথা বলেন নি। তখন, শাসনকে অত্যাচার বলে মনে হতো। আজকে জীবনে অনেক দূর হেঁটে জীবনের সন্ধে বেলাতে এসেই বুঝলেন যে যেটাকে অত্যাচার মনে করেছিলেন সেটাই আসলে আদরের পরাকাষ্ঠা। স্তব্ধ হয়ে বসে হুইস্কিতে চুমুক দিলেন। সোডা কম হয়ে গেছে। বেলটা টিপলেন একবার অ্যাটেন্ড্যান্টকে সোডা আনতে বলবেন বলে। দেবী, সীটের উপরে জোড়াসনে বসে একটা তোয়ালে কোলে ছড়িয়ে কোলের ওপরে ডিশ নিয়ে ওর সুন্দর আঙুলে পরোটা ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে। ওর এই ঘরোয়া ফলসা রূপ অ্যাটেন্ড্যান্টও দেখবে এটা ওঁর পছন্দ হলো না। দুটি অনাবৃত সুডৌল উজ্জ্বল বাহু, সুগঠিত দুটি কবুতরী স্তন, যদিও নাইটিমোড়া। তবুও। না, উনি দরজা একটু খুলে দাঁড়িয়ে রইলেন, তারপর ঐভাবেই হাত বাড়িয়ে সোডাটা নিয়ে দরজা লক করে দিলেন।

দেবী কারণটা বুঝলো না। বলল, দারুণ রান্না। কী খিদে যে পেয়েছিল, এখন বুঝছি।

তারপর বলল, খাওয়া হয়ে গেলে আপনার মোবাইল ফোন থেকে ইন্দ্রজিৎদাই একটা ফোন করতে পারি?

নিশ্চয়ই! একটা কেন? দশটা করো।

না একটাই করব। মুসলিমদাদা চাঁদোয়া থেকে ফোন করে খবরটা দিয়েছে। কি বলতে কি বলেছে। আমি বললে আশ্বস্ত হবেন। আমি খেয়ে আপনাকে বেড়ে দেব। ডিশটা এই ওয়াশ বেসিনেই ধুতে পারব ত স্যার?

হ্যাঁ হ্যাঁ। তোমার নাইটি পরে বাইরে যেতে হবে না।

দেবী অবাক এবং একটু কৌতুকের চোখে এইচ. পি.-র মুখে চেয়ে রইল। ঠোঁটের কোণে এক চিলতে হাসি এসেই মিলিয়ে গেল।

ওর খাওয়ার পরে এইচ. পি.-কে ডিশ ধুতে দিল না কিছুতেই। তারপর এইচ. পি.-র কোলের উপরে তোয়ালেটা বিছিয়ে দিয়ে খাবার পরিবেশন করে খাওয়াতে লাগল। এইচ. পি. বললেন, ট্রেনে হার্ট অ্যাটাক হয়ে মারা গেলে কি ভাল হবে? এক জনকে সাপে কামড়াল আর আমাকে কি তোমার হাতেই মরতে হবে? রাতে আমি খুব কম খাই।

এটা তো কলকাতা নয়। আর আপনাকে খাওয়ায় তো বেয়ারা-বাবুর্চিরা নিশ্চয়ই। ইদ্রিস আলি না কি নাম বলেছিলেন। আমি তো আর ইদ্রিস আলি নই। আমি যা বলব সব শুনতে হবে। আমি তো আপনার চাকরি করি না স্যার যে চাকরি যাবার ভয়ে মরব।

আবারও স্তব্ধ হয়ে গেলেন এইচ. পি.। চাকরি খাবার ভয় যে করে না, যে তাঁকে অবহেলায় ধমক দেয়, তেমন একজন মানুষের ভারি অভাব ছিল তাঁর জীবনে। কী যে হবে তিনি জানেন না। কালকের ভোর তাঁর জীবনে কী যে বয়ে আনবে! বড়ই বিপদে পড়লেন তিনি জীবনের সন্ধ্যাকালে এসে।

খাওয়া দাওয়ার পরে দেবী ইন্দ্রজিৎ ও সুমিতার সঙ্গে কথা বলল। তারপর এইচ. পি.-ও বললেন। বললেন, কলকাতাতে গিয়ে ডাইরী দেখে পরের বার কবে আসছেন তা জানাব। ডোনেশন-এর ব্যাপারেও জানাব। ইট ওজ আ প্লেজার মীটিং উ বোথ।

ইন্দ্রজিৎ বললেন, পারলে মেয়েটাকে একটু দেখবেন চ্যাটার্জি সাহেব। বড় ভাল মেয়ে, গুণী মেয়ে, কিন্তু বড় দুঃখী মেয়ে।

থ্যাঙ্ক উ্য। নিশ্চয়ই। ডোন্ট ড্য ওয়ারি প্লিজ।

তারপর সোহনলালবাবুর স্ত্রী কৃষ্ণাজীকে একটা ফোন করে বললেন, ভাবীজী মেরী মাতাজীকি ইয়াদ আয়ি বহুত সাঁলো বাদ। সিরফ খানাহিতো নেহি ভেজি থী আপনে, পেয়্যার সে ডুবা হুয়ে থে বিলকুল। লিজিয়ে, মেরী কোম্পানি ক্যা বোলতি হ্যায় উ শুনিয়ে।

দেবী বলল, নমস্তে চাচীজী। অ্যায়সা খনা ত ম্যায় কওভি নেহি খায়িথী পহিলে।

কৃষ্ণা ভাবী বললেন, কলকাত্তাসে যব্‌ভি আওগে, জরুর আও বেটি মেরী ঘর পর। মুরহুমে ভি আও।

মুর্‌হুই ঠিক রহেগা। মেরী কাম কে লিয়ে ত হামারি খুঁটি, তামার, বুণ্ডু, তাজনা ইয়ে সব জাগে মে যনাহি পড়তি হ্যায়।

তব ঔর ক্যা, আ যাও। আপনাহি ঘর শোচো। যব দিল করতি তব আ যাও।

দেবী বলল, কটা হল? স্যার? এইটা নিয়ে চারটে হবে।

ব্যস। এবার ঘুম। আমারও সত্যি ভীষণই ঘুম পেয়েছে। কিন্তু বললেন না তো কেমন বেড়ালেন? কলকাতায় ফিরে আপনাকে একটা 'সাসানডিরি' উপন্যাস কিনে

দেব। ঐসব অঞ্চলের পটভূমিতে লেখা। আমার দারুণ প্রিয় বই। কত যে গান আছে বইটিতে মুণ্ডাদের! মুণ্ডা মিথোলজি। একটি ঠাসবুনোন প্রেমের কাহিনীর মধ্যে মধ্যে এসবই বুনে দিয়েছেন লেখক।

দিও। ঐসব গানের একটা শোনাও না।

এসব তো নেচে নেচে গাইবার গান।

নেচেই গাও। আমি ছাড়া আর কে দেখবে?

দুষ্টুমিভরা হাসি হেসে দেবী বলল, আসলে আমি এতো ভাল গাই আর নাচি যে শুধুমাত্র এক জনকে দেখানো, Waste of talent।

এইচ. পি. হাসলেন। দেবীর সেন্স অফ হিউমারে প্রীত হলেন।

দেবী উঠল। তারপর হাত দু'টি মাথার পেছনে নিয়ে সামনে ঝুঁকে গান ধরল নিচু গলাতে।

"সোনালেকান দিশুম তাবু, রূপালেকান গামায় তাবু
ছোটোনাগাপুরেহো, মুণ্ডাতুয়া হুড়ুম্‌সুকুরাসি, লিঙ্গিজোরতানা...
জোমতানকে জোমতানা নুতানকে নুতানা,
ছোটানাগাপুরেহো, মুণ্ডাতুয়া হুড়ুম্‌সুকুরাসি লিঙ্গিজোরতানা..
আদা কানতো দানাকোয়াবু মিসিহানকো খোজার খোয়াবু
ছোটানাগাপুরেহো, মুকুতুয়া হুড়ুমসুকুরাসি লিঙ্গিজোরতানা..

মুগ্ধ হয়ে চেয়ে রইলেন ফলসা-রঙ নাইটি-পরা গান-গাওয়া আর নৃত্যরতা দেবী'র দিকে। একটি অল্প বয়সী জ্যাকারান্ডা গাছ যেন বেগুনি ফুলের পসরা নিয়ে চৈত্র পবনে দুলে দুলে গান গাইছে।

গান ও নাচ থামিয়ে দেবী বলল, উফফ্। ভর পেট খেয়ে এমন কোমর ঝুঁকিয়ে কি নাচা যায়?

তা ঠিক। ভরপেট খাওয়ার পরে....

স্বগতোক্তির মতো বললেন এইচ. পি.।

এবারে তা'হলে ঘুম?

তুমি যা বলবে। বিষাদমগ্ন গলাতে বললেন এইচ. পি.।

তারপর একটু দ্বিধা ভরে বললেন, তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা ছিল।

হবে। কাল তো রবিবার। আপনি তো কোর্টে যাবেন না। আমি তো আপনার সঙ্গে আপনার বাড়িতেই যাব। বলবেন কথা সারা দিন ধরে।

রাতে কোথায় যাবে? তোমার মায়ের কাছে?

কোথাওই যাব না। মায়ের কাছে যাব, তবে পরে। কাল থেকে আমি আপনার সঙ্গেই থাকব। আপত্তি আছে কি আপনার?

আমার...মানে....

এইচ. পি. কিছুই না বলতে পেরে থেমে গেলেন।

তুমি তো ওপরে উঠবে। দাঁড়াও সিঁড়িটা লাগিয়ে দিই।

না স্যার। উপরে উঠব না। আমি আপনার হাতে মাথা দিয়ে শোব আজ রাতে,

আপনার পাশে। আমার বাবার হাতে যেমন শুতাম মাথা দিয়ে। আপনি আপত্তি করবেন?

এইচ. পি. কোনো কথা বললেন না।

শুয়ে পড়ুন স্যার। আপনি শুলে তবে না আমি পাশে শোব। ভীষণই ক্লান্ত আমি।

কোন হাতের উপর মাথা দিয়ে শোবে?

আপনি যে হাত বাড়িয়ে দেবেন স্যার।

ডান হাতের উপরে শোও।

ঠিক আছে। আপনি শোন আগে।

তারপর বলল, আলো কি সব নিভিয়ে দেব স্যার?

সব নিভিয়ে দাও। তুমি তো আলো করে রইলেই আমার পাশে। অন্য আলোর কি দরকার?

শব্দ না করে হাসল, দেবী।

আলো সব নিভিয়ে দিয়ে সাদা পাযজামা-পাঞ্জাবী পরা এইচ. পি-র ডান হাতে মাথা দিয়ে শুয়ে পড়ল দেবী। তার চুল তখনও ভিজে ছিল। এইচ. পি.-র হাতটি দেবীর সুগন্ধি চুলে ভিজে গেল।

এইচ. পি. বললেন, তুমি কি ডিসিশান নিয়ে ফেলেছ?

হ্যাঁ।

কেন? এই ধুমসো-ফ্যাটসোর মধ্যে কী দেখলে তুমি।

খুব নিচু কিন্তু গাঢ় স্বরে দেবী বলল, একজন পুরুষের মধ্যে মেয়েরা যা দেখে। মেধা, অর্থ, সাফল্য, ভালত্ব এবং যশই মেয়েদের কাছে সবচেয়ে বড় পৌরুষ, বিশেষ করে সে সব স্বোপার্জিত যদি হয়, চালাকির দ্বারা না-পাওয়া হয়। শরীরটা যদি এতই দামী হত তবে মেয়েরা পুরুষদের বিয়ে না করে ঘোড়াদের বা ষাঁড়দেরই বিয়ে করত। অনেকে তা করেও অবশ্য।

আর কিছু বলবে?

এইচ. পি.-র হাতের ওপরে পাশ ফিরে তাঁর গালের সঙ্গে গাল লাগিয়ে দেবী ফিসফিস করে বলল, আপনার কাছে থাকলে আমি নিরাপদ এবং নিশ্চিন্ত বোধ করব। আপনি আমাকে ফেলে দেবেন না তো স্যার?

না। কোনো দিনও না।

আমাকে একটা গাবলু-গুবলু ছেলে দেবেন?

এইচ. পি.-র গলা ধরে এল। অনেকক্ষণ কথা বলতে পারলেন না। তারপরে ফিসফিস করে, প্রায় স্বগতোক্তি করার মতো করেই উনি বললেন, দেব।

দেবী বলল, সন্ধেবেলাতে দাড়ি কামাননি বুঝি স্যার? আমার গাল জ্বালা করছে। প্রত্যেক দিন দু'বেলাই দাড়ি কামাতে হবে কিন্তু।

এইচ. পি. দেবীকে জড়িয়ে ধরলেন। মুখে কিছুই বললেন না। চলন্ত ট্রেনের

অন্ধকার কামরাতে শায়ীন একজন প্রাগৈতিহাসিক পুরুষের দু'চোখে নিঃশব্দে আনন্দাশ্রু বইতে লাগল।

বিন্দাআস

॥ ১ ॥

কানহারি হিল রোডের পাণ্ডেবাবুর বাড়ি 'দ্যা জ্যাকারান্ডা' থেকে যখন বেরোল সুঘরাই সাইকেলটা হাতে করে ঠেলতে ঠেলতে, তখন রাত প্রায় দুটো।

হাজারিবাগ শহরের এ দিকটা বিশেষ নির্জন। কানহারি পাহাড়ে সবরকম জানোয়ারই আছে। লোকে যদিও বলে, বড় বাঘ নেই। কিন্তু চিতা বহত আছে। একবার এক খতরনাক চিতার সামনে পড়েছিল সন্ধেরাতে। ভাগ্যিস তার নাক খেয়ে নেয়নি। চিতারা নাকি বহতই খতরনাক হয়। কে জানে। হয়তো নাক খেতে ভালবাসে বলেই ওরা খতরনাক। ওর বন্ধু গিরধারী বলে।

ঠাণ্ডাটাও পড়েছে তেমনই এ বছর জব্বর। যাদের বউ নেই বা মোটা লেপ, তাদেরই মুশকিল। এতক্ষণ গান চলছিল বলে রাম-এর পাঁইটটা বের করতে পারেনি খদ্দরের পাঞ্জাবির পকেট থেকে। পাণ্ডেবাবু মানী লোক। পয়সাওয়ালা, তার উপর বয়োজ্যেষ্ঠ। তবে এতক্ষণ মস্ত ড্রয়িং রুমে ঘরের মধ্যে বহত দামি দামি গরম জামা আর জামদানি শাল গায়ে চড়ানো স্ত্রী-পুরুষের গায়ের গরম, টাকার গরম ছিল, ঠাণ্ডা তেমন মালুমও হয়নি। দুলারি বাইয়ের দরবারি কানাড়া শুনতে শুনতে এতক্ষণ শরীরের আর কোনও বোধই ছিল না, কোনওরকম দুঃখ-কষ্ট বোধই। শ্রবণসুখই এতক্ষণ একমাত্র ইন্দ্রিয় হয়ে অন্য সমস্ত ইন্দ্রিয়কে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। কালটা শীত না গ্রীষ্ম না বর্ষা, সময়টা মধ্য-দুপুর না মধ্য-রাত্রি সে-সবের কোনও বোধই ছিল না সুঘরাইয়ের এতক্ষণ। গান শুনে সে একেবারে মস্ত্ হয়ে গেছে। মেয়েরা গর্ভবতী হলে যেমন মস্ত্ মনে করে নিজেদের। সার্থক, সেও দুলারি বাইয়ের গান শুনে তেমনই সার্থক মনে করছে নিজেকে। এ-জীবনে আর কোনও কিছু না পেলেও চলবে। এই মুহূর্তটির জন্যেই যেন সে এতদিন বেঁচে ছিল। এ যাবৎ গান বহতই শুনেছে। গান, মানুষকে অনেক কিছু দেয় বলেই জানত এতদিন কিন্তু গান যে এমন করে সব নেয়ও সেটা সুঘরাই জানত না। তাকে নাঙ্গা ফকির করে দিয়েছে একেবারে। দিওয়ানা করে দিয়েছে। দুলারি বাই তার গানকে বুঝি আজ সদ্‌কা করে দিয়ে দিয়েছে শ্রোতাদের। বিশেষ করে সুঘরাইকে। সেই দান ফিরিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা সেই গায়িকার নিজেরও আর নেই।

গান তো শিশুকাল থেকে বেনারসের ডাল-কা-মন্ডি, মির্জাপুরের বাইজি-মহল্লা, লখনউয়ের তওয়াফদের মুখে কতই শুনেছে, গয়া আর পটনার বিভিন্ন ম্যাহ্‌ফিলে বাঘ-সিংহ পুরুষ গায়কদের মুখেও শুনেছে। মির্জাপুরে যখন ছিল মামাবাড়িতে স্কুলে পড়ার সময়ে, তখন ওর মামাতো দাদার সঙ্গে লুকিয়ে বাইজি মহল্লাতে যেত। শুধু

গান শুনতেই যেত। সেই থেকেই গানের সঙ্গে ওর জীবন জড়িয়ে গেছে।

কাজের মানুষ যাকে বলে, তা আর হওয়া হল না এ জীবনে। ওই গানেরই জন্যে কাজের মানুষ হওয়া হল না, আবার ওই গানেরই জন্যে মানুষ হল।

'মানুষ' সংজ্ঞাটির মানে যে সকলের কাছে এক নয়।

উস্তাদ বড়ে গোলাম আলি খাঁ, উস্তাদ আমির খাঁ সাহেব, পণ্ডিত ভীমসেন যোশীর মুখেও ভোপালে ও ইন্দোরে একাধিকবার শুনেছে গান কিন্তু ঠিক এমনটি আর কার মুখেই শোনেনি। সত্যি কথা বলতে কি ওর ধারণা হয়ে গেছিল যে, দরবারি বুঝি পুরুষ গায়কেরাই গান, ও রাগ শুধু তাদের গলাতেই মানায়। আজকে সে ধারণা তার ভেঙে গেছে।

শুধু মস্তই হয়নি, এই গায়িকার প্রেমেই পড়ে গেছে সুঘরাই। সাচমুচ্। ইংরেজিতে যাকে বলে "হেড ওভার হিল্স।" মনে মনে ঠিক করেছে যে, বাকি জীবন সে এই দুবলি-পাতলি মিষ্টি নারীর ফাই-ফরমাশ খাটবে—সে নারী সুঘরাইকে চাক আর না-ই চাক, ওই নারীর খিদমদ্গারি করেই কাটিয়ে দেবে বাকি জীবন। বান্দা হয়ে থাকবে। শুধু একটু কাছাকাছি থাকতে চায়, গান শুনতে চায় তার, আর তার ওই সুন্দর সুর্মা-চর্চিত বিষাদময় চোখ দুটির একটু প্রশ্রয় পেতে চায়।

যাকে এত গুণ দিলেন বিধাতা তাকে কোন আক্কেলে এমন স্নিগ্ধ রূপও দিলেন তা সেই বেআক্কেলেই জানেন। এর আগে অনেকই সুন্দরী গানেওয়ালি দেখেছে সুঘরাই কিন্তু তাদের সেই সৌন্দর্য বড় উগ্র। জ্বালাধরা তাদের রূপ। এমন স্নিগ্ধ শ্যামা রূপ এর আগে সম্ভবত আর কোনও গায়িকার দেখেনি। তা ছাড়া .....।

না থাক।

তা ছাড়া, এই মুখটিকে বড় চেনা চেনা মনে হয়েছে সুঘরাইয়ের। কোথায় যেন দেখেছে। স্বপ্নে দেখেছে কি?

উষ্ণ আরামে গানের আতরগন্ধি বাতাবরণের মধ্যে বাবু হয়ে বসেছিল এতক্ষণ সুঘরাই। 'দ্যা জ্যাকারান্ডা' বাংলোর বাইরে আসতেই কর্কশ বেসুরো পৃথিবীর খপ্পরে এসে পড়ল। শীতটা তার কান পাকড়ে নিঃশব্দে থাপ্পড়ের পর থাপ্পড় মারতে লাগল। সাইকেলটাও একেবারে বরফ হয়ে রয়েছে। শিশিরে ভিজেও গেছে চুপচুপে হয়ে। সেটাকে দঙ্গল থেকে তুলে নিয়ে একটা জ্যাকারান্ডা গাছে তাড়াতাড়ি হেলান দিয়ে দাঁড় করিয়ে রেখে ওল্ড মংক রাম-এর পাঁইটটা পাঞ্জাবির পকেট থেকে বের করে ঢকঢক করে তিন-চার ঢোক মেরে দিল সুঘরাই। তারপর সাইকেলের হ্যান্ডেল দুটোর কান পাকড়ে, নিজের কান দুটো মাফলারে ঢেকে নিয়ে যখন প্যাডল-এ পা রাখল ঠিক তখনই ঠিক মির্জাপুরী মামাতো দাদা পরজের একটি প্রিয় শের মনে পড়ে গেল সুঘরাইয়ের—'দিল টুটনেসে থোড়িসি তকলিফ তো হুই লেকিন তামাম উমর কা আরাম মিল গ্যয়া।'

শেরটি কার লেখা এতদিন পরে আর মনে নেই। তারপরই উঠে পড়ল সে সাইকেলে। উঠতেই, পেছনটা যেন জমে গেল। সাড় চলে গেল। প্যাডল-এ চাপ দিল পা দিয়ে। যাবে মগমা। এই শীতের মাঝরাতেও ডি. ভি. সি-র মোড়ে চমনের

বন্ধ হয়ে-যাওয়া হোটেলের সামনের আগুন ঘিরে শুয়ে-থাকা কুত্তার দল তার সাইকেলের পেছন পেছন কেঁউ কেঁউ করতে করতে আসবে। তাড়া করে যাবে ওকে প্রায় কাছারির মোড় অবধি। এন্থু আছে বটে ওই শালা কুত্তাদের।

গত বছরে এক হারামি কামড়েও দিয়েছিল ওর বাঁ পায়ে। প্রায়ই দাঁত কিড়মিড় করতে করতে ওই সময়ে ও ভাবে যে, একদিন বিষ-মাখানো লাড্ডু খাইয়ে ওই কুত্তার গুষ্টিই নাশই করে দেবে সুঘরাই। কিন্তু রাত পোহালেই আর মনে থাকে না। নিজেকে বলে, আহা। কেষ্টর জীব। প্রাণ নিয়ে আর কী হবে! সকলেই বাঁচুক। সুঘরাইও বাঁচুক, কুত্তারাও বাঁচুক।

কিছুটা যেতেই পেছন থেকে একটা গাড়ির জোরালো হেডলাইটের আলো এসে পড়ল তার গায়ে। শুক্লপক্ষের রাত। অষ্টমী নবমী হবে। তা ছাড়া গাড়িটা তখনও বেশ দূরেও ছিল কিন্তু তার হেডলাইটটা বড়লোকের মোসাহেবের মতো গাড়ির আগে আগে প্যায়েরভি করতে করতে নিঃশব্দে এসে হঠাৎই সুঘরাই-এর দু পায়ের মধ্যে ঢুকে গিয়ে তার আর তার সাইকেলটার কিম্ভূতকিমাকার ছায়া নিয়ে ভূতের নৃত্য করতে লাগল বৃত্তাকারে, ধুলো-মাখা, হিমে-ভেজা, পথের ধুলোর উপরে, তার সামনে সামনে। রাস্তা মসৃণ না হলে এবং শুক্লপক্ষের রাত না হলে এই ছায়াবাজির কারণে সাইকেলসুদ্ধ ও পড়েও যেতে পারত পথের উপরে। এ পথে এত রাতে তো কোনও গাড়িরই যাবার কথা নয়। তবে কি গানের ম্যাহ্ফিলেরই কেউ? অধিকাংশ শ্রোতারাই তো কাছাকাছি এলাকারই মানুষ এবং সাইকেলেরই আরোহী। অনেকের অবশ্য প্রাইভেট সাইকেল রিকশা আছে। কেউ এসেছে স্কুটার বা বাইকে। গাড়িওলাও ছিলেন জনা চার-পাঁচ। তাঁরা কেউই এখনও বাইরে আসেননি। জানে না, হয়তো বিরিয়ানি-টিরিয়ানির বন্দোবস্ত আছে পাণ্ডে সাহেবের বাড়ির বিশিষ্ট অতিথিদের জন্য। বিশিষ্ট মানে, বড়লোক। তবে সুঘরাইকে খেয়ে যেতে বলেননি পাণ্ডেবাবু। ও যখন বাড়িমুখো তখনও গাড়িওলা শ্রোতারা হয়তো ভিতরেই ছিলেন। গাড়ি চালাতে সুঘরাইও জানে। বাবাতো গাড়িতেই চড়তেন। এখনও গ্যাবাজে একটি অস্টিন টেন আছে। কিন্তু সুঘরাই সাইকেলই চড়ে আজকাল।

রোড কনস্ট্রাকশনের কাজ করে গত পনেরো বছরে কোটিপতি হয়ে গেছে পাণ্ডেজি। আগে মালব্য চওক এ একটা সিঙাড়া-জিলিপির দোকান ছিল। তবে ভাল চলত। দিন রাত সিঙাড়া-জিলিপি ভাজা হত। তারপর পি ডাব্লু ডির এঞ্জিনিয়র, চিফ এঞ্জিনিয়র আর মিনিস্টারকে ধরে বরাত খুলে গেল। আজকাল তো/'দিবে আর নিবে মিলাবে মিলিবে যাবে না ফিরে এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে।' রভিন্দর নাথই তো বলে গেছিলেন। সে কথা বর্ণে বর্ণে সত্য হল আজকে। এখন শত্রুঘ্ন পাণ্ডের দুটো জিপ, একটা কালিস, হারহাতের কাছে বাগানবাড়ি, বানাদাগে খেতিজমিন। তা'কে দেখে কে!

হারহাতে তার রক্ষিতা বউ থাকে। ধরবাবুর এম এ পাশ বড়া লেড়কি। ধরবাবুকে মাসে দশ করে দেয়। শালা কামিনা আছে। মেয়ের শরীর ভাঙানো রোজগারে ফুটানি মারে। ছ্যাঃ।

পইসাই যখন হল তখন একটু পাওয়ারও তো চাই। এবারে মিউনিসিপালিটির ইলেকশনে দাঁড়িয়েছে পাণ্ডেবাবু। ক্ষমতাও যখন হচ্ছে তখন একটু আর্ট-কালচার ভি লাগবে তো। কী? লাগবে না?

বিলকুল। কমসে কম এক তবায়েফকি গানা তো হোনাই চাহিয়ে। উসহিকি ম্যাহ্‌ফিল থী আজ রাতমে। আর যাদের ডেকেছিল সব গিদ্ধড়, বেসুরো, বেকামকা আদমি। ওই সব মানুষের সঙ্গে এক ম্যাহ্‌ফিলে বসে গান শুনতে গা ঘিনঘিন করে সুঘরাইয়ের। কিন্তু ওই যে! পয়সা। ওদের জেব-এ যে বহতই পয়সা আছে। একজন কবিকে ভি ডেকেছিল। যাকে দেখে মনে হয় কসাই। গানের 'গ'ও বোঝে না। বেজায়গায় সম দেখাচ্ছিল, বেতালে চাঁটি মারছিল ফরাসে।

এবারে গাড়ির শব্দটাও শোনা যেতে লাগল পেছনের শিশির ভেজা কাঁচা পথটাতে। তারপর শব্দটা ক্রমশই জোর হতে লাগল। লাহিড়ি সাহেবের বাড়ির কাছে ও পৌঁছতেই গাড়িটা তাকে পাশ কাটিয়ে আলোর ফোয়ারা ছুটিয়ে সামনের ফিকে অন্ধকারকে কিছুক্ষণের জন্যে অন্ধকারতর করে দিয়ে চলে গেল। যে বড়লোকেরা আগে সাইকেল চালাত তারাই সাইকেলে-বসা মানুষদের আলো দিয়ে চোখ ধাঁধিয়ে দিয়ে পথে ফেলে আনন্দ পায়। অজীব সব ইনসান শালারা। গাড়িটার মিউজিক সিস্টেমে গাঁক গাঁক করে দুলারি বাইয়ের গাওয়া দরবারি কানাড়াই বাজছিল। নিশ্চয়ই ওই ম্যাহ্‌ফিলে বসেই টেপ করেছে। কাল সকালে নাস্তা করতে করতে শুনবে। গিধ্বর হয়তো ওইটুকুও জানে না দরবারি কখনকার রাগ।

অন্ধকারে গাড়িটা চেনা গেল না। তবে পেছনে নানা ঝিং-চ্যাক লাল নীল সবুজ হলুদ আলো দেখে মনে হল, গয়া রোডের অভিষেক সিংয়েরই হবে।

॥ ২ ॥

দারুণ কেয়ারি করা বাংলো। ধানবাদের কয়লা কিং অভিষেক সিংয়ের। আগেকার দিনে কয়লা-কিং বলতে বুঝাত খনির মালিকদের। আজকাল সব ঘুষের কারবারি খুনখারাবি-করা মাফিয়ারাই কিং। নানা ফুলের বাহার। মালী-বেয়ারা-বাবুর্চির টিপি। বছরে তিনবার আসে ধানবাদ থেকে ইয়ার-দোস্ত নিয়ে অভিষেক সিং। একবার গরমে, একবার শীতে, আরেকবার বর্ষাতে। খানা-পিনা-ফালানা-ঢামকানা চলে। শিকার করা কবেই বেআইনি হয়ে গেছে কিন্তু তবু চুরি করে সিমারিয়ার রাস্তাতে আর রাজডেরোয়াতে শিকার করে অভিষেক সিং আর তার দলবল। শিকার বলতে, মুরগি-ময়ূর-তিতির-বটের-খরগোশ এই সব। যা পায়, তাই মারে। ট্রিগার টেনে হাতের সুখ করে। বড়ই ট্রিগার হ্যাপি তারা। খুব বড় শিকার হলে কখনও কোটরা একটা। ওইটুকুই তার শিভালরি। পটনাতে চাণক্যপুরীর শ্বশুরবাড়িতে গেলে, রোমহর্ষক শিকারের গল্প করে। তবে খতরনাক জানোয়ারের ছায়া মাড়ায় না সে আর তার দলবল।

অবশ্য চিতা বা বড় বাঘ মেরে হজম করাও মুশকিল। শীতকাল হলে তিলাইয়ার বাঁধের জলে বিদেশ থেকে উড়ে-আসা বড় বড় নাকটা হাঁস মারে। সবই বেআইনি।

কিন্তু এখন এ দেশে যার পয়সা আছে আইন তো তার জেবেই বন্দি। বিহারের জমানাতে যা ছিল ঝাড়খণ্ডেও তাই। শুনতে পায়, পশ্চিমবঙ্গ বা বাংলাতেও নাকি তাই-ই। যথার্থই স্বাধীন হয়ে গেছে পুরো দেশই। তামাম দুনিয়া সেলাম ঠোকে সেই লোককেই যার পকেট-ভর্তি টাকা। অথবা যার হাতে ক্ষমতা। তার যা খুশি, তাই করে সে।

কয়েকবছর আগে সিন্দুর বস্তি থেকে ওই অভিষেক সিং পটকানের কাকা ভিখু কাহারের সুন্দরী মেয়েটাকে উঠিয়ে নিয়ে গিয়ে তিলাইয়ার বাংলোতে ইয়ার-দোস্তদের সঙ্গে নিয়ে রেপ করে তারপর রাজডেরোয়া ন্যাশানাল পার্কের পাঁচ নম্বর ওয়াচ-টাওয়ার থেকে নীচের জংলাকীর্ণ খাদে মেয়েটার নাঙ্গা শরীরটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চলে যায়। মেয়েটার নাম ছিল বুধিয়া। বুধবার জন্মেছিল বলে। শকুন লাশের উপরে পড়ে যাওয়াতে তার পরদিন দুপুরে এক ফরেস্ট গার্ডের নজরে আসে। লাশের হদিস হয়। ততক্ষণে সুন্দর শরীরটার কিছু বাকি ছিল না। শকুনেরা ঠুকরে ঠুকরে খেয়ে নিয়েছিল শবের সবই। ওপড়ানো-চোখ মাথাটা ছাড়া। আর কঙ্কালটা।

স্থানীয় মানুষেরা সকলেই অভিষেক সিংকেই সন্দেহ করেছিল কিন্তু কেউই কিছু বলল না বা করল না। সাক্ষী-প্রমাণেরও অভাব ছিল। বড়লোক বা গুণ্ডা-বদমাশদের রোষে পড়লে পুলিশ বা প্রশাসন তো বাঁচাতে আসবে না। ভারতের কোনও রাজ্যেই আসে না আজকাল। যা অবস্থা এখন তাতে মনে হয় ট্যাক্সো ফ্যাক্সো না দিয়ে নিজের নিজের মান-জান নিজেদেরই সামলাতে হবে। খামোখা নিজের বিপদ কে ডেকে আনতে চায়?

পটকানের কাকিমা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছিল কিছুদিন আর তার বাবা ভিখুর চোয়াল দুটো চিরদিনের মতো শক্ত হয়ে গেছিল। হাসতে ভুলে গেছিল ভিখু কাহার। তবু একজনও প্রতিবাদ করেনি। এ এক অজীব দেশ। অন্যকে বলে কী হবে। সুঘরাইও করেনি। সেও অজীব। নিজের গায়ে মাঝে মাঝেই থুথু দিতে ইচ্ছে করে।

হাজারিবাগ এবং ঝুমরি তিলাইয়ার থানা, বাংলোর চৌকিদার, ফরেস্ট ডিপার্টের গার্ড, রেঞ্জার সকলকেই টাকার থলি ঘুষ দিয়ে চুপ করিয়ে দিয়েছিল অভিষেক সিং।

নিমপাতা বা ট্যাপারি কি পানিফল সকলে নাও খেতে পারে কিন্তু ঘুষ আজকাল সকলেই খায়। ইংরেজিতে যাকে "STAPLE FOOD" বলে, মূল খাদ্য, ঘুষ এখন তাই হয়ে গেছে স্বাধীন ভারতে। বহত পড়ে-লিখে সব মানুষই, প্রফেসর, ডাক্তার, এঞ্জিনিয়র, আর্মি-অফিসর, আমলা, সকলেই এখন চ্যাম্পিয়ন ঘুষখোর। থানাদার বা ইনকাম ট্যাক্স, সেলস ট্যাক্স ওয়ালাদেরও লজ্জা দিচ্ছে তারা। প্রয়োজন থাক আর নাই থাক ঘুষ খাওয়া অভ্যেস হয়ে গেছে সকলেরই। এ খেয়ে জোয়ানের আরক বা পুদিনহারাও খেতে হয় না। হজমের কোনওই গোলমাল হয় না।

এখন সকলেরই সব চাই। ছেলেবেলায় সুঘরাই দেখেছে যে, যোগ্যতার সঙ্গে প্রাপ্তির একটা সম্পর্ক ছিলই। এখন সে সব চুলোয় গেছে। ডাক্তার এঞ্জিনিয়র ছেলে পরীক্ষা পাশ করে গিয়ে ঢুকছে সরকারি নানা ডিপার্টে, অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, পুলিশ, ইনকাম ট্যাক্স, তারজন্য কম্পিটিটিভ পরীক্ষাতে বসে তা পাশ করে ঢুকে পড়েছে

ঘুষ খাওয়ার জন্যে। যা এই দেশের অবস্থা এখন এই সব কমপিটিটিভ পরীক্ষা পাশ করার মধ্যেও ঘুষ-ঘাষ ঢুকে পড়েছে কি না কে জানে। ঘুষ যে সর্ষের মধ্যেই ঢুকে গেছে। কোন ওঝা ওই ভূত ছাড়াবে কোন সর্ষে দিয়ে? ঘরে ঘরে ঘুষের মহোৎসব লেগে গেছে। বিবেক-টিবেককে ছারপোকার মতো টিপে মেরে দিয়েছে সকলে। বিবেক আর কামড়ায় না কারওকেই। মেয়েটার অমন মর্মান্তিক মৃত্যুর পরে সকলেই বলেছিল, মানে আম-জনতা, হা রাম! যো হোনা থা উতো হোয়ি গ্যায়া, অব কর্‌না ক্যা?

বলে, দু তালুতে খইনি মেরে খেয়ে নিজের নিজের বিবেককে ধোঁকা দিয়েছিল। শুধু পটকান পনেরো দিন মুখে খাবার তুলতে পারেনি। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছিল। অসহায়েরা যেমন চিরদিন সকলের অন্যায় সহ্য করে কেঁদেছে তেমনই করে। এতে আর নতুনত্ব কী? তা দেখে, নিজেকে অভিশাপ দিয়েছিল সুঘরাই। নিজের উপরে ঘেন্না হয়েছিল।

অন্যায় যারা করে, আর অন্যায় যারা সহ্য করে তারা যে সমান অপরাধী এ কথা কেউই বলে না আর আজকাল। আর তাই অন্যায়কারীদের সাহস ধীরে ধীরে সব সীমা ছাড়িয়ে গেছে। ক্ষমতাবানের প্যায়েরবি, মোসাহেবি সকলেই করে। অনপড় থেকে পড়ে-লিখে। সেটাই সুবিধাজনক বলে।

সময় সবই ভুলিয়ে দেয়। বুধিয়ার এই নৃশংস মৃত্যুর শোককেও দিয়েছিল। নিজের নিজের স্বার্থ ও সুবিধা বিবেচনা করে সকলেই ভুলে গেছিল এত বড় অন্যায়টাকে। কিন্তু সুঘরাই ভোলেনি। প্রতি নিঃশ্বাসে, উঠতে বসতে, চলতে ফিরতে সেই কাঁটা তাকে বাজে। কিছু একটা করতে তাকে হবেই। আজ আর কাল। নইলে আয়নার সামনে সে আর দাঁড়াতে পারবে না। সুঘরাই দলের জানোয়ার নয়, সে এক্‌রা। সকলেই যা করে সুঘরাই তা কখনওই করেনি। সে কোনও যূথপতি বা গোদার অঙ্গুলিহেলনে চলেনি জীবনে। একদিন মওকা পেলে বুধিয়ার মৃত্যুর বদলা সুঘরাই নেবেই। খুনকা বদলা খুন।

খয়ের, মওকা খোঁজে সে, যখনই অভিষেক সিং পটনা থেকে আসে। কিন্তু হারামি যে একা আসে না কখনওই। অনেক অন্যায় অনেকের প্রতি তারা করে বলেই নানা ভয়, নানা হীনম্মন্যতা, নানা পাপবোধ তাদের ছেয়ে থাকে সবসময়ে। তাই কোনও কামিনাই কখনওই একা থাকে না, একা চলাফেরা করে না। কী হাজারিবাগে, কী গয়ায়, কী পটনা-কলকাতায়, মুম্বইতে। তারা সব সময়েই দলে থাকে। দলবদ্ধ জীব বলেই একা থাকার সাহস ও ক্ষমতাই ওদের ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যায়। মন্দিরে কি গোসলখানাতেও হারামিরা একা যেতে ভয় পায়। হারামিদের লক্ষণই এই।

যার যত টাকা তার প্রাণের ভয় তত বেশি। টাকা যত বাড়ে, ভয়ও তত বাড়ে। ঝুন্ড-এ থাকা জানোয়ারের মতো এদের স্বভাব, রাহান্-সাহান্ সবই। এদের সব সাহসও দলেরই সাহস। 'এক্‌রা' জানোয়ারের মতো এরা স্বনির্ভর নয়।

খায়ের, ভাবে সুঘরাই, একদিন না একদিন সুযোগ আসবে নিশ্চয়ই। নইলে

পটকানটার কাছে কী করে সে মুখ দেখাবে? পটকান যে তারই আশ্রিত আর বুধিয়া ছিল তার বোন।

দু পা মাটিতে নামিয়ে, সাইকেলটা থামিয়ে, আবার ঢকঢকিয়ে খায় কিছুটা রাম। ডি.ভি.সি-র মোড় সামনেই। কুকুরগুলোর জন্য তৈরি হতে হবে। সে হারামিরাও দলবদ্ধ জীব। কুকুরে আর মানুষে তফাত রইল না কোনও।

এই হাজারিবাগ ছোট্ট জায়গা। এখানের সব বড়লোকদের বাড়িতেই কলকাতার রহিস আদমি পটা ঘোষের যাতায়াত আছে। যেমন আজ পাণ্ডে তাকে ডেকেছিলেন। বেজায়গাতে সম দেখিয়ে আঙুল দিয়ে নিজেকে সমঝদার জাহির করছিল গানের। এদের কেন যে আসতে বলা ম্যাহ্‌ফিলে।

কলকাতার পটা ঘোষ এলে তার বাড়িতে পার্টি লেকেই থাকে। আর উপোসী ছারপোকার মতো স্থানীয় কিছু স্বল্প-রোজগারি আর রিটায়ার্ড মানুষ নির্লজ্জের মতো মদ আর ভালমন্দ খাওয়ার জন্য তার বাড়িতে ভিড় করে মাছি পড়ার মতো। মোসাহেবি করে এমন যে, চোখে দেখা যায় না।

সুঘরাইদের ছেলেবেলাতে কিন্তু এমনটি ছিল না। আজেবাজে লোকের বাড়িতে, তার যতই পয়সা থাক, ডাকলেই মানুষে যেতেন না। আভিজাত্য, শিক্ষা এ সবের দেওয়াল ছিল।

পটা যা বলে, তাতেই আহা! আহা! করে সকলে। সর্বজ্ঞ পটা ঘোষ ক্লাসিক্যাল গান বোঝে, রভিন্দর সঙ্গীত বোঝে। গাড্ডু খাঁ সাহেব, নামী সেতারি পটা ঘোষের জিগরি দোস্ত। পটার হাতে সব খবরের কাগজ। কলকাতার বিবেকহীন জার্নালিস্টগুলো পরের পয়সায় মাছের মতো মদ গেলে আর পটার কথা মতো একে তোলে আর ওকে ফেলে। মানুষটা একটি অজীব চিজ।

পটা আদৌ মানুষ কি না সে সম্বন্ধেই সন্দেহ আছে সুঘরাইয়ের। সে জীবনে ও সংসারে একটিমাত্র সম্পর্কর কথাই জানে। সেই সম্পর্ক মালিক আর চাকরের সম্পর্ক। এ ছাড়া সংসারে যে আরও অনেক সম্পর্ক থাকতে পারে, এবং থাকে, তা তার ধারণার মধ্যেই নেই। শুনেছে যে, পটা ঘোষের পরমাসুন্দরী পুতুল-পুতুল বউ আছে একটি। ইট-চাপা ঘাসের মতো ফরসা।, শুনেছে। যেমন বেন্টলি গাড়ি আছে, মার্সিডিজও আছে, আলিপুরে প্রাসাদোপম বাড়ি আছে, বারাসাতে, কালিম্পঙে এবং হাজারিবাগেও বাড়ি আছে। বউয়ের সঙ্গে সম্পর্কটাও চাকর-মনিবের কি না, তা জানে না সুঘরাই। বউ নিয়ে একবারও আসেনি হাজারিবাগে পটা ঘোষ।

সুঘরাইও যায়নি কখনও কলকাতায়। সুঘরাইয়ের পৃথিবীটা বড়ই ছোট। যদিও অন্তর্জগৎটা ছোট নয়। একদিকে রামগড় হয়ে রাঁচি, অন্যদিকে ঝুমরি-তিলাইয়া, আর আরেক দিকে সিমারিয়া, বড় জোর চাত্‌রা বা চান্দোয়া-টোরি। এই নিয়েই সুঘরাইয়ের পৃথিবী।

নানা ছাইভস্ম ভাবতে ভাবতে মগমাতে তার ঠাকুরদার তৈরি পাথরের দোতলা বাড়িতে পৌঁছে গেল এক সময়ে সুঘরাই। তার খিদমদ্গার ছেলেমানুষ পটকান একতলার বসার ঘরের কোণে চৌপাইতে রাজাই মুড়ে ঘুমিয়ে কাদা হয়ে ছিল নিভে যাওয়া কাঙ্গরির পাশে শুয়ে। দরজায় দুবার শিকলি নাড়তেই দরজাটা খুলে

দিল পটকান ঘুম চোখে। যন্ত্রচালিতের মতো। কর্তব্যজ্ঞান টনটনে। পটকানের বাড়ি সিন্দুর গাঁয়ে। ভিখু কাহারেরই বোনের ছেলে ও। দরজাটা খুলে দিয়েই আবার রাজাইয়ের মধ্যে কুকুর-কুণ্ডলী পাকালো সে। পাশের বাড়ির বহত মালদার এম ভি. আই. গাজু তিওয়ারির অ্যালসেশিয়ান কুকুরটা দরজা খোলার শব্দে ঘাউ ঘাউ করে উঠেই চেনা শব্দ বুঝে নিয়ে আবার শুয়ে পড়ল মালিকের সাপ্লাই-করা সিঙ্গাপুরী কম্বলের উপরে।

সুঘরাই সাইকেলটাকে একতলার ঘরে রেখে, দরজা বন্ধ করে দোতলাতে উঠে নিজের ঘরে ঢুকে রাজাইটাকে হাত দিয়ে ছুঁল। বিছানার উপরে রাজাইটা চাপানোই ছিল। রাজাইয়ের উপরটা ডিপফ্রিজে রাখা মালাইয়ের মতো হয়ে গেছে। ঠাণ্ডা, কিন্তু মসৃণ। চেয়ে দেখল দোতলার বারান্দাটা চাঁদের ফিরে আলোতে ভরে গেছে। তখুনি শুতে ইচ্ছে করল না। ঘরের দরজার সামনে আরাম-কেদারাটা টেনে নিয়ে বসে সুঘরাই মনে করার চেষ্টা করছিল কোথায় দেখেছে ও দুলারি বাইকে আগে। কিছুতেই মনে করতে পারল না।

দুটো পেঁচা একটা গামহার গাছকে ঘিরে ঘিরে চক্রাকারে ঝগড়া করছিল। টিভেল দম্পতির মতো। সব দম্পতিই কি একরকম হয়? কে জানে! ঝগড়া হবে এই ভয়েই তো বিয়েই করেনি সুঘরাই। করবেও না। বহত ঝামেলা। বেশ আছে! ডিগ্রি পায়নি কোনও, চায়ওনি, কিন্তু পড়াশুনো করে, হিন্দি, উর্দু, ইংরেজি। গান শোনে। নিজের পেট চলে যায়। সাইকেলটা আছে, যেখানে যেতে চায় চড়ে পড়ে। আর বেশি কী লাগে বাঁচতে?

বারান্দাতে কতকগুলো চন্দ্রমল্লিকা করেছে পটকান টবে। লতিয়ে উঠেছে কিছু লতা নীচের থাম বেয়ে ছাদে। হাসনুহানা, হেন্বা। তবে শীতে কোনও গন্ধ নেই। তবু গাছ-পাতা-লতার একটা নিজস্ব গায়ের গন্ধ তো থাকেই। শিশিরে ভিজে সে গন্ধ আরও তীব্র হয়। চাঁদের আলো, চাল-ধোওয়া জলের মতো, কোরা শাড়ির মতো ছাদময় মেলা আছে। পূর্ণিমা হলে এ আলো ধবধবে সাদা হবে। সে দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আর দুলারি বাইয়ের মুখটি মনে করতে করতে হঠাৎই সুঘরাইয়ের বরিস পাস্তারনাক-এর ওর খুব প্রিয় কবিতার কটি পঙ্‌ক্তি মনে পড়ে গেল। ওর এরকম হয়। সুন্দরী নারীর মুখ আর সুন্দর কবিতার পঙ্‌ক্তি একই সঙ্গে মনে পড়ে যায়।

"The nights now sit down to play chess with me Where ivory moonlight chequers the floor. It smells of Acacia the windows are open. And passion, a grey witness, stands by the door." রাশ্যান পাস্তারনাক সাহেব রাশিয়ার শীত অবশ্যই হাড়ে হাড়ে জেনেছেন তবে হাজারিবাগের শীত দেখেননি। তাঁর কবিতাটি যদিও শীতে রচিত নয়। হাজারিবাগের শীতে লিখলে অন্যরকম করে লিখতেন। অবশ্যই।

সুঘরাই বারান্দার দরজার মোটা কাঠের হুড়কোটা দড়াম শব্দ করে বন্ধ করে লেপটা তুলে রাম-এর পাঁইটটা ঢকঢকিয়ে শেষ করে। দুটি হাত জোড়া করে দুই ঊরুর মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়ল। একটু উষ্ণতার জন্যে দুলারি বাইয়ের মুখটা

মনে করার চেষ্টা করল একবার। এ মুখ তার খুব চেনা, খুবই চেনা, কোথায় যেন দেখেছে!

পরমুহূর্তেই ঘুমে কাদা হয়ে যেতে যেতে ভাবল, আজ কি স্বপ্নে দেখতে পাবে মুখখানিকে?

॥ ৩ ॥

গ্লাসে করে চা বানিয়ে নিয়ে এসে পটকান দরজাতে ধাক্কা দিয়ে ঘুম ভাঙাল সুঘরাইয়ের। পটকান প্রথম দিন থেকেই সুঘরাইয়ের নামটি ঠিকভাবে উচ্চারণ করতে পারে না, বলে সুখাবাবু। নামটা অবশ্য একটু বিদঘুটেই। মির্জাপুরের মামা নাম দিয়েছিলেন ওদের দু ভাইবোনের সুহা ও সুঘরাই। দুই রাগের নামে। যারা রাগ-রাগিণীর বিষয়ে আনপড় তাদের পক্ষে এ সব নাম হজম করা মুশকিলও।

জবরদস্ত ধ্রুপদিয়া ছিলেন সুঘরাইয়ের মামা অনন্তপ্রসাদ চৌরাশিয়া। কোথায় না কোথায় তাঁর ডাক পড়ত গান গাইতে। তখনকার দিনে নিজের ছেলের নাম রেখেছিলেন পরজ আর ওদের দু ভাইবোনের নামও রেখেছিলেন মামা রাগের নামে। সুহা আর সুঘরাই। সুহা, সুঘরাইয়ের দিদি খুব ভাল গাইত। আগ্রা ঘরানার উস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ সাহাব-এর একজন তৈরি শিষ্য মুস্তাক আলি খাঁ সাহেবের কাছে খেয়াল-ঠুমরি সবই শিখেছিল। ওস্তাদ মুস্তাক আলি খাঁ সাহাব ম্যাহ্‌ফিলে গাইতেন না, মা সরস্বতীর সাধনা করতেন ঘরে বসেই। যাঁরা তাঁকে শুনেছেন তাঁরাই জানেন কোন জাতের গাইয়ে ছিলেন তিনি অথচ নিজের হাভেলি থেকে তাঁকে কেউ গান গাইবার জন্য বের করতে পারেনি। ইলাহাবাদের এক বহত পয়সাওয়ালা রহিস পরিবারে ওই গানের গুণেই সুহা দিদির বিয়ে হয়ে গেছিল। তেমন সুন্দরী ছিল না দিদি।

এখন সুহা ওর শ্বশুরবাড়িতে ম্যাহ্‌ফিল বসলে চিকের আড়ালে বসে তওয়ায়েফ বা উস্তাদ বা পণ্ডিতদের গান শোনে। নিজের তানপুরাতে ধুলোর আস্তরণ পড়েছে। কখনও চৈতি হাওয়াতে কোনও মৌমাছি বা নীল মাছি জানালা গলে তানপুরার তারে এসে অচানক পাখনা নেড়ে গেলে যে মুহূর্তের ঝংকার ওঠে তাতে নিজেই চমকে ওঠে সুহা দিদি। সুহা দিদির কথা ভাবতেই মনটা খারাপ হয়ে যায়। যে মানুষের মধ্যে গান আছে বা ছিল তার মধ্যে গান থেকেই যায়, বাইরে তার প্রকাশ হোক আর নাই হোক। দীর্ঘশ্বাসের মধ্যে হলেও সেই গান প্রশ্বাস নিয়ে ঠিকই বেঁচে থাকে।

এই সব দেখে শুনে সুঘরাই বুঝেছে যে কোনও জিনিসই, সে গানই হোক, কী পড়াশুনো, কী প্রেম, শুরু করাটা খুবই সোজা, শেষ করাটাই আসল। দিদির গান শেষ অবধি হল না। নিজের পাঁচ ছেলেমেয়ে, দুই জা, তাদের দুটি করে, বৃদ্ধা অসুস্থা শাশুড়ি, বদমেজাজি বৃদ্ধ শ্বশুর, আঁচলে বাঁধা আলমারির চাবির গোছ, এতকিছুর মধ্যে গান কবে যে গোপনে বিদায় নিয়ে চলে গেছে তা বুঝতে পর্যন্ত পারেনি সুহা দিদি।

সুঘরাইয়ের মামা অনন্তপ্রসাদ আক্ষেপ করতেন মায়ের কাছে, মা যতদিন বেঁচে ছিলেন, যে, আমারই দোষে সুহা বেটির গানবাজনা হল না। নাড়া বেঁধে, হাতে সুতো বা সোনার চেন বেঁধে অনেকেই গুরুর কাছ থেকে গানের আস্তাই আদায় করতে পারে সহজেই, কিন্তু গানের আলো আদায় করা অত সহজ নয়। সুহা দিদি উস্তাদ মুস্তাক আলি খাঁ সাহাবের কাছ থেকে আলোই আদায় করেছিল। মামাও পয়সাওয়ালা পরিবার দেখে ভেবেছিলেন, গান বাজনার কদর ওরা করবে। কিন্তু বহত পয়সাওয়ালা বলেই বোধ হয় কদর করল না। তওয়ায়েফ-এর কদর করা আর মা সরস্বতীর কদর করা এক কথা নয়। তা ছাড়া বড় দেরি করে বুঝেছিলেন মামাজি, যে লক্ষ্মীর সঙ্গে সরস্বতী খুবই কম সহাবস্থান করেন।

সামনের প্রাচীন বটগাছের পাতাতে যে রোদ ঝিলমিল করছে তার উপরে কমপক্ষে শ পাঁচেক হরিয়াল এসে বসে বটের ফল খাচ্ছে। বটগাছে ফল আসে পুজোর সময়ে কিন্তু এ গাছটাতে ফল ধরে সারা শীত। রোদের চমকানিতে কোনটা পাতা আর কোনটা সদা-চঞ্চল সবুজ হরিয়াল তা বোঝা যাচ্ছে না।

ঝকমক করছে রোদ। বড়া মসজিদের দিক থেকে একটা টানা গুঞ্জরন আসছে। আজকে ওদের কোনও তেওহার আছে মনে হয়। সকাল থেকেই হইরই শোনা যাচ্ছে। হাজারিবাগ শহর আগে খুবই সুনসান ছিল। বাংলাদেশের যুদ্ধের পরে সেই যে দলে দলে এল ওরা পশ্চিমবঙ্গ হয়ে, সেই থেকে সংখ্যা ক্রমশ বাড়তে লেগেছে। এখন এখানে হিন্দুরাই সংখ্যালঘু।

সুঘরাইয়ের অনেক মুসলমান দোস্ত আছে। বেশ লাগে ওদের। মনমৌজী। খানা-পিনা, গানা-বাজনা সবেতেই উৎসাহ আছে; হিন্দুদের মতো প্যানপ্যানানি নেই। ওর দোস্ত নাসির কথায় কথায় একটা শব্দ ব্যবহার করে—বলতে গেলে ও একাই ওই শব্দটাকে চালু করে দিল হাজারিবাগে। শব্দটা হল বিন্দাআস! ওকে কেউ ঠকিয়ে গেল তো নাসির বলল, বিন্দাআস। নাসির কাউকে ঠকিয়ে এল, তখনও মুচকি হেসে বলল, বিন্দাআস। ওর ছোটামামা ওর মেজদির সঙ্গে প্রেম করে বিয়ে করল, নাসির বলল, বিন্দাআস। বদু মিয়ার নধর পাঁঠাকে দুপুরবেলা চুরি করে এনে জবাই করে কেটেকুটে চাঁব, পায়া, বিরিয়ানি, লাব্বা, চোরি করে রেঁধে সন্ধেবেলা দোস্ত-বিরাদরদের ডেকে রাম সহযোগে জোর খানাপিনা করল, তারপর চোখ মেরে বলল, বিন্দাআস।

বিন্দাআস শব্দটার মানে যে ঠিক কী তা সম্ভবত নাসির নিজেও জানে না। সুঘরাইয়ের মনে হয় ইংরেজি 'could not careless'-এর সঙ্গে খুব মিল আছে শব্দটার।

রোদের মধ্যে ছাদে বসে চা-টা খেতে খেতে সুঘরাইয়ের আজ নাসিরের কথা খুব মনে পড়ছিল। নাসিরেরও গান বাজনার খুব শখ। কাল রাতের দুলারি বাইয়ের গানের রেশ এখনও তার মনকে ভরে আছে আর সেই জন্যেই দুলারি বাইয়ের গানের সঙ্গে নাসিরের কথা মনে পড়ে গেল সাতসকালেই। নাসির ওর জিগরি দোস্ত। নাসিরকে ও মির্জাপুরে মামাবাড়িতেও নিয়ে গেছে ছেলেবেলায়। সুঘরাইয়ের

ছোট মামাতো-বোন চামেলিকে খুবই পছন্দ ছিল নাসিরের। তখনকার দিনে হিন্দু-মুসলমানে বিয়ে হলে দাঙ্গা লেগে যেতে পারত।

ঘুম থেকে উঠেছিল আজ খুব দেরি করে। সকালের ডাক নিয়ে এল পটকান বাজার করে ফেরার সময়ে। চা-টা সুঘরাইয়ের হাতে ধরিয়ে দিয়েই চলে গেছিল। জলের ট্যাঙ্কের নীচে মাছওয়ালারা আসে তিলাইয়া ড্যামের মাছ নিয়। দেরি করে গেলে ভাল মাছ পাওয়া যায় না। সুঘরাই অত মাছের ভক্ত নয়। আসলে মাছ ভালবাসে পটকানই নিজে। তাই দৌড়ে যায়। সুঘরাই বোঝে, কিছু বলে না। আনন্দ পায় ছেলেটা একটু মাছ খেয়েই। আনন্দ পাক। কতই বা মাইনে পায়! খেতে পায় সেইটুকুই যা। ওদের বস্তির ঘরে তো বছরে কদিন ভাত খেতে পায় তাই অজানা। দু মুঠো ভাতই ওদের কাছে মস্ত বিলাস।

পটকান কথা কম বলে। ছাদে উঠে এসে বলল, নাসিরবাবু এসেছেন।

কোথায়?

চমকে উঠে বলল সুঘরাই। যার কথা ভাবছিল সেই এসে হাজির।

মোটর সাইকেল রেখে আসছেন উঁপরে।

তারপরই বলল, অভিষেক সিং কোররার মোড়ে একটা বাচ্চাকে গাড়ি চাপা দিয়েছে একটু আগে।

সে কী রে! তারপর?

লোকে গাড়ি ঘিরে ফেলেছিল। পাঁচশ টাকা দিয়ে চলে গেছে।

ছেলেটা?

হাসপাতালে।

অবস্থা কেমন।

শুনলাম ভাল না। নাও বাঁচতে পারে।

কার ছেলে?

লালু হাজামের। পথের পাশে বসে রোদ পোয়াচ্ছিল আর জিলিপি খাচ্ছিল। আর তার বাবা চুল কাটছিল লোকের। আজ তো জুম্মাবার। সকাল থেকেই ভিড়।

তারপর?

নাসির উঠে এল ছাদে।

বলল, তারপর আর কী? ওখান থেকে তো সোজা কোতোয়ালিতে চলে গেল সিং বাবু। বড় দারোগা ইমানদার নেক আদমি। কিন্তু মহা খচরা ছোট দারোগাটা। মনে হচ্ছে তাকে ফিট করে দিয়েছে এতক্ষণে। সকলে বলছিল। বড় দারোগা সিমারিয়াতে গেছে ইন্সপেকশনে। পটকান বলল, ইনসপিকশান।

সুঘরাই ভাবল, ছেলেটা মরে গেলেই বা কী হবে। পটকানের দিদি বুধিয়া মরে গেল তো কী হল? বিন্দাআস।

চা এনে দে দাদাকে।

সুঘরাই বলল।

তারপর পটকানকে বলল, গেলি মাছ কিনতে জলের ট্যাঙ্কের নীচে তা কোররার মোড়ে তুই কী করতে গেছিলি?

বা-রে। আপনি কাল রাতে বললেন যে, গরম জিলিপি আর সামোসা আনতে।

বলেছিলাম?

হ্যাঁ তো।

ছাদে উঠে এসে নাসির বলল, আরে মাঠ্‌রীভি লাও পটকান, দো চার ডরজন, কম সে কম, নেহি তো পটকা দেগা। খ্রিফ চায়ে নেহি দেনা।

সমঝা না?

পটকান হেসে বলল, জী। আভ্‌ভি লায়া বাবু। গরম গরম সামোসা আর জিলাইবি ভি লায়েগা।

লাও। মগর মাঠ্‌রীভি লাও।

পটকানের হাতের ঘিয়ে ভাজা মাঠরী খুব প্রিয় নাসিরের।

পটকান চলে গেলে নাসির বলল, দুলারি বাইকি গানা শুননা হ্যায় তো সাত বাজি বিলকুল তৈয়ার হোকে রহ্‌না। ম্যায় উঠাকে লে যাউঙ্গা।

কাঁহা হ্যায় ম্যাহ্‌ফিল?

ছদিবাবুকি ঘর।

কালভি তো থে পাণ্ডেবাবুকি ঘর। তু তো আয়া নেহি।

ম্যায় সব দাওয়াত পুরা নেহি করতা হুঁ।

তুমহারা থা দাওয়াত?

নেহি তো ক্যা?

কাহে? গ্যয়া কাহে নেহি?

বিন্দাআস।

নাসির বলল।

তারপর নাসির বলল, ইয়ে দুলারি বাই হ্যায় কওন তু জানতে হো?

জানতা তো নেহি মগর সকল অ্যায়সী লাগা কি ক্যা?....

খোয়াব মে দেখা হোগা।

বকওয়াস মতো কর্‌।

নেহি। উও নেহি, মগর, সাচ ....

দিখা তো তু জরুর।

নাসির বলল।

চমকে উঠে সুঘরাই বলল, কঁহা?

ওর বুকের মধ্যেটা ধড়ফড় করতে লাগল। নাসিরের কথা শুনে মনে হল নাসির যেন চেনে দুলারি বাইকে।

কঁহা? ম্যায় ক্যাহে বাতাঁউ। শোচ, শোচ, শোচ, তব হি না জবাব মিলেগী।

বলেই, চোখেমুখে এক দুষ্টুমির হাসি এনে জিয়ার সেই বিখ্যাত শেরটি আউড়ে দিল ডান হাত নেড়ে।

'কৌনসা জখম কা খুলা হ্যায় টাকা
আজ ফির দিলমে দর্দ হোতা হ্যায়।'

কোন পুরনো ক্ষতের সেলাই খুলে গেল তা কে জানে! আবারও রক্তক্ষরণ

শুরু হয়েছে আমার হৃদয়ে।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সুঘরাই বলল, ইয়ার্কি না মেরে বলই না আসল কথাটা?

নাসির বলল, তোর মামাবাড়ি মির্জাপুরের কথা মনে আছে কিছু? সেই যে পরজদাদা আমাদের নিয়ে বাইজি মহল্লাতে গান শুনতে যেত?

আছে বইকী।

মুন্নি বাইয়ের কথা মনে আছে?

আছে না? আহা! হোরি ধামার কী গাইত। জীবনে কোথাও অমন না শুনেছি, না আর শুনব।

তার ছোট বোনকে মনে আছে? শবনম। যার জন্যে পরজদাদা চকলেট নিয়ে যেত আর যে মছিন্দাতে যেত আমাদের সঙ্গে চড়ুইভাতিতে। বিলাওল ঠাটের একটা বন্দিশ গাইত সে ভারী মিষ্টি করে—যেন মধু ঝরত। মনে নেই? দু বিনুনি করে থাকত মা-মরা মেয়ে। মোটা করে সুর্মা লাগাত আর ফিরদৌস আতর মাখত। মনে নেই? ছোট্ট ছিল তখন।

তুই বলতিস কানে কানে ফিসফিস করে, চোখ দুটো কী সুন্দর রে। বড় হলে আমি ওকে বিয়ে করব।

আমি বলতাম, বড় তুই নিজেই তো আগে হয়ে নে। তা ছাড়া, সে ঘটনা ঘটলে আমি সবচেয়ে আগে দাঙ্গা লাগাব।

আসল কথাটা বলই না।

অধৈর্য সুঘরাই বলল।

নাসিরউদ্দিন বলল, দুলারি বাই-ই সেই শবনম। পটনাতে থাকে এখন। নানা জায়গাতে যায় মুজরা নিয়ে। তবে শুধু গায়ই। বাজায় না কোথাও।

তাই?

তাই তো জানি।

রেকাব ভর্তি করে মাঠ্‌রী আর বরফি, জিলাইবি আর সামোসা আর গরম ধোঁয়া উঠা বড় এক গ্লাস চা নিয়ে এল পটকান নাসিরের জন্যে। তারপর আনতে গেল সুঘরাইয়ের জন্যে।

পটকান চলে গেলে সুঘরাই বলল, গায়, কিন্তু বাজায় না মানে?

মানে, বাজায় না। তুই একটা বুদ্ধু। এত তওয়ায়েফের গান শুনিস আর এটুকু জানিস না? খুব সামান্য সংখ্যক তওয়ায়েফই এখনও আছে যারা শুধুই গায়, শোয়-টোয় না। শুনেছি শবনম শুধুই গায়। তা ছাড়া ওর বয়সই বা কী?

শোওয়াকেই বাজানো বলে?

জী হাঁ, বুদ্ধুরাম।

তারপর বলল, মনে আছে তোর? ও তোর নাম দিয়েছিল ডাকু। জানি না, কী ড্যাকাইতি করেছিলি তুই আমার চোখের আড়ালে।

আর তোকে তো ডাকত চুহা বলে। আমার মনে আছে। কেন বলত তুইই জানিস।

সুঘরাই হেসে বলল।

আহা! মনে আছে এক বর্ষার বিকেলে মছিন্দাতে একটি কালো পাথরের উপরে আসনপিঁড়ি হয়ে বসে শবনম আমাদের সবে শেখা মিয়াকি মল্লার শুনিয়েছিল। অতটুকু মেয়ে—কিন্তু কী তার গলা, কী ভাব। সারাজীবন হারমনিয়াম আর সারেঙ্গি ভেঙে ফেললেও কারও কারও গলাতে সুরের পাখিরা বাসা বাঁধে না আর কেউ কেউ জন্মায়ই কোকিল হয়ে। প্রতিটি পর্দাই ভরপুর সুরে বলে। মায়ের পেট থেকে পড়েই। তারপর বলল, মিয়াঁকি মল্লার পুরুষদের গলাতে ভাল খোলে কিন্তু শবনম ছাড়া আর কোনও মেয়ের গলায় আর কোনওদিনও আমরা মিয়াঁ কি মল্লার শুনতে পাব বলে মনে হয় না।

সুঘরাই বলল, আশ্চর্য! জানিস, কাল দরবারি কানাড়া গাইল। কোনও ম্যাহ্‌ফিলে কোনও গায়িকাকে আগে আমি দরবারি গাইতে শুনিনি। ও কি মিয়াঁদের চিবিয়ে খাওয়ার জন্যেই এসেছিল।

সে তো চোখের দৃষ্টি দিয়েই পারে।

গান গাইবার দরকার কী?

তারপর বলল, জানিস সুঘরাই, তোর মনে আছে কি না জানি না, পরজদাদা বলত, বুঝলি রে! আর্ট তো একটা এফেক্ট, আর সেই এফেক্ট বজায় থাকে পরিবেশনের কায়দায়। আলাপই বল, আর গানই বল, কায়দার শেষ কথা হল কীভাবে আখরি বাহার খুলে দিতে হয়—সেলাম জানিয়ে বিদায় নিতে হয়। জারিনের আওয়াজে যদি গায়কীই চাপা পড়ে যায়, আর গায়ক বা গায়িকা যদি সুর ছেড়ে দিয়ে দু হাতে আশরফির মতো তারিফের টুকরা জমা করতে মন দেয়, তো আমি বুঝব যে মানুষটা বহতই কম দরের। বাজনা তো শুনেছি মিয়াঁ কি মল্লার অনেক ভাল ভাল বাজিয়ের কিন্তু আমাদের ছোট্ট শবনম সেই সন্ধেতে তার গলাতে এবং তাও আবার খালি গলাতে, যা গেয়ে শুনিয়েছিল তার তুলনা তো আজ অবধি কারও গলাতেই শুনলাম না।

মনে আছে?

আমরা পরজদাদার প্রতি কৃতজ্ঞভাবে মাথা নিচু করে নিঃশব্দে চেয়েছিলাম। আমার বা তোর কারও মুখ দিয়েই একটি বাক্য সরেনি।

হুঁ। মনে আছে।

শবনম আমাদের অনাবিল, উচ্ছ্বসিত, উদ্বেলিত প্রশস্তির লজ্জাতে মুখ নামিয়ে বসে ছিল। মেঘ-ছেঁড়া আলো এসে পড়েছিল তার সুডৌল সুন্দর মুখে। গঙ্গামাঈয়ের উপর পরতে পরতে মেঘ সাজছিল আর কুন্দফুলের মালার মতো সাদা বকের পাঁতি সেই কালিমার পটভূমিতে দুলতে দুলতে উড়ে যাচ্ছিল। আর তারই সঙ্গে ঝুরু ঝুরু করে একটা হাওয়া বইতে লেগেছিল। আমলকী গাছেদের পাহারাতে ঘেরা মছিন্দা নদীর উপরে যে দুটি মাছরাঙা এতক্ষণ উড়ে উড়ে মাছ ধরছিল তারাও ওড়া থামিয়ে শবনমের গান শুনছিল স্তব্ধ হয়ে, একটি ছোট্ট গাছের ভাঙা পত্রশূন্য ডালে বসে। গানও শেষ হল, তারাও উড়ে চলে গেল দিনান্তবেলাতে।

সুঘরাইয়ের মনে পড়ল, নাসির বলেছিল, সেই সন্ধেতে, তুমি এমন সুন্দর করে কথা বলতে শিখলে কার কাছে পরজদাদা?

সে আছেন আমার গুরু কলকাতার পাঁচুবাবু। হ্যাঁ গানতো শোনে অনেকেই কিন্তু সেই শোনার ঠিকঠাক তারিফ কজন করতে জানে। পাঁচু জ্যাঠা একই সঙ্গে জ্ঞানের আর রসের ভাণ্ডার। তাঁর পায়ের কাছেই বসে শিখেছি যা শেখার।

কত কথাই যে মনে পড়ে সুঘরাইয়ের। তা হলে এই দুলারি বাই-ই সেই শবনম। ভাবতেই গা শিরশির করে উঠল সুঘরাইয়ের। ভাবতেই তার কী যে ভাল লাগছে। আজকে আর কি সে ডাকাতি করতে দেবে কোনওরকম।

তবে ডাকাতি একটা করেছিল বটে। ছোট্ট ডাকাতি। জোর করে চুমু খেয়েছিল শবনমকে। কিছুক্ষণের জন্য অন্যমনস্ক হয়ে গেছিল সুঘরাই। ভাবছিল, মেয়েরা বিধাতার এক আশ্চর্য সৃষ্টি। মেয়েদের বড় হয়ে ওঠার রহস্যটি বড় বিস্ময়ের। ফুল ফোটার মতো। গ্রীষ্মশেষের উষর রৌদ্রদগ্ধ ডালে ডালে যেমন করে একরাতেব বর্ষণে সবুজ পর্ণাঙ্কুরে ঢেকে যায় গাছ, এ সেরকম নয়। এই রহস্যের সঙ্গে গাছেদের বেড়ে ওঠার মিল আছে। এক এক বর্ষা যায় আর তাদের রূপ খোলে. তারা লম্বাতে বাড়ে, আরও চাকচিক্য পায়। পুরুষ কি মেয়েদের জীবনে বর্ষা হয়ে আসে?

কে জানে! কতটুকুই বা জানে সুঘরাই।

|| ৪ ||

বিকেল বিকেল তৈরি হয়ে নিয়েছিল সুঘরাই। দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর লম্বা ঘুম লাগিয়েছিল একটা। সকালে নাসির চলে গেলে, ধানখেতিতে গেছিল একবার। গেহুঁ বাজরা মকাই ধানের খবর করতে। লোকজন সকলেই আছে তবুও একবার না গেলে চলে না। খেতির লাগোয়াই ভাণ্ডার। তাতেই সব মজুদ হয় তারপর বাজার বুঝে বেচে। এই সুঘরাইয়ের তর রোজগারের উৎস। তার বাপ-ঠাকুরদার রেখে-যাওয়া সম্পত্তি।

এ দিকে নকশালদের দৌরাত্ম্য রোজই বাড়ছে। ও তো বুর্জোয়াই। তবে ওর কুলি-কামিন কর্মচারী কারও জীবনযাত্রার সঙ্গেই ওর নিজের জীবনযাত্রার বিশেষ তফাত নেই। সকলকেই বিরাদর মনে করে ও। এবং সে খবর নকশালেরাও রাখে। নইলে এত দিনে ও-ও হয়তো খুন হয়ে যেতও।

বাবার একটা ওয়েবলি-স্কট-এর রিভলভার ছিল। পয়েন্ট থ্রি-টু বোরের। সেটাও ঠাকুরদার কাছ থেকেই বাবা পেয়েছিলেন। ও-ও পেয়েছে বাবারই কাছ থেকে। বাবার জীবদ্দশাতেই সেকেন্ড লাইসেন্স করে নিয়েছিল ও, বাবাও যেমন করেছিলেন ঠাকুরদার জীবদ্দশাতে।

তা ছাড়া, বন্দুক রাইফেলও ছিল। টুয়েলভ বোর শটগান, ফোর টোয়েন্টি থ্রি সিংগল ব্যারেল রাইফেল। ঠাকুরদা ও বাবা শিকারও করতেন। ফসল বাঁচাবার জন্যে শুয়োর শম্বর কোটরা খরগোশ মারতেই হত। গাই বয়েল মেরে দিত বাঘে ও চিতাতে। সে জন্যে প্রযোজনে তাদেরও মারতে হত।

ও নিজেও একটা কিনেছিল ইন্ডিয়ান অর্ডিনান্স কোম্পানির থ্রি-ফিফটিন রাইফেল। মানুষ মারার জন্যে আইডিয়াল। একটা সময়ে চুরি-ডাকাতি লেগেই থাকত। কোতোয়ালিতে না গিয়ে যার যার ফায়সালা নিজেরাই করত একটা সময়ে। এখন

তো যাদের লাইসেন্সড বন্দুক-রাইফেল আছে তাদেরই বিপদ সবচেয়ে বেশি। পুলিশ যেমন হয়রানি করে, তেমনই ছিনতাই হবার ভয় থাকে নকশালদের হাতে। থানা থেকেই নক্শালেরা কার কার ঘরে কী ওয়েপন আছে তা জেনে নেয়। এ বড় অজীব সময়। শুনেছে, পশ্চিম বংগালেরও এমনই হাল ছিল একটা সময়ে।

এখন বন্দুক রাইফেল সব বেচে দিয়েছে কারণ এখন ড্যাকাইতি করতে যারা আসে তারা এ. কে. ফর্টিসেভেন নিয়ে আসে। স্পোর্টিং বন্দুক-রাইফেল ঐ অস্ত্রের সামনে বেকার। শুধু রিভলভারটাই রেখেছে মনকে প্রবোধ দেবারই জন্যে। প্রয়োজনে তা দিয়ে প্রাণ বাঁচানো যাবে কি না তা অজানা। তবে সন্ধের পর বেরোলে ধুতির উপরে বেল্টে গুলি ভরে বেঁধে নিয়ে যায়। তাকে কেউ মারতে এলে দাঁড়িয়ে মারা যাবে না সুঘরাইকে। সে যেই হোক।

নাসিরের কাছে আনলাইসেন্সড প্রহিবিটেড বোর-এর অ্যামেরিকান কোল্ট পিস্তল আছে। কলকাতার খিদিরপুর থেকে কেনা। নাসির বলে, ইস জমানেমে ইসব রাখনা বহতই জরুরি হ্যায়। পুলিশ অওর কানুন কি কুছভি সাহারা নেহি।

এই সব কেনবার টাকা কোথায় পেল নাসির, জানে না সুঘরাই। ওর রুজি বলতে তো ছোট একটা মোপেড মেরামতির কারখানা। তবে নাসির তার ল্যাঙ্গোটিয়া দোস্ত। স্কুল থেকে কলেজ পর্যন্ত। ওদের দোস্তিতে কোনও শর্ত নেই। নাসিরের বাবা ছিলেন ট্রেজারির ক্লার্ক। নানা রহস্যময় ব্যাপার স্যাপার ঘটছে আজকাল চারদিকে। গুজগুজ ফুসফুস। ঠিক কী যে ঘটতে চলেছে আন্দাজ করতে পারে না ও তবে মনের মধ্যে একটা উদ্বেগের মেঘ জমছে সুঘরাইয়ের বেশ কিছুদিন হল।

এই সব বিষয় নিয়ে নাসিরের সঙ্গে আলোচনা করতে গেলে নাসির ফুতকারে উদ্বেগ উড়িয়ে দিয়ে বলে, বিন্দাআস। আবৃত্তি করে বলে—

"ভঁমর যে লড়ো তুন্দ লহরোঁ সে উলঝো
কঁহা তক চলোগে কিনারে কিনারে?"

মানে, পাড়ে পাড়ে আর কতদিন সাবধানী পা ফেলে ফেলে চলবে? ভয়ের সঙ্গে লড়াইয়ে নামো, ঢেউয়ের মধ্যে উলটাও পালটাও, তবে না!

জামাকাপড় পরা হয়ে গেছিল সুঘরাইয়ের। নীচ থেকে নাসিরুদ্দিনের মোটর সাইকেলের পিঁ পিঁ শোনা গেল। সুঘরাই নীচে নেমে নাসিরের মোটর সাইকেলের পাশে দাঁড়িয়ে পটকানকে বলল, আজ খনা বহার। মগর লওটনেমে দের হোগি। তুম খা-পিকর শো যানা।

নাসির বলল, ডাটকে খানা অওর মুতকে শো যানা।

পটকান হাসতে গেল কিন্তু সুঘরাইয়ের সামনে হাসতে পারলও না। নাসির এই রকমই। ও যখন সুঘরাইয়ের বাড়িতে আসে, শুধু সুঘরাইয়ের বাড়িই কেন, যেখানেই ও যায়, তখন সে বাড়ির মালিক ওই বনে যায়। দলিল-সনদের কোনও দবকার হয় না। সে বাড়ি নবাবের হাভেলিই হোক কি জমিদারের ভাণ্ডার কি সুঘরাইয়ের মতো কারও বাড়ি। আল্লার বহতই এক দোয়া আছে নাসিরের উপর।

ভাবে পটকান।

মোটর সাইকেলে ওঠার আগে মাফলারটাকে ভাল করে গলায় জড়াল সুঘরাই।

নাসির বলল, শালে বচপনকি পেয়ারি সে মিলনে যা রাহা হ্যায় তেরা কোঈ আচ্ছাওয়ালা মাফলার নেহি থা ক্যা?

ইসসেই চলেগা। বকোয়াস মতো কর।

নীচু গলায় বলল সুঘরাই।

ঈত্বর-উত্বর লাগায়া না ঠিক সে?

নেহি তো।

অপ্রতিভ হয়ে বলল, সুঘরাই।

তু সাচমুচ অজীব আদমি হ্যায়।

বলেই, পাশে দাঁড়ানো পটকানকে বলল, আরে এ সুরত হারাম, দিখতা ক্যা হ্যায়? যা জলদি। ঈত্বরদান লান।

পটকান হুড়দাড় করে দোতলাতে গিয়ে ইত্বরদান নিয়ে আনলে নাসির হেসে বল, লেঃ। তু অম্বর লাগালে। ড্যাকাইতি আজভি তো কুছ করোগে, ক্যা? কম সে কম, থোড়া বহত।

বলে, নিজেই ঘোর লাল রঙা অম্বর আতরের কাটগ্লাসের শিশি থেকে কাচের ঢাকনি খুলে সুঘরাইকে আতর লাগিয়ে দিল। কানের লতিতে, বুকের চুলে, মাফলারে। আর নিজে একটু ফিরদৌস লাগাল তার সুচোলো গোঁফে।

বলল, ম্যায় শবনম যেইসী মহকেগা আজ।

সুঘরাই পটকানের সামনে নাসিরকে কিছু বলতে না পেরে চুপ করে থাকল।

নাসির মোটর সাইকেল স্টার্ট করল। বলল, ওটাকে নিয়েছিস তো পেটে বেঁধে? ফিরতে রাত হয়ে যাবে। যা দিনকাল পড়েছে।

হ্যাঁ। আর তুই?

নিশ্চয়ই।

বলেই বলল, পান তো খাবি?

নিশ্চয়ই।

বলল, সুঘরাই।

নানকু পানওয়ালার দোকানের সামনে তখন রংবাজ ছোকরারা জমায়েত হয়েছে। সিনেমাতে সন্ধের শো-এর সময়ও হয়ে এল। 'তুম একেলি, ম্যায় একেলা' ছবি এসেছে। গড্ডন খাঁ আর বেবি লিটপিটিয়া হিরো-হিরোইন। বহত দামে টিকিট ব্ল্যাক হচ্ছে। শনিবারের বাজার।

কালিপিলি জর্দা দিয়ে পান নিল দুজনে। চারটে সঙ্গেও নিয়ে নিল।

আজকে রয়্যালস্টাগ-এর পাঁইট নিয়েছি রে তোর জন্যে।

নাসির বলল।

কামাই খুব জোর হচ্ছে বুঝি?

বেঁকা রাস্তা ধরেছি না। বলিস না কারওকে। আব্বা জানলে তো খাল খুলে নেবে।

ধান্দাটা কী?

চোরাই মোটর সাইকেল আর স্কুটারের রং আর নাম্বার প্লেট পালটে নতুন করে ঝেড়ে দিচ্ছি বাজারে।

ছিঃ ছি। তুই না শায়ের!

শায়ের বলেই তো একটু ভাল থাকা-খাওয়া দরকার। শরাব-টরাব। মির্জা গালিবও দেনাতে ডুবে ছিলেন, সবই মদে উড়িয়ে ছিলেন. সে সব কথা কি মানুষে মনে রেখেছে? মনে রেখেছে তাঁর শেরগুলোকে। নাঃ; জীবনটা বড় ছোট। বুঝলি সুঘরাই। বুড়ো হয়ে জীবন উপভোগ করার মতো ধৈর্য আমার নেই তোর মতো। তুই গেহুঁ বাজরা বেচ গিয়ে, খেতি-জমি বেচ খেপে খেপে, আমাব পোষাবে না? পাণ্ডেবাবু তো আমারই লাইনের লোক। ক বছরের রহিস সে? দ্যাখ না। আমিও শালা ধান্দা যদি এমনি চলে তো কানাহারি হিল রোডে বাড়ি বানাব বা কিনব আর আমার পেয়ারিকে নিয়ে আসব আমার ঘরে।

পেয়ারি মানে?

মানে, নাজমা।

সে কি? সে তো শাদি-শুদা লেড়কি।

তো কী হল? বাতিল থোড়ি হয়ে গেল সে! তার খোদার খাসির মতো মরদটাকে সরিয়ে দেব দুনিয়া থেকে।

আর বাচ্চাটা?

কত পাখির বাচ্চার গলা মুচড়ে মারলাম আজ অবধি বচপন থেকে, আরও একটা বাচ্চা মারতে কী লাগবে?

নাঃ। তুই ....

সুঘরাইয়ের বুকের মধ্যে কষ্ট হচ্ছিল। বড়ই বদলে গেছে নাসির। ওর সঙ্গে আর বেশিদিন পটবে না সুঘরাই-এর।

একটু পরেই সন্ধে হয়ে যাবে। মাঘ মাসের নিস্তেজ লাল রোদে পথের লালমাটি ও ধুলোমাখা গাছপালাকে বিধুর দেখাচ্ছিল। পাখিরা কিচিরমিচির করতে করতে ঘরে ফিরছিল। ঝিঁঝিঁদের ঝিনিঝিনি শুরু হয়ে গেছিল। বড় চমৎকার শহর ওদের এই হাজারিবাগ। সীতাগড়া, সিলওয়ার আর কানহারি পাহাড় ঘেরা। এখানেই সে জন্মেছে, বড় হয়েছে, একটি সম্ভ্রান্ত বাতাবরণের মধ্যে—গান-বাজনা-সাহিত্য-সহবতের মোড়কে। সেই মোড়কের মধ্যে নাসিরুদ্দিনও ছিল। কিন্তু আজ যা শুনল তাতে বড় ধাক্কা খেল সুঘরাই। নাসিরুদ্দিনের মোটর সাইকেলের পিছনে বসে, তার পিঠের সঙ্গে বুক লাগিয়ে, সেজন্যে হঠাৎই যেন ভারী লজ্জা করতে লাগল ওর। কিন্তু তারই সঙ্গে নাসিরের প্রতি এক ধরনের সম্ভ্রমও জাগল। যখন ভাবল যে, অনেক মানুষই নষ্ট হয়ে যায় কিন্তু সে যে নষ্ট হয়ে গেছে তা স্বীকার করে না, সেই সত্য সচেতনে লুকিয়ে রাখে। অথচ নাসিরের কোনও লুকোচাপা নেই। ভাবটা এমনই যে, আমি যেমন, আমাকে তেমনভাবেই স্বীকার করে নিলে নাও, নইলে ফেলে দাও, আমার যায় আসে না কিছু।

ছেলেবেলার বন্ধু। ফেলে দেবে কী করে। তা ছাড়া গুণও তো কম নেই

নাসিরের। তার মধ্যে সবচেয়ে বড় গুণ তার হৃদয়। এমন হৃদয়বান মানুষ খুব কমই দেখেছে সুঘরাই। বুকের মধ্যে ঝড় উঠল ওর কিন্তু মুখে কিছুই না বলে চুপ করে রইল।

কাছারির কাছে এসে বাঁ দিকে মোড় নিয়ে নাসির বলল, অভিষেক সিং কি আজও আসবে নাকি?

আমি কি করে বলব। তুইই তো তোর অতিথি করে নিয়ে যাচ্ছিস আমাকে ছদি রায়ের বাড়ি। আমি কি তাঁকে চিনি?

ছদিবাবু সাচমুচ রহিস আদমি। কাতরাস-এ তাঁর কয়লা খাদান ছিল। শখ ছিল শিকার, ক্যামেরা, বন্দুক, রাইফেল আর মাছধরা। ওঁকে প্রথমবার দেখি তোপচাঁচিতে। বাবার সঙ্গে বেড়াতে গেছিলাম স্কুলের অ্যানুয়াল পরীক্ষার পরে, এমনই এক শীতের দিনে। দেখি মিহি ধুতি আর খাকি ফুলশার্ট পরে এক ভদ্রলোক জলের পাশে কার্পেট বিছিয়ে বসে আছেন দু দিকে চারপাঁচটা হুইল নিয়ে। পাশে একটা হোয়াইট লেবেল হুইস্কির বোতল, জলের বোতল এবং গ্লাস। ধানবাদ ওয়াটার ওয়ার্কসের দুজন উর্দিপরা বেয়ারা আর জনা দুই খিদমদগার পেছনে দাঁড়িয়ে। দুপুরবেলা স্কচ খেতে আর কারওকেই দেখিনি আজ অবধি।

নসির বলল।

তারপরে উনি কাতরাস থেকে হাজারিবাগে এলেন কী করে?

আর কী করে। কলিয়ারিই তো সব চলে গেল। এখানে বাড়ি করেছেন। ইটখোরি পিতিজে ওঁর একটি ছোট ডেরা ছিল শিকারের জন্যে। সেটি আজও আছে। তবে রোজগার চলে গেলে সব কিছু তো আর আগের মতো চলে না। একটা অ্যামরিকান সিলড-ইউনিট ফ্রিজ আছে সেখানে এখনও। চলে না যদিও।

অবস্থা যদি পড়ে গিয়ে থাকে তবে এত মানুষকে খাওয়াবেন কী করে!

সুঘরাই বলল।

আরে অবস্থা পড়লেও দিলেরি আদমির দিল তো একই রকম থাকে। ছদিবাবুর বাড়িতে ম্যাহ্‌ফিল, আর খাওয়া থাকবে না? তা কি হয়?

তা হলে আর রয়্যাল-স্ট্যাগটা আনলি কেন?

মদ খাওয়া বহুদিন হল ছেড়ে দিয়েছেন। যখন খেতেন, নিজেও স্কচ খেতেন, খাওয়াতেনও স্কচ সকলকে। আজ খানও না, খাওয়ানও না। তবে খনা কী রকম কিমতি হবে দেখিস।

তা হলে অভিষেক সিং আসবে কি না তুই জানিস না?

না। তবে বার বার এ কথা তুই জিগ্‌গেস করছিস কেন?

করছি এই জন্যে যে বদমাসটাকে আমি সহ্য করতে পারি না। বিশেষ করে বুধিয়ার মৃত্যুর পরে। এত বড় শয়তান, আপাদমস্তক ভণ্ড, শুধু পয়সা আর ক্ষমতার জোরে, খবরের কাগজওয়ালাদের মদতে মাথা উঁচু করে সমাজে ঘুরে বেড়াবে আর মানুষে দু দিকে দাঁড়িয়ে কুর্নিশ করবে এতো আর চোখে দেখা যায় না।

সে তো এখানে দেখছিস। এর পরও তো কিছু আছে না, কী?

কী আছে?

দোজখ আছে আমাদের। তোদের নরক আছে।

সে সব তো অনেক পরের কথা।

জানি না, ছদিবাবু অভিষেককে বলেছেন কি না। তবে নিজে কয়লা খাদানের মালিক ছিলেন। তখন হয়তো অভিষেকের বাবা জ্যাঠা তাঁর খাদানেই কাজ করতেন বা ছোটখাটো ঠিকা নিয়ে দিন গুজরান করতেন। এখন মালিকেরা হল ভিখারি আর লুটেপুটে খাচ্ছে কিছু আমলা আর ঠিকাদার। ইন্দিরা গান্ধীর ব্যাঙ্ক ন্যাশনালাইজেশন, কোলিয়ারি ন্যাশনালাইজেশন সবই তো রিকশাওয়ালা আর গরিবদেরই ভালর জন্যে করা!

তো কিসের জন্যে?

ক্ষমতা ক্ষমতা আর ক্ষমতা। পড়িসনি কি? Power corrupts and absolute power corrupts absolutely?

বলেই বলল, এসে গেছি।

অনেক আগে এসে গেলাম মনে হচ্ছে। কোনও গাড়িটাড়িই তো দেখছি না।

আগে না এলে নিরিবিলিতে তোর প্রেমিকার সঙ্গে কথা হবে কী করে? গিধ্বর কাঁহা কি!

তারাই বা আসবে কেন এত আগে?

বাঃ। আসর তৈরি করতে সময় লাগবে না। ফুল সাজানো হবে, আতরদানি, গোলাপজল, মাইক, ঝাড়লণ্ঠন, সারেঙ্গিওয়ালা, তবলিয়া, হারমনিয়মওয়ালা, স্বরমণ্ডল, কত কিসের ইন্তেজাম লাগে। এই ফাঁকে আমরা একটু পুরনো দিনে ফিরে যাব।

বাইকটা লাগিয়ে বারান্দাতে উঠতেই একজন আপ্যায়ন করে নিয়ে গেলেন ভিতরে।

নাসির ঘাড় ঘুড়িয়ে বলল, সুঘরাইকে, ইনি ছদিবাবুর বড় ছেলে দীপুবাবু।

দুলারি বাই আপনাদের কথা জিগ্‌গেস করছিলেন। চলুন। উনি পাশের ঘরে বিশ্রাম করছেন।

নাসির যে কখন তলে তলে শবনমকে খবর দিয়ে রেখেছিল তা সেই জানে। শবনম নাকি উঠেছে পুপু ইমামের বাড়ি।

দুলারি বাই, ওরফে শবনম, হালকা নীল রঙের সালোয়ার কামিজ পরে জাজিমের উপরে বসে ছিল। তার চুলে সাদা ফুলের সাজ আর সারা শরীরে হিরের গয়না। একটি বড় নাকছাবি। চোখ দুটি ফিঙের মতো স্পন্দিত হচ্ছে। সিঁথিতে হিরের টায়রা।

সুঘরাইদের দেখে তার মনে এক বিহ্বল ভাব ফুটে উঠল। আমাদের যেন চিনল কিন্তু চিনল না। হাসল কী ব্রীড়া ভঙ্গি করে। নাসিরের তাতে কিছু গেল এল না। ঠোঁটকাটা সে বলল, আরে শবনম, তুমহারি ডাকু আয়ী ইতনি সাল কি বাদ, তুম ডরতি তো নেহি?

শবনম আরও অনেক সুন্দরী হয়েছে। সে হাসল। কিন্তু সুঘরাই বুঝল এ হাসি ছেনালির হাসি। দুলারি বাই দুলারি বাই থাকলেই ছিল ভাল। তার মধ্যে শবনমকে খুঁজতে যাওয়া মূর্খামি। তার মধ্যে সেই মির্জাপুরের দিনের মছিন্দার বিকেলের মেয়েটি আর নেই। সে মরে গেছে। অনেক শহরে মুজরা নিয়ে নিয়ে সে এখন

একজন অভিজ্ঞ পেশাদার নারী হয়ে গেছে। নাই বা বাজাল, গাইয়েও পেশাদার হয়ে গেলে, তার নিভৃত পবিত্রতা হারিয়ে যায়।

কিছু কথা হল সুঘরাই নাসির আর শবনমের মধ্যে। বেশিই ফর্মাল কথাবার্তা, বললও বেশি নাসিরই। সুঘরাই শুনল বেশি, বলল কম।

তারপরই হঠাৎ কুর্নিশ করে শবনম বলল, তানপুরা জারা মিলা লেতি হ্যায়—ইজাজৎ দিজিয়ে।

সুঘরাই বুঝল যে এবার তাদের উঠতে অনুরোধ করছে শবনম। তা করতেই পারে। এত মানুষে গান শুনতে আসবেন সব কিছুর তৈয়ারি তো করতে হবেই। কিন্তু দিলে বেশ চোট পেল সুঘরাই। রাগও হল নাসিরের ওপর। নাসির ও ঘর থেকে ম্যাহ্‌ফিল যে ঘরে হবে সে ঘরে ঢুকে পকেট থেকে পানের মোড়ক বের করে সুঘরাইকে দিয়ে এবং নিজেও নিয়ে মুচকি হাসি হেসে বলল, বিন্দাআস।

সুঘরাই অবাক হল। অনেক বদলে গেছে নাসির। তার ধান্দা যেমন তাকে বদলেছে তার অভিজ্ঞতাও হয়তো তার মধ্যের সুকুমার ব্যাপারগুলোর ইতি টেনেছে। ও যেন জানতই যে এমনই হবে, এমনই হয়ে থাকে। নসিরের মনে কোনও আঘাত লেগেছে বলে মনে হল না। কিন্তু সুঘরাইয়ের মন খারাপ হয়ে গেল। দু-বিনুনি করা শবনমকে সেই মছিন্দাতে কালো পাথরের উপরে যেমনটি দেখেছিল, যেমন করে সেই সন্ধ্যার গানটি তার বুকে এতদিন অবধি জেগেছিল, তেমনটি থাকলেই যেন ভাল হত। বুকের মধ্যে যখন কোনো প্রিয় গান মরে যায়, তখন প্রিয় পাখি মরে যাওয়ার মতোনই আঘাত লাগে।

দুলারি বাইকে নিয়েই সে সুখী ছিল, শবনম-এ তার প্রয়োজন ছিল না কোনওই।

॥ ৫ ॥

ছদিবাবুর মস্ত বসার ঘর মানুষে ভরে গেছে। তানপুরা ও সারেঙ্গি মেলানোও হয়ে গেছে। সি শার্প-এ গাইবে শবনম। তানপুরা উঁচু ফরাসের পেছন দিকে রাখা। ধূপের গন্ধ, ফুলের গন্ধ, নানা বিদেশি পারফ্যুম ও দিশি ইত্বরের গন্ধে 'ম ম' করছে পুরো আবহ। তানপুরা ছাড়ছে স্থানীয় দুই নবীন যুবা। সুঘরাই এদের মুখ চেনে কিন্তু নাম জানে না। হারমনিয়ামে যিনি আছেন সেই মানুষটিই ভিতরের ঘরে ছিলেন এবং তাঁরই অঙ্গুলি হেলনে যেন শবনম চলছিল। শবনম তাঁকে 'আব্বাস সাব' 'আব্বাস সাব' বলে সম্বোধন করছিল। সুঘরাইদের সঙ্গে দুটি কথা কয়ে তারই মুখের দিকেই তাকাচ্ছিল শবনম বারবার। মানুষটি শক্ত সমর্থ, সুপুরুষ। সিল্কের সাদা কুর্তা পাজামার উপরে কালো সর্জ-এর জওহর কোট। চারটি কলম গোঁজা। দশ আঙুলে দশ আংটি। তার মধ্যে হিরে, পান্না, অ্যামিথিস্ট, রুবি, চুনি, পলা, নীলা সব আছে। তার বুক পকেটে লাল সিল্কের রুমাল এবং চারটি কলম গোঁজা। বাহুল্যর প্রতিমূর্তি যেন মানুষটি। গলায় ফিরং-করে জড়ানো সাদা-কালো খোপ-খোপ মাফলার। মাথাতে কালো ফেজ টুপি। মুখে পান-জর্দা। আর সারেঙ্গিতে যিনি বসেছিলেন তিনি যেন এই জগতের মানুষ নন। সাদা চুল, সাদা, দাড়ি, সাদা সাধারণ কুর্তা পাজামা। তার উপরে ফলসা রঙা ফ্ল্যানেলের একটি জওহর কোট। গলাতে ফলসা-রঙা

মাফলার। দু হাতে একটিও আংটি নেই। দু কানে দুটি সোনার বড় মাকড়ি, পাহাড়ি, আদিবাসী গাঁওবুড়ারা যেমন পরে।

ছদিবাবু সকলের সঙ্গে আলাপ করিয়া দিলেন গায়িকার এবং সাথ সঙ্গতিয়াদের। ওই বৃদ্ধর নাম উস্তাদ রোশন আলি। সুঘরাইকে রোশন আলি জেব থেকে বের করে একটি কার্ড দিলেন। তাতে লেখা, মহম্মদ রোশন আলি, সারেঙ্গি প্লেয়ার, এস এফ এফ।

ছদিবাবু ফিস ফিস করে বললেন, মৎলব নেহি সমঝা, না?

নেহি তো।

সুঘরাই বোকার মতো বলল।

ছদিবাবু হেসে বললেন, স্কুল ফাইন্যাল ফেইল।

মানুষটির মুখে এক স্বর্গীয় জ্যোতি আর এক স্বমহিম হাসি অনুক্ষণ মাখা আছে মুখে। আজকালকার দিনে খুব কম মানুষের মুখে ওরকমটি দেখতে পাওয়া যায়। ভারী ভাল লাগল সুঘরাইয়ের।

গলা বের করল দুলারি বাই। দুলারি বাই বলাই ভাল, সে যখন সুঘরাইদের কাছে সেই ছেলেবেলার মির্জাপুরের শবনম হতে চাইলই না। সঙ্গে সঙ্গে আওয়াজের মিঠাস-এ ঘরের সব খুশবু ম্লান হয়ে গেল। সামান্যক্ষণ আলাপ করেই ভীমপলশ্রীর উপক্রমণিকা করে ধরে দিল গজলটি। পদ পুরা হতেই সুঘরাই আর নাসির দুজনে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল। এ তো জাফরের একটি পরিচিত শের।

"ইন হসরগোঁসে কহদো কেঁহী আওর যা বসেঁ
ইতনী জগহ্ কঁহা হ্যায় দিলেদাগদার মে।"

মানে হল, এবার কামনা বাসনাদের বলো যে, তারা যেন একে একে আমার হৃদয় ছেড়ে চলে যায়। এই ক্ষতবিক্ষত হৃদয়ে তাদের বসতে দেওয়ার জায়গা যে আর নেই।

প্রথমে শবনম ধীরে ধীরে গানের ভাঁজটি জাহির করল। তারপরে ধীরে ধীরে লতাপাতা কেটে সুরের আলপনা দিয়ে জরির কাজের Frill দিয়ে যেন রাগের ছকটি ফুটিয়ে তুলতে লাগল। পরিষ্কার বোঝা গেল যে, গায়িকা অন্যকে শোনাবার জন্যে গান শেখেনি, সে শিখেছে গান, নিজেকেই আনন্দ দেবার জন্য। যে গায়ক বা গায়িকা নিজের আনন্দে গান না গান, তাঁর গান সম্ভবত শেষ অবধি গান হয়ে ওঠে না। প্রত্যেক গায়কেরই হয়তো চোখের মধ্যে একটা সুরের অগ্নিকোণ আছে। সেখানে যদি উত্তাপ দেখা দেয় তা হলেই সুরের ঝড়সৃষ্টি যে কিছু হবেই তা আশা করা যায়। তবে স্নিগ্ধ ঝিরিঝিরি বা ইলশে গুঁড়ি বৃষ্টিও হতে পারে।

"ইন হসরগোঁসে কহদো", এই "কহদো" শব্দটিতে যখন পঞ্চম এসে স্থির এবং কোমল মাধুর্যে প্রতিষ্ঠিত হল, আহা! মনে হল যেন সুরে চিরাগ জ্বলে উঠল। এ আলো বর্ষার অন্ধকারে ঝোপ-ঝাড়ের জোনাকির ঝিকিমিকি নয়, এ যেন বসন্তের পূর্ণিমা। সুঘরাই আর নাসির হতবাক হয়ে তাদের ছেলেবেলার শবনমকে দেখতে লাগল, শুনতে লাগল। সুঘরাই-এর পরজদাদার জন্যে বড় কষ্ট হতে লাগল। আজ

প্রায় পনেরো বছর আগে পরজদাদা ইলাহাবাদের পথে গাড়ি অ্যাক্সিডেন্টে চলে গেছেন। আজ থাকলে এই জল-পাওয়া ফুল-ফলন্ত দুলারি বাইকে নিজ চোখে দেখে নিজ কানে শুনে যেতে পারতেন।

একেকটি সুর এসে শ্রোতাদের নিয়ে যাচ্ছিল বর্তমানের গহীনে আর সুঘরাইদের নিয়ে যাচ্ছিল দিগন্তলীন অতীতে। শব্দের পর শব্দ নিয়ে খেলতে খেলতে এগিয়ে যাচ্ছিল শবনম যেন মধুকর মধু সংগ্রহ করতে করতে আর ছড়াতে ছড়াতে উড়ে চলেছে হালকা শরীর পলকা হাওয়াতে ভাসিয়ে দিয়ে। ধৈবত আর কোমল নিষাদের ঝটিতি নকশা এঁকে শবনম আবার এসে সমাধিস্থ হল পঞ্চমে। "দিলেদাগদার" শব্দে। সেই পঞ্চমের কী রূপ, কী তার স্মৃতি। ভীমপলশ্রী রাগের যত হিরে জহরত সবই হিরের ঝলকানির মতো জাহির করল সে, উজাড় করে দিল পঞ্চমের সঙ্গে নিজেকেও। তারই পরে কখন পঞ্চম আড়ালে চলে গেল, ছোট ছোট ফিরৎ, কোমল ঝটকা মেরে আবার এসে দাঁড়াল শবনম দ্বিতীয় চরণে। মধ্যম, গান্ধার এবং রেখাবও হারিয়ে গেল দেখা দিয়েই তাদের গোপন এবং ক্ষণিক রহস্য জানিয়ে, তারও পর সুর এসে দাঁড়াল স্থির হয়ে। আহা কী ঠাহরান্। সুরের পদ্মটি দুলতে লাগল আবার পঞ্চমের আবেগে, যেন কামনা জরজর সে দুয়া মাঙছে খোদার কাছে, বলছে আরেকবার এসো পঞ্চম, এসে সুধন্য করো, সুধন্য করো।

নাসির বলল, শালা! গান তো নয় তোদের অষ্টমী পুজোর আরতিচক্রই সম্পূর্ণ হল বুঝি!

সুঘরাই চুপ করে রইল। তার বাক্‌রোধ হয়ে গেছিল। ভাল গানবাজনা একা শুনে মজা হয় না। সমঝদার দোস্ত বিরাদরকে পাশে নিয়ে শুনলে সেই গানের মহক পুরোপুরি উপভোগ করা যায়।

গজলটি শেষ হল একসময়ে এসে। তারিফের ঝড়ও একসময়ে শান্ত হয়ে এল।

বাইজির গজল শুনতেই অধিকাংশ মানুষ এসেছিলেন। খেয়াল বা ধ্রুপদ ধামারের সমঝদার ও কারবারি এমনিতেই চিরদিনই কম। কিন্তু এক কোণ থেকে কে যেন বলে উঠল বাগেশ্রী শুনব। তাতে চাপা শোরগোল উঠল ম্যাহ্‌ফিলে।

এমনই সময়ে দেখা গেল অভিষেক সিং তিন-চারজন ইয়ারকে নিয়ে ম্যাহ্‌ফিলে ঢুকল। বড়লোকের প্যায়েরভি করার অভাব কোনওদিনই হয় না। চারধার থেকে কথার ছেড়ছাড় ভেসে এল। অনেকেই তার সঙ্গে দুটি কথা বলে দেখাতে চাইল যে অভিষেক সিংকে তারা চেনে। সবচেয়ে বেশি যা অবাক করল সুঘরাই আর নাসিরকে তা দুলারি বাইয়ের আচরণ। অভিষেক সিং ঢুকতেই শবনম তাকে বারবার কুর্নিশ করল। ছদিবাবুও অবাক হলেন কম নয়। অভিষেকের অতীতকালটার সঙ্গে তাঁর বিলক্ষণ পরিচয় ছিল। তাঁর বাড়িতে, তাঁরই সামনে অভিষেক সিংয়ের এমন খাতিরদারিতে একটু চমকে গেলেন তিনি। পরক্ষণেই বাস্তবকে মেনে নিলেন। তিনি তো কাতরাস-এর ছদি রায় নন আর। এখন অভিষেকের মতো কয়লা মাফিয়ারাই হিরো। চানচানি অ্যান্ড ওড়া, অর্জুন আগরওয়ালা, প্রভুদয়াল আগরওয়ালা, রাহারা, নন্দলাল জালানরাও আজকে পুরোপুরি বিস্মৃত। দিন বদলায়। টাকা যেখানে যায়,

সম্মান, খাতির প্রতিপত্তি সব সেখানেই গড়িয়ে যায়। সে টাকা যেভাবেই উপার্জিত হোক না কেন। আর এই গড়িয়ে যাওয়াটাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিনা প্রতিবাদে দেখতেও হয় এক সময়ের রহিসদের।

নাসির সুঘরাইয়ের বাহু ধরে হঠাৎই, বলল, চল্। হিয়াঁ অওর নহ বৈঠা যায়।

কাহে লা?

অবাক হয়ে বলল সুঘরাই।

চল্, ওঠ।

বলে এক ধাক্কা দিয়ে সুঘরাইকে তুলে শবনমের দিকে একবারও না তাকিয়ে উঠে দাঁড়াল। অভিষেক সিংয়ের দিকেও চাইল না একবারও। শুধু ছদিবাবুর দিকে চেয়ে হাত জোড় করে বলল, ইজাজৎ দিজিয়ে ছদিবাবু। আভি যানাহি পড়েগা। বহতই জরুরি কাম হ্যায়।

খনা? অওর গানা?

ছদিবাবু বললেন।

শেকেগা তো আয়েগা লওটকর। কৌসিস জরুর করেগা।

বলেই, নাসির সুখরাইকে প্রায় টানতে টানতে সমবেত রসিকবৃন্দর হাত পা মাড়িয়েই প্রায় বাইরে এসে দাঁড়াল। শীতের খোলা আবহে জোরে প্রশ্বাস নিল একটা। তারপরই পথের ধুলোতে থুথু ফেলে বলল, হিঁয়া আনাই নেহি চাহিয়ে থা। দিখা তুমনে, তুমহারি বচপনকি পেয়ারিকি হরকৎ?

সুঘরাই বলল, তুইই তো নিয়ে এলি।

আমি কি আর জানি। সব আওরতই সমান। ইয়ে ভি আউর ইক সুরাতিয়া নিকলি।

সুরাতিয়া নাসিরের প্রেমিকা ছিল। দেবদাসের পারুর মতো। তার জন্যেই আজও বিয়ে করেনি নাসির। সুঘরাই বিয়ে করেনি অন্য কারণে। ও বড় ভীরু। ও মেয়েদের চিরদিনই ভয় পেয়ে এসেছে, দাদিমা, মা, ঠাম্মা শেষে শবনম পর্যন্ত সবাইকেই। ও পাখি বোঝে, গাই-বয়েল বোঝে, খেতি-জমি বোঝে কিন্তু মেয়েদের বোঝে না। তাই বিয়ে করেনি। কিন্তু নাসির ছেলেবেলা থেকেই হিরো, মেয়েদের কাছে। সুরাতিয়ার মতো একটা সাধারণ মেয়ে যে তাকে কী করে এমন দাগা দিয়ে গেল তা আজও বোঝে না সুঘরাই। নাসির বলে, কোনও মেয়েই সাধারণ নয়। মেয়েদের সঙ্গে সাপেদের খুব মিল আছে। তবে অমিল একটাই। সাপেদের মধ্যে অনেকেই নির্বিষ কিন্তু আওরৎ মাত্রই বিষধরী।

কী করবি এখন? পটকানকেও তো বাড়িতে বলে এলাম "নো-মিল"।

সুঘরাই বলল।

তাতে কী হল? শবনম তো মিজাজ বিগড়ে দিয়েছিলই তার উপরে ওই শালা অভিষেক সিংকে দেখে মিজাজ আরও বিগড়ে গেল। হায়! হায়! দুনিয়ার কী হাল! আমিও আজকাল বুঢ়া কাম করছি কিন্তু সে একটু ভাল থাকার ভাল খাওয়ার জন্যেই। আমি তো অভিষেকের মতো কামিনা নই।

এখন কী করবি তাই বল?

চল, কানহারির দিকে যাই। সান্নাটা জায়গা। পাহাড়ের উপরের বাংলোতে গিয়ে বারান্দাতে বসে হুইস্কিটা দুজনে শেষ করি, বড় বোতল এনেছি আজ। তারপর পাহাড় থেকে নেমে হান্নানের দোকানে বিরিয়ানি আর চাঁব খেয়ে তোকে নামিয়ে বাড়ি ফিরব। এখন, আমার মাথা গরম হয়ে আছে, গরম বেরুচ্ছে মাথা থেকে। ঠাণ্ডা জায়গাতে চল। সান্নাটা জায়গাতে।

সুঘরাই বলল ঠাণ্ডাতে আমার কানে ব্যথা করছে আর...। তুই দিনকে দিন এক অজীব আদমি বনছিস।

আমি চিরদিনই অজীব। তুইই চিনতে পারিসনি।

নাসির বলল।

নাসিরের মোটর সাইকেলের পেছনে বসে সার্কিট হাউসের সামনে দিয়ে গিয়ে, পুলিশ সাহেবের বাংলো পেরিয়ে কানহারি হিল রোড ধরে কানহারি পাহাড়ের উপরে উঠে যখন ফরেস্ট বাংলোতে পৌঁছানো গেল, ততক্ষণে সুঘরাই জমে বরফ হয়ে গেছে। আর নাসির বলছে, মাথা থেকে গরম ছুটছে আমার। গরম ছুটছে।

চৌকিদার বলল, বাংলা তো রিজার্ভ আছে। বাংলা খুলে দিতে পারব না।

বারান্দাতে বসি তা হলে। দুটো গ্লাস আর এক জাগ জল এনে দাও।

তাও পারব না হুজুর। সিং সাহাব কখন এসে পড়বেন কী করে জানব? তাঁর রিজার্ভ-করা বাংলার বারান্দাতে আপনাদের বসতে দিয়েছি জানলে সাব বিগড়ে যাবেন। ডি এফ এ সাহেবভি জানলে আমার চাকরিই চলে যাবে।

তা হলে?

নাসির বলল।

কী করব! আমি নাচার।

তা হলে এক কাজ করো। গারাজের মধ্যে আমরা বসছি।

তাও পারব না।

তাও পারবে না? তা হলে বাংলোর পেছনে গাছতলাতে বসছি।

গাছতলাতে এখন শিশির পড়বে।

তা হলে?

তা হলে আপনারা আমার কোয়ার্টারের বারান্দাতে বসতে পারেন। তবে মোটর সাইকেলটা এমন করে রাখতে হবে যেন ওঁরা দেখতে না পান।

তাই?

কী যেন ভাবতে ভাবতে বলল, নাসির।

তারপর বলল, তোমার সিং সাব এখানে খাওয়া দাওয়া করবেন না?

না হুজৌর। আমি কি আর তেমন রাঁধি। ওঁদের খাওয়ায় আসবে হাজারিবাগ ক্লাব থেকে।

কখন আসবেন তোমার সিং সাহাব?

দশটার আগেই আসবেন।

উনি কোথা থেকে আসবেন?

কোথা থেকে নয়, তাঁর তো হাজারিবাগেও বাড়ি আছে, গয়া রোডে।

নাম কি সাহেবের?

অভিষেক সিং সাহাব। বহত দিলেরি আদমি। পয়সা ভি হ্যায়, দিল ভি হ্যায়।

তা ওঁর নিজের বাড়ি থাকতে এই রাতেরবেলা এই জঙ্গলের মধ্যে পাহাড়ের উপর সান্নাটা বাংলোতে কী করতে আসবেন? তাও গরমের দিন হলে কথা ছিল।

তা ঠিক জানি না হুজুর। তবে শুনেছি পটনা থেকে কোনও তওয়ায়েফ এসেছে, তাকে নিয়ে আসবেন।

রাত কাটাবেন?

না, রাত তো উনি নিজের বাড়ি ছাড়া কোথাওই কাটান না। মনে হয় ঘণ্টা দুই থাকবেন। এরকম করেন মাঝে মাঝেই।

তা চলো। তোমার কোয়ার্টারেই যাই। এখন বাজল কটা?

সুঘরাই ঘড়ি দেখে বলল, সাতটা।

মোটর সাইকেলটাকে তুলে ঠেলতে ঠেলতে চৌকিদারের কোয়ার্টারের দিকে যেতে যেতে নাসির ফিসফিস করে বলল, আজ খুদানে হামলোগোঁকো হিঁয়া ভেজিন।

আজ কুছ হাঙ্গামা হোগা।

মনে মনে বলল সুঘরাই।

নাসিরের মনের ভাব আর কথা শুনে সুঘরাইয়ের হাত-পা বরফ হয়ে গেল। এমনিতেই তো ঠাণ্ডাতে বরফ হয়েই ছিল।

সুঘরাই বলল, নাসির, ছোড় ইয়ার। চল, হামলোক ভাগেগা হিঁয়াসে। শবনমসে হামলোগোকা কেয়া মতলব?

জাহান্নমমে যানে দো ও রান্ডিকো। উসসে কুছ মতলব নেহি হামারা, মগর বুধিয়া। পটকানকো বহিন?

সুঘরাইয়ের মাথার মধ্যে বিদ্যুৎ খেলে গেল। সেই প্রায় ভুলে-যাওয়া রাগটা হারিয়ে-যাওয়া প্রিয় কুকুরের মতো হঠাৎই ওর মাথাতে ফিরে এল।

সুঘরাই নিচু গলায় বলল, হাঁ। ম্যায়তো ভুলই গ্যয়ে থে।

॥ ৬ ॥

চৌকিদার তার কোয়ার্টারের ঢাকা-বারান্দাতে একটি চেয়ার এবং একটি টুল পেতে সামনে একটা নড়বড়ে তেপায়া লাগিয়ে দিল। তারপর স্টেনলেস স্টিলের জাগে করে এক জাগ জল আর দুটি স্টেনলেস স্টিলের গ্লাস দিয়ে গেল।

নাসির চৌকিদারকে একটি লাল নোট দিল কুড়ি টাকার।

চৌকিদার সেলাম করে বলল, নেহি ভি দেনেসে ক্যা হোতা থা বাবু।

দেনেসে ভি ক্যা হরজ। আগে দেওয়াই তো ভাল। আমরা যে লোক খারাপ নই তার প্রমাণ তো আগেই দেওয়া উচিত।

নাসির বলল।

পইসে সে ক্যা ভালা-বুঢ়া কি যাঞ্চ হোতা হ্যায়?

তব কওন চিজ সে হোতা হ্যায়?

তুমিই না বললে অভিষেক সিং সাহেব বড় ভাল লোক। পয়সাও আছে, দিলও আছে।

দিল কি দেখা যায়? পয়সাই তো দিল এখন।

নাসির বলল।

ঈ বাত সাহি বোলা আপনে।

তোমার নাম কী?

মুকান্দর।

ঘর কোথায়?

বড়কাগাঁও।

ঠিক আছে মুকান্দর, তুমি আরাম করো গিয়ে।

আপনাদের বাড়ি কোথায়?

মুকান্দর জিগগেস করল।

আমার বাড়ি কোররা আর এই বাবুর বাড়ি সিমারিয়া। হাজারিবাগে বেড়াতে এসেছেন বাবু আমার কাছে।

মিথ্যা কথা বলল নাসির।

মুকান্দর শুধোলো।

আপকি শুভ্ নাম?

মহম্মদ জাকির হুসেন।

সুঘরাই-এর হয়ে নাসিরই বলল।

সুঘরাই লক্ষ করছিল যে পরপর এতগুলো মিথ্যে বলতে নাসিরের একটুও কষ্ট হল না। নাসিরটা দু নম্বরী উঠছে দিনকে দিন। এ কথা ভেবে মন খারাপ হয়ে গেল সুঘরাইয়ের। ওর বন্ধু নেইই বলতে গেলে। বউও নেই। নাসির তাই তার কাছে খুব দামি। নাসিরকেও ত্যাগ করতে হলে থাকবে কাকে নিয়ে?

কাঁধের ঝোলা থেকে বোতলটা বের করে খুলল নাসির। দুটো গ্লাসেই বড় করে হুইস্কি ঢালতে ঢালতে, মুকান্দর চলে গেছে কি না দেখে নিয়ে বলল, আজকাল ইমানদারকেই মানুষে বুদ্ধু বলে। দ্যাখ, তোর পেয়ারের শবনম নিজেকে ভাঙিয়ে কত টাকা রোজগার করছে, তার সঙ্গে কত ইজ্জত খাত্তিরও। যদিও ওর ইজ্জত বাজারি। পারচেজেবল। আর নিজের ইজ্জত বিক্রি করতে রাজি না থাকায় বুধিয়াকে মরতে হল। পটকানের কাকার মাথাতে যদি একটুও ঘিলু থাকত তবে বুধিয়াকে ভাড়া দিয়ে সে তার মাটির বাড়ি পাকা করে ফেলতে পারত, অনেক খেতি-জমিন কাঁড়া-বয়েল কিনতে পারত অথচ তা না করে মেয়েটাকেই হারাল। বুধিয়া তো কম সুন্দরী ছিল না।

তা ছিল না।

সুঘরাই বলল।

তারপর বলল, শবনমের মতো গান কজন গাইতে পারে?

গান গেয়েই যা রোজগার করে, যা ইজ্জত পায়, তাই তো ওর রাখার জায়গা ছিল না তবু সে নিজেকে এমন করে ছোট করে যে কেন, তাই ভেবে পাই না।

টাকা আর যশ মানুষকে বড়ই ছোট করে দেয়রে সুঘরাই। যার টাকা আছে সে আরও টাকা চায়, যার যশ আছে সে আরও যশ চায়। এই দুই আকাঙ্ক্ষার কোনও শেষ নেই। "বাস্‌স" করতে জানা বড়লোক আর যশস্বী তুই খুব কমই দেখতে পাবি। তা ছাড়া, আমার কী মনে হয় জানিস, এ সবই শবনম করে হতাশা থেকে।

হতাশা? ওর মতো সফল মানুষের কিসের হতাশা?

সাফল্যও মানুষকে হতাশ করে। যদি কেউ সবই পেয়ে যায়, আর চাইবার মতো তেমন কিছুই থাকে না, তখনই মানুষ হতাশাতে ভোগে।

তাই?

বলল, সুঘরাই। কথাটা এমন করে ভাবিনি তো কখনও।

নেঃ, ভাবাভাবি পরে করিস। এখন খা।

হাজারিবাগ এমনিতেই ঠাণ্ডা জায়গা তার উপরে ওরা চড়েছে কানহারির মাথাতে—

খুদাহর বাড়ির প্রায় কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। ঠাণ্ডাটাও এ বছর জব্বর পড়েছে।

সুঘরাই বড় একটা ঢোক গিলল গ্লাস থেকে। যা কড়া বানিয়েছে নাসির। লণ্ঠনের আলোতে দেখাচ্ছে যেন কাড়ুয়া তেল। ওর পেটের মধ্যে ব্যথা করছে। টেনশনে। কী করবে নাসির, কে জানে। কী ফন্দি সে ফেঁদেছে সেই জানে। ও কি আজ জানেই মেরে দেবে অভিষেক সিংকে? নাকি একটু টাইট দিয়েই ছেড়ে দেবে? অভিষেক সিংয়ের সঙ্গে নাকি সবসময় বডিগার্ড থাকে। সেই বডিগার্ড যদি মেরে দেয় ওদের ওরা কিছু করার আগেই? নির্বিরোধী, শান্তিপ্রিয় সুঘরাই বড় ঝামেলাতেই পড়ল।

নাসির এক ঘুঁট খেয়ে বলল, কী ভাবছিস?

না। তুই কী ভাবছিস, তাই ভাবছি।

আগে থেকে আমি কিছুই ভাবি না। যেমন যেমন সময় এগোবে তেমন তেমন ভাবব। তার আগে বাইকটার সামনে-পেছনের নাম্বার প্লেটে এই কালো মার্কারটা ঘষে নাম্বার যাতে পড়া না যায় তেমন করে দিয়ে আয় তো। দেখিস, চৌকিদার যেন না দেখে ফেলে।

বাবাঃ। তুই তো দেখছি আজকাল পাক্কা দু-নম্বরী হয়ে গেছিস।

আমি কোথায় হলাম। দুনিয়াই যে দু-নম্বরী হয়ে গেল তাই আমাকেও জার্সি পালটাতে হল।

কটায় আসবে বলল ওরা এখানে? চৌকিদার?

সাড়ে নটা মতো তো বলল।

আগেও তো আসতে পারে।

তা তো পারেই। কাম একবার চেগে গেলে আর কি তর সয়?

এখন কটা বাজে?

সাড়ে সাত।

আমরা এখান থেকে সাড়ে আটটায় উঠব। না, তারও আগে উঠব।

মানে? কোথায় যাব?

পাহাড় থেকে নেমে জিব্রাল্টার বাড়ির কাছে পথের পাশে ওদের অপেক্ষায় থাকব। জায়গাটা অন্ধকার। শীতের রাতে জনপ্রাণী থাকবে না। চৌকিদারও ঘটনার পরে কোনও সন্দেহ করতে পারবে না। কারণ, ও কিছু বুঝতেই পারবে না এত দূর থেকে। গুলিটুলি চললে অবশ্য গুলির শব্দ শুনতে পাবে। কোররার দিক থেকেও তো কেউ আসতে পারত। পুলিশও ধন্দে পড়বে।

কী, কী, কী করবি কী তুই?

ভয় পেয়ে সুঘরাই বলল। গুলিটুলি চললে মানেটা কী?

দেখি কী করি। ওয়াক্তপর শোচেগা। তোকে যা বলব তুই তাই করবি। ওদের গাড়ি আসতে দেখলেই তোর মাফলারটা দিয়ে মাথা মুখ এমন করে বাঁধবি যাতে রাজডেরোয়া ন্যাশানাল পার্কের হনুমানে আর তোতে তফাত না থাকে কোনও।

আর তুই?

আমার মুখোশ আছে।

মু-মু-মুখোশ? তুই আজকাল মুখোশ নিয়ে ঘুরছিস নাকি?

হ্যাঁরে ছুঁওড়াপুত্তান। একটা কেন? আজকাল সব ইনসানেরই একাধিক মুখোশ থাকে। যখন যেটার দরকার সেটা পরে নেয়। তারা সব ছুপা। আমার কতো মুখোশের কথা কেউই কবুল করে না।

সুঘরাই চুপ করে রইল। তারপর নাসির যা করতে বলেছিল তাই করে এল।

নাসির ওর গ্লাসটা শেষ করে আরেকটা বড় ঢালল। সুঘরাই ঘাবড়ে গিয়ে বলল, করছিস কী? তুই তো আউট হয়ে যাবি। এ দিকে সাংঘাতিক কাণ্ডমাণ্ড ঘটাতে চলেছিস।

হাঃ। আমি সবসময়েই ইন। আউট কখনওই হই না আমি। আই অ্যাম ওলয়েজ অ্যামংগস্ট ইন থিংগস। বলেই বলল,

"ও অওর হোঙ্গে যো পীতে হ্যায় বেখুদিকে লিয়ে।

মুঝে স্রিফ চাহিয়ে থোরিসি জিন্দেগিকে লিয়ে।"

অর্থাৎ, ওরা মদ খায় জীবনকে ভুলে থাকতে আর আমার সামান্যই চাই, জীবনকে মনে রাখারই জন্যে।

সুঘরাই ভিতরে ভিতরে খুব উত্তেজিত বোধ করতে লাগল বলেই বাইরে একেবারে ঠাণ্ডা মেরে গেল।

সুঘরাই বলল, তুই মিছিমিছি অপমান করলি নিজেকেও এবং আমাকেও।

কী জন্যে? কার কাছে?

শবনমের সঙ্গে আলাদা করে দেখা করতে চেয়ে ছদিবাবুর বাড়িতে। সে তো

আমাদের যেন মনেই করতে পারল না অথচ পরজদাদা কত কীই না করেছে ওর জন্যে।

ছাড়তো। রান্ডি তো রান্ডিই। ও শালীরা মান দিলেই কী আর অপমান দিলেই কী? আমাদের অপমান করল আর মান দেবে অভিষেক সিংকে। নইলে কি রান্ডি এমনি বলে।

আমার ভাবতেও খারাপ লাগছে। যে মেয়ে এত সুন্দর গান গায়, যার গান শুনলে প্রাণ দিতেও আপত্তি থাকে না আর সেই কি না ....

ছাড়। আওরাত জাতটাই অমন। কলকাতায় বা বম্বেতে বা চেন্নাইতে কত নামীদামি অভিনেত্রী, পরিচালিকা আছে। সারা পৃথিবী থেকে সম্মান আনছে তারা। তাদের রূপ-গুণের অবধি নেই, বহত বহত পড়ে-লিখেও তারা। কিন্তু তাদের মধ্যে অনেকেই রান্ডি। সতী সেজে থাকে শালীরা।

কথাটা শুনে সুঘরাই আহত হল।

পাহাড়ের নীচ থেকে একটা কোটরা হরিণ ডাকতে লাগল ঘনঘন।

কী রে। বাঘ দেখল নাকি?

সুঘরাই বলল।

দেখল তো দেখল। আসল বাঘ তো দেখিনি। আমি নামি নীচে তখন আসল বাঘ দেখবে।

বাজল কটা?

নাসির বলল।

সুঘরাইয়ের ঘড়িতে রেডিয়াম আছে, তা ছাড়া ইন্ডিগ্লোও আছে। নাসিরই দিয়েছিল ঘড়িটা সুঘরাইকে গত বছরের সালগিরাতে। চাবি টিপে ও বলল, আটটা দশ।

তা হলে চল এবারে আমরা আস্তে আস্তে নামি। এক কাজ কর। আরেকটা করে খেয়ে নে। তারপর বোতলের মধ্যে জল মিশিয়ে নিয়ে যাব। বোতল থেকেই খাব। ওখানে আর জল কোথায় পাব? গ্লাসই বা কোথায়?

যেমন বলবি।

নাসির আবার সেজে দিল। চুমুক দিতেই লিভারে যেন কামড় দিল হুইস্কিটা। দোষটা হুইস্কির নয়, নাসির সেজেছেই ভীষণ কড়া করে।

সুঘরাই মুখ বিকৃত করল।

তারপর বলল, কী রে! মওত-এর স্বাদ কি তোর সেজে দেওয়া হুইস্কিরই মতন?

তুই যেন শালা কত বার মরেছিস আগে।

মরিনি। কিন্তু মৃত্যু কান ঘেঁষে বেরিয়ে গেছে বহুবার। মনে আছে তোর? নাজিম মিয়াঁর কুসুমভার মাটির ঘরে তোর রাইফেলের গুলি লোড করার সময়ে আমার কানের পাশ ঘেঁষে গিয়ে দেওয়ালে গর্ত করে দিয়েছিল?

মনে আছে। ম্যান-ইটিং লেপার্ডটাকে মারতে গেছিলাম আমরা যেবারে, সে বারে তো?

জি হ্যাঁ।

তারওপর আরও কত বার।

আমি তো নাগরদোলাতেই পড়ে আছি রে সুঘরাই পনেরো বছর বয়স থেকে। জীবন আর মৃত্যুর হাতে দোল খেয়েছি। দোল খাচ্ছি। আই ওলওয়েজ হ্যাড লিভড ডেঞ্জারাসলি। প্যানপ্যান করে বেঁচে কী লাভ? বাঁচলে এমন করে বাঁচাই ভাল।

বলেই বলল, নে, শেষ কর।

বলেই, জাগ থেকে বোতলের মধ্যে জল ঢেলে বোতলটা ভর্তি করে নিল নাসির। তারপর নিজের থলেতে ভরে নিল। বলল. চৌকিদার মুকাদ্দরকে ডাক তো একবার।

চৌকিদার এলে আরও একটা লাল নোট দিল কুড়ি টাকার।

চৌকিদার হেসে সেলাম করল।

নাসির বলল, আমরা তো তোমার সিং সাহেবের মতো বড়লোক নই, হলে একশ টাকার নোট দিতাম।

সিং সাব আমাকে পাঁচশ টাকার নোট দেন একটা, যখনই আসেন।

নাসির বলল, খ্যয়ের, আমিও দেব পরের জন্মে। এবারে আমরা উঠি। বাড়িতে শশুরাল থেকে মেহমানেরা সব আসবেন। বেশি দেরি হলে গোলমাল হবে। আমার বিবির আবার এ সব একেবারে না-পসন্দ।

কী সব?

এই পিনা-উনা।

চৌকিদার মুকাদ্দর হেসে বলল, আমার বিবিরও। তবে আমি খাই মহুয়া। এ সব ভাল জিনিস কোথায় পাব? তবে হ্যাঁ! মিথ্যে বলব না, সিং সাহেব বোতলে যা থাকে তা আমাকে দিয়ে যান। কী সব শিশি হুজৌর। সেই সব শিশি পেয়ে বিবি আমার, আমার মদ খাওয়ার অপরাধই ক্ষমা করে দেয়। আসলে সব সাপকেই বশ মানানো যায়, যদি মন্ত্র জানা থাকে।

সাহী বাত্।

বলে, নাসির উঠল।

তারপর বলে, অব চলে মুকাদ্দর সাব। বহত মেহেরবানি আপকি।

সাব সম্বোধনে মুকাদ্দর অভিভূত হয়ে বলল, আপকি খানদান জরুর্ বহত উঁচা হোগি। অ্যয়সি এতলাখ অওর তমদ্দুন।

নাসির উত্তর দিল না কোনও। সুঘরাই নাসিরের পেছন পেছন চলল মোটর সাইকেলের দিকে, হাত তুলে মুকাদ্দরকে সেলাম এবং নমস্কারের মাঝামাঝি একটা কিছু করে। এই ব্যাপারটা ঘটল নাসিরেরই অনুপ্রেরণাতে।

মোটর সাইকেল স্টার্ট করে পাহাড়চুড়ো থেকে নামতে নামতে নাসির বলল, যার যা স্ট্যাটাস তাকে তার চেয়েও এক ধাপ বেশি সম্মান দিলে সে সঙ্গে সঙ্গে বান্দা বনে যাবে। হ্যাঁ, যদি ইনসান হয়। আর অভিষেক সিংয়ের মতো কামিনা হলে আবার উলটো ফলও ফলতে পারে।

বলেই বলল, আজ সকাল কার মুখ দেখে উঠেছিলিরে সুঘরাই?

কেন?

না, কানহারিতে হুইস্কি খেতে এসে আমাদের নিয়তির মুখোমুখি এসে পড়লাম কী করে তাই ভাবছি।

সুঘরাই একটু ভেবে বলল, একটা কাঠবিড়ালির। ও আমার দোতলার ঘরের লাগোয়া ছাদেই থাকে।

হাঃ। হাঃ। করে হাসল নাসির।

বলল, যেমন তুই এক ক্যারেকটার তেমনই তোর সাথ-সঙ্গতিয়ারা।

পাহাড় থেকে নেমে এসে কানহারি হিল রোডে জাস্টিস মল্লিকদের প্রাগৈতিহাসিক প্রাসাদের মতো ভৌতিক বাড়ি 'জিব্রাল্টর'-এর পাশে মোটর সাইকেল দাঁড় করাল নাসির। তারপর বলল, নে, খা। বোতলটা শেষ করতে হবে। প্রাণে যদি না বাঁচি তবে তো আর হুইস্কি খাওয়া হবে না কোনওদিনও।

সুঘবাই বলল, বাজে কথা রাখ।

বাজে কথা কী রে! একজন মানুষের প্রাণের উন্মেষ আর তার মৃত্যুর মতো এত সহজ ব্যাপার আর দুটি নেই। বলতে গেলে, সহজতম ব্যাপার। আর এই মানুষেরই কত না গুমোর তার জীবন-মরণ নিয়ে। ফুসস-স-স।

বোতল থেকে এক ঢোক খেয়ে বোতলটা নাসিরকে ফেরত দিয়ে সুঘরাই বলল, আমি আর খাব না।

কেন?

আমি পারি না।

তুই শালা কিছুই পারিস না।

হবে।

স্বগতোক্তির মতো বলল, সুঘরাই।

শীতের বনের রাতের এক বিশেষ গন্ধ আছে। শিশির-ভেজা হরজাই গাছপালার, পথের ধুলোর, বিস্তীর্ণ টাঁড়ের, টিটি পাখির, পেঁচার গায়ের গন্ধ মিলে-মিশে এক আশ্চর্য তিক্ত-মিষ্টি-কষায় গন্ধ। এই গন্ধে এক ধরনের যৌনতা আছে—যা ব্যাখ্যা কবে বলতে পারবে না সুঘরাই। কিন্তু বিলক্ষণ আছে। ডানদিকের টাঁড়ের উপরে চমকে চমকে ডাকছে দুটি ডিড-ড্য-ডু-ইট পাখি। ডিড-ড্য-ড-ইট? ডিড-ড্য-ড-ইট? ডিড-ড্য-ড-ইট? সেই ডাক ভেসে যাচ্ছে দূর থেকে দূরান্তরে, উঠে যাচ্ছে তারাদের দিকে। গাছপালা থেকে শিশির ঝরছে। বছরের এই সময়ে রাতেরবেলা বাঘ ও চিতা বনের মধ্যে প্রধান পথ ধরে চলাচল করে শিশিরের হাত থেকে বাঁচতে। নাসিরও দেখেশুনে এমন জায়গাতে মোটর সাইকেলটা লাগিয়ে ছিল যেখানে উপর থেকে শিশির ঝরছে না। নাসিরও তো বাঘই। দেখতে দেখতে সাড়ে আটটা বেজে গেল। সুঘরাই একবার ঘড়ি দেখল। এমন সময়ে একটা গাড়ির আওয়াজ শোনা গেল। এ পথে ও সময়ে এখন কোনও গাড়িরই যাওয়া-আসার কথা নয়। ওদের ছেলেবেলাতে ওরা রাতেরবেলা এখানে খরগোশ মারতে আসত। জিব্রাল্টরের অব্যবহৃত কম্পাউন্ডে অগুনতি খরগোশ ছিল।

ভাল করে কানখাড়া করে শুনতেই বোঝা গেল গাড়ির শব্দটা কোররার দিক

থেকে আসছে। গাড়ির হেডলাইটের আলো দেখা যেতেই দুজনেই বাইক থেকে নেমে এমন ভাবভঙ্গি করল যেন বাইকটা খারাপ হয়ে গেছে। গাড়িটা একটা অ্যাম্বাসাডর। অভিষেক সিং কোন গাড়ি নিয়ে আসবে তা জানা নেই। কোন গাড়ি নিয়ে সে গান শুনতে গেছিল সেটা খেয়াল করা উচিত ছিল। তখন তো আর জানত না যে, ওরা কানহারিতে এসে ওর সঙ্গে টক্কর দেবে। যে গাড়িটা এল, সেটা পাহাড়ে না চড়ে হাজারিবাগ শহরের দিকে এগোল। ওদের পাশে এসে এক সেকেন্ড দাঁড়িয়েই এই খারাপ দিনকাল-এ রাতেরবেলা ঝুঁকি নেওয়াটা ঠিক হবে না মনে করেই বোধ হয় হঠাৎ গতি বাড়িয়ে চলে গেল। গাড়িটার এঞ্জিনটার বারোটা বেজে গেছে। পেট্রোলের গন্ধে বনপথের সুগন্ধ বিকৃত হয়ে গেল।

ওই গাড়িটা চলে যাবার পরেই হাজারিবাগ শহরের দিক থেকে একটি গাড়িকে আসতে দেখা গেল। উজ্জ্বল দুটি নিচু হেডলাইটের আলোই বলে দিল যে অ্যাম্বাসাডর নয়, নতুন কোনও গাড়ি। আলো দেখতে পেতেই কালো কাপড়ের মুখোশটাকে কপালে লাগিয়ে নাসির বাইকটাকে ঠেলে পথের মধ্যিখানে এনে তার পাশে হাঁটুমুড়ে বসে পড়ল। সুঘরাই পাশে দাঁড়িয়ে রইল। গাড়িটা ব্রেক করে দাঁড়াল। হেডলাইট-জ্বলা অবস্থাতেই সামনের বাঁদিকের দরজা খুলে গেল। একজন বেঁটেখাটো লোক নেমে এসে বলল, হুয়া ক্যা?

খরাব হো গ্যয়া।

নাসির বলল।

খরাব হো গ্যয়া তো সাইড করকে রাখনা চাহিয়ে থা। ঈ ক্যা মজাক হো রহ্যা হ্যায়?

নাসির বলল, বড়া তেজ বাতেঁ কর রহা হ্যায় আপনে। ঈ গাড়ি হ্যায় কিসকো?

অভিষেক সিং সাবকো।

আচ্ছা! অভিষেক সিং পহচানতা হ্যায় মুঝকো, জারা সালাম দেনা উনকো। মেহেরবানি করকে।

আপকি শুভনাম?

ম্যায় হুঁ অভিষেক সিং কি মওত।

ইতিমধ্যে গাড়ির পেছনের দরজা খুলে গেল। শবনমের সুরেলা গলা শোনা গেল, মৎ উতারিয়ে, আপ উতারিয়ে মৎ। কিন্তু প্রায় ছ ফিট লম্বা অভিষেক সিং গাড়ির দরজা খুলে নেমে এগিয়ে আসতে আসতে বলল, রে ভিখু, ঈ কওন বদতমিজ আদমি হ্যায়? মুঝকো জানতে নেহি হ্যায় যে রোডকি বিচমে বাইক উঠাকে মজাক কর রহা হ্যায়।

অভিষেক এগিয়ে আসতেই নাসির গুটোনো মুখোশটা নামিয়ে কোমরের হোলস্টার থেকে নাইন পয়েন্ট ফাইভ কোল্ট পিস্তল বের করে দমাদ্দম তিনটে গুলি করল। আর সঙ্গে সঙ্গে, মাঈরে! বলে অভিষেক পথের উপরেই পড়ে গেল, চারদিকের পথের ধুলোতে তার ঘামন্ড ছড়িয়ে ছিটিয়ে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ভিখু নামের বেঁটে লোকটি তার কোমর থেকে রিভলভার খুলে নিয়ে পরপর দুবার গুলি করল

নাসিরকে। নাসির এবং ভিখু দুজনেই পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে গুলি করেছিল। নাসির পড়ে যেতে যেতে বলল, বিন্দাআস.....।

সুঘরাইয়ের হুঁশ হয়েছে ততক্ষণে, সেও তার রিভলভার বের করে ভিখুকে গুলি করল তার মাথাতে। ভিখু কিছু বোঝার আগেই। ভিখু সুঘরাইকে ট্যাড়স ঠাউরেছিল। এক পটকান দিয়ে ভিখু পথের উপরে পড়ে গেল চিৎপটাং হয়ে।

তার রিভলভার হাতেই ধরা রইল।

ইতিমধ্যে অভিষেক সিংয়ের ড্রাইভার তাড়াতাড়ি গাড়ি ব্যাক করে শহরে ফিরতে যেতেই সুঘরাই ড্রাইভিং সিট লক্ষ করে গুলি চালাল। কাচ গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ঝরে পড়ল আর ভিতর থেকে শবনম আর্ত চিৎকার করে উঠল, বাঁচাও! বাঁচাও! ডাকু হ্যায়। বাঁচাও! বলে।

সুঘরাই রিভলভার হাতে গাড়ির দিকে এগিয়ে গিয়ে সামনের বাঁ দিকের দরজা খুলে মুখ ভিতরে করে বলল, চুপ হো যা রান্ডি! আঁখ খোলকর দিখ তেরা ডাকু আয়া। মির্জাপুর কি ডাকু। তেরি বচপন কি ডাকু। বলেই, পরপর দুটি গুলি করল শবনমের সুন্দর দুটি বুক লক্ষ করে।

ড্রাইভারের হুঁশ ছিল না। তবুও সাবধানতার মার নেই ভেবে তার মাথাতে নল ঠেকিয়ে আরেকটি গুলি করল সুঘরাই। বাকি ছিল একটি গুলি। সেটিও অভিষেক সিংয়ের কানে নল ঠেকিয়ে তাকে শেষ নৈবেদ্য দিল।

তারপর?

তারপর কী করবে তা আর ভেবে পেল না সুঘরাই। বোতলে যেটুকু হুইস্কি ছিল ঢকঢকিয়ে খেয়ে গাড়ি থেকে ড্রাইভার আর শবনমের দেহ নামিয়ে পথের উপরে ফেলে নাসিরকে অভিষেকের গাড়িতে তুলে সে তাদের ছেলেবেলার বন্ধু ডাক্তার গিরধারী তিওয়ারির বাড়ির দিকে চলল যত জোরে পারে গাড়ি ছুটিয়ে। সুঘরাই ভাবছিল, নাসির যদি মরে গিয়ে থাকে তো বেঁচে গেছে।

সুঘরাইও হয়তো অন্যরকম বাঁচা বেঁচে যেতে পারত যদি সে মোটর সাইকেলটি নিয়ে পালিয়ে যেত। কিন্তু ভাবল, যদি নাসিরের দেহে প্রাণ থেকে থাকে? দেখা তো যাক। ফেলে-যাওয়া মোটর সাইকেলটিই তার ইন্তেকাল ঘটাবে। যাবজ্জীবন জেলে পচতে হবে সুঘরাইকে। কিন্তু রামজির দিব্যি, সেই মুহূর্তে তার একটুও ভয় করছিল না। কিছু তো করল তবু জীবনে। তার ম্যাদামারা জীবনে একটা কাজের মতো কাজ করল।

বুধিয়ার মুখটি মনে পড়ছিল, বুধিয়ার মা ও বাবার মুখ এবং পটকানের মুখও। ভারী এক তৃপ্তি লাগছিল সুঘরাইয়ের। আশ্চর্য। বুধিয়ার মুখটি মনে পড়ছিল কিন্তু শবনমের মুখটি আর মনে পড়ল না। তার এক সময়ের বড় আদরের সেই মুখটি মুছে গেছে চিরদিনের মতো।

গাড়ি চালাতে চালাতে সুঘরাই ভাবছিল, নাসির যদি এখন কথা বলতে পারত, তা হলে চেঁচিয়ে বলত, বিন্দাআস.....।

সুঘরাই নিজের অজানিতেই বিড়বিড় করে স্বগতোক্তি করল, বিন্দাআস।/

পাখিরা জানে

আর বড়জোর আধঘণ্টা। সামনের উলঝি সাব-স্টেশনের সিগন্যালে যদি না আটকায় তবে হৃদয়পুরে ট্রেন পৌঁছে যাবে আর আধঘন্টার মধ্যে।

তকাই বলল, তার হাত ঘড়ির দিকে চেয়ে।

অনিকেত নিজের হাতঘড়ির দিকে চেয়ে দেখল প্রায় বারোটা বাজে। বড় জংশনে গাড়ি বদল করেছিল সকাল নটাতে। তারপর বিহার ছেড়ে পশ্চিমবাংলায় ঢুকে আবারও বিহারে ঢুকেছিল কি না তা ও বলতে পারবে না। কারণ, হাইওয়েতে যেমন বোর্ড থাকে, 'উ্য আর লিভিং বিহার অ্যান্ড এনটারিং ওয়েস্ট বেঙ্গল কি ওড়িশা' এবং 'ওয়েলকাম'—সে রকম কোনও বোর্ড-টোর্ড তো থাকে না রেলের ট্র্যাকে তাই নিত্য-যাত্রী ও অভিজ্ঞরা ছাড়া অন্যের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয় কোথা দিয়ে চলেছে ট্রেন। আমাদের দেশের তো বটেই পৃথিবীর অনেক দেশেই এক রাজ্য বা এক দেশ থেকে অন্য রাজ্যে পৌঁছলে তাৎক্ষণিক কোনও ভৌগোলিক তফাত চোখে আদৌ পড়ে না।

কী রে। খিদে পেয়েছে নাকি? ভেটকু? অনিকেতের ডাক নাম ভেটকু। তবে সে নামে খুব অল্প মানুষই ডাকে তাকে।

পেয়েছে। তবে তেমন কিছু নয়।

চল। পৌঁছে গেলে স্টেশন থেকে মামাবাড়ি পৌঁছতে বড়জোর মিনিট কুড়ি-পঁচিশ লাগবে। ছোটমামা নিশ্চয়ই আসবেন স্টেশনে তাঁর পক্ষীরাজ নিয়ে।

পক্ষীরাজ মানে?

মানে, ছোটমামার জিপ গাড়ি। এখন ছোটমামার। আগে দাদুর ছিল। নাইন্টিন ফিফটিতে আমেরিকান ডিসপোজাল থেকে দাদু কিনেছিলেন। তখন দাদুর শিকারের সখ ছিল। আর তখন এই সমস্ত অঞ্চলেই তো ঘন বন ছিল। পাহাড়, নদী আর পশু-পাখিও ছিল অনেক। চাষাবাদই করা যেত না তাদের উৎপাতের জন্য। তখন শিকার করতে হত বাধ্য হয়ে, প্রাণ ও ধন রক্ষারই জন্য। অতএব, তা দোষের ছিল না। দাদুর মৃত্যুর পরে দাদুর প্রিয় ছোট ছেলে ওয়ারিশন হয়েছে ওই জিপ গাড়ির। একটা আকাশি-নীল রঙা রোভার ছিল, একটা উলসলি গাড়ি, কনভার্টিবল। মানে, ছাদ সরানো যেত। সে সব অন্য মামারা পেয়েছিলেন। দাদুকে আমি দেখিনি। চল্লিশ বছর আগে দাদু মারা গেছেন। তার এক বছর পরে আমার জন্ম। এসবই মায়ের কাছেই শোনা।

ছোটমামা ওই জিপ নিয়েই খুশি। চাষাবাদ এখনও ছোটমামাই সব দেখেন। বিয়ে-থা করেননি। জিপটাকে এখনও এত আদরে রেখেছেন যেন মনে হয় তৃতীয়

পক্ষের বউ। নিজেকে বলেন 'শিক্ষিত চাষা'। বেনারস ইউনিভার্সিটির ইংরেজির এম এ। উর্দু শের-এর রসিক। ভারি ইন্টারেস্টিং মানুষ। আমাদের চেয়ে বয়সে কম করে কুড়ি বছরের বড় হলেও তোর মনে হবে যেন তোর সমবয়সি বন্ধু।

তোর ছোটমামার নাম কী?

ভবতোষ চাটুজ্যে।

তকাই বলল।

তারপর বলল, ছোটমামার নাম ভবতোষ, মেজমামার নাম মহীতোষ আর বড়-মামার নাম আশুতোষ। এই সব 'তোষামোদী' সবই দাদুর কীর্তি। তিনি ছিলেন দেবতোষ। সেটাও ঠাকুর্দার কুকীর্তি।

আর দেবতোষের মেয়েদের নাম? তাও কি সব তোষ দিয়ে?

ভেটুক শুধোল।

বলছি। আশুতোষ মুখুজ্যেদের দেখে টুকলিফাই করেছিল বড়মামা। ওই পরিবারেও যেমন সকলেই হয় 'প্রসাদ' নয় 'তোষ' আমার মামাবাড়িতেও তেমনই। মেজমামা এক সময়ে কাজ করতেন কলকাতার সায়েবদের কোম্পানি ম্যাকিনটোশ অ্যান্ড বার্ন-এ। তাঁর খাস কাজের লোকের নাম ছিল মক্কিচোস। লোকে বলত, হৃদয়পুরের চাটুজ্যেরা নিজেরা তো বটেই, তাদের মনিব এবং চাকরদের এই প্রসাদ আর তোষে-চোষে মুড়ে রেখেছে।

অনিকেত হাসল।

বলল, ইন্টারেস্টিং তো।

আর মেয়েদের বেলা? মেয়েদের নাম বললি না?

তারা সব 'দায়িনী'। শুধু মেয়েরাই নন, নাতনীরাও। প্রাণদায়িনী, মানদায়িনী, প্রেমদায়িনী, এরকম। ভাগ্যিস কারওর নাম প্রাণঘাতিনী রাখেননি। শুধুমাত্র বড়মামার ছোট মেয়েই বিদ্রোহ করেছে। সে তার স্কুল-ফাইন্যাল পরীক্ষার আগে কারওকে না জানিয়ে কলকাতার এক নোটারি পাবলিক-এর কাছে গিয়ে অ্যাফিডেভিট করে নাম পাল্টে করে নিয়েছে হিমিকা।

তার অরিজিনাল নাম কী ছিল?

প্রেমদায়িনী।

জাস্ট ভেবে দ্যাখ। কলকাতাতে প্রেসিডেন্সিতে পড়ার কথা ছিল, পড়েওছিল। কোনও মেয়ের নাম যদি প্রেমদায়িনী হয় কো-এড কলেজে, তবে তার ঝক্কির কথাটা একবার ভাবত।

হিমিকা! সে তো আরও কিম্ভূত নাম।

অনিকেত বলল।

কেন কিম্ভূত নাম কেন? তুই তো ইলেকট্রনিক্সের এঞ্জিনিয়ার, তুই বাংলা ভাষার কোনও খোঁজই রাখিস না তাই এমন কথা বলছিস। কম্পিউটার-সর্বস্ব তোরা। মাতৃভাষাকে পর্যন্ত বরবাদ করে দিলি। ছ্যাঃ।

মানেটা বল না, আজেবাজে না বকে। তোর চেয়ে ভাল বাংলা জানি আমি।

হিমিকা মানে হচ্ছে কুয়াশা। হিমিকা তো সিম্পল নাম, এ বাড়ির ট্রাডিশন অনুযায়ী ও তো নাম রাখতে পারত নিজের কুজ্ঝটিকাও।

তা অবশ্য ঠিক।

অনি বলল।

বলেই বলল, এই গাছগুলো কী গাছ রে? বড় বড় গাছ, কী সুন্দর সব ফিনফিনে মসৃণ বড় বড় ফুলে ভরা। আর ফুলগুলোর রঙই বা কী সুন্দর। এই লালকে তো গেরুয়া লাল, লামা লাল, সিঁদুরে লাল, ভগুয়া লাল, কিছু বলেই ব্যাখ্যা করা যায় না।

এতো মাছের রক্ত-ধোয়া জলের মতো লাল।

সাব্বাস!

তকাই বলল।

অনেক লালের কথা শুনেছি আমি আমার আর্টিস্ট বন্ধু সুমন্ত্রর কাছে কিন্তু 'মাছের রক্ত-ধোয়া লালের' কথা কোথাও শুনিনি। 'চাল-ধোয়া জলের মতো সাদা' শুনেছি, 'ফলসার মতো বেগুনি' কিন্তু নাঃ...

গাছগুলোর নামটা বলবি।

অনি এবারে বিরক্ত হয়ে বলল।

এই গাছগুলোর নাম কুসুম। রবীন্দ্রনাথের গানে আছে না? 'কুসুমবনেতে'।

এগুলোই কুসুমগাছ?

ইয়েস, মিস্টার ভেটকু।

এত বড় বড় গাছ হয়?

ইয়েস। আর ফর ইওর ইনফরমেশন, ওগুলো ফুল নয়, পাতা।

পাতা! বলিস কী রে?

ইয়েস। নতুন পাতা। এগুলোকেই বলে, কিশলয়। 'বনময় ওরা কার কথা কয় রে'। এই গানও শুনিসনি?

তুই সব গুলিয়ে দিস না তকাই। এক এক করে বল।

কী আর বলব বল। বছরের এ সময়টা কী তা জানিস?

মার্চের মাঝামাঝি। বাংলা মাসের কথা জানি না।

খুব গর্বের কথা। মাসটা চৈত্র। 'চৈত্রপবনে মম চিত্তবনে বাণীমঞ্জরী সঞ্চলিতা ওগো ললিতা' শুনিসনি? সেই চৈত্র।

কিন্তু এ হল বসন্ত ঋতুও। তুই তো জল-বসন্ত ছাড়া অন্য বসন্ত কিছু দেখিসনি। আসল বসন্ত তো আজকাল ভদ্রলোকদের হয় না। এই হৃদয়পুরের মানুষদের কাছে আসল বসন্তের নাম চীচক্। মায়ের কাছে এখন শুনেছি যে, যে 'মায়ের দয়া' হলে তখনকার দিনে বাঁচাই কঠিন ছিল। তবে অনেকে বেঁচেও যেত। কিন্তু এই বসন্ত ঋতু যদি তোকে তেমন করে আক্রমণ করে তবে বাঁচার কোনও সম্ভাবনাই নেই। এ চীচক্-এর বাবা। এ তো আর তোদের দক্ষিণ কলকাতার রাসবিহারী অ্যাভিন্যু নয়। জায়গার নাম হৃদয়পুর। সময়ের নাম বসন্ত, মাসের নাম চৈত্র, এবং পক্ষর

নাম শুক্ল। তুই এবারে মানে মানে প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারলে হয়। ফুল, পাখি চাঁদ এরাই হচ্ছে ওই বসন্তর দূত।

দমদম এয়ারপোর্টের কাছেও তো হৃদয়পুর বলে একটা জায়গা আছে।

অনি বলল।

জানি না। থাকতে পারে। তবে হৃদয়ে হৃদয়ে তফাত যেমন থাকে তেমন হৃদয়পুরে হৃদয়পুরেও তফাত থাকে। কোথায় আমাদের মামাদের হৃদয়পুর আর কোথায় ধ্যাড়ধ্যাড়ে গোবিন্দপুর। ছাড় তো!

সেটা কী আবার? পক্ষই বা কী? শুক্লই বা কী?

ধন্যি বাঙালি! শুক্লপক্ষ কৃষ্ণপক্ষর নামও শোনোনি। পূর্ণিমা অমাবস্যা? কেন? তোর দাদুর বাত বাড়ে না পূর্ণিমা অমাবস্যাতে?

ঠিক বলেছিস তো। দাদু বলতেন বটে, ওরে ভেটকু, আজ কি অমাবস্যা? দাদুরে আমার, পা-টা একটু টিপে দিবি? পা-টা যে চিবিয়ে খেয়ে নিলে রে!

হ্যাঁ। তবে তো জানিসই। পূর্ণিমার আগে চোদ্দদিন শুক্লপক্ষ আর অমাবস্যার আগের চোদ্দদিন হল কৃষ্ণপক্ষ। বুয়েচ?

তা শুক্লপক্ষের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কী?

সম্পর্ক ছিল না। এবারে হবে। ফুরফুর করে বসন্তর হাওয়া দেবে যখন, মহুয়া আর করৌঞ্জ এবং আরও কত নাম না জানা বনফুলের গন্ধ বয়ে আনবে, যখন হলুদরঙা চাঁদটা উঠবে ভালু-টোংড়ি পাহাড়ের গায়ে শাল আর কুসুমবনের মাথাতে, পিউ-কাঁহা বুকের মধ্যে বারে বারে চমক তুলে 'পিউ কাঁহা' করে ডাকতে থাকবে তখন তোর মনে হবে শাল্লা, কী করতে এলুম এই হৃদয়পুরে। সেই ডাক তোর হৃদয়ে চাবুক মারবে। মন বলবে, 'চাঁদের বনে যার পাশে যাই তারেই লাগে ভাল।' তোকে পাহাড়ের ওপরে হৃদি-ঝোড়ার পাশে নিয়ে যাব। তখন দেখবি যে, এই হৃদয়পুরেই তোর হৃদয় খসবে, চৈত্র শেষের শালপাতার মতো, তারপরে ব্যালেরিনার মতো নাচতে নাচতে ঘুরে ঘুরে উড়ে উড়ে এসে বনের পায়ের কাছের কোনও কালো শিলাসনের ওপরে মুচমুচিয়ে পড়বে। তোর বড়ই বিপদ হবে রে ভেটকু। চাঁদেব বনে যে জীবনের প্রথমবার আসে তার পক্ষে বেঁচে ফিরে যাওয়া মুশকিল। জিন-পরীরা তোকে হয়তো তোর হাত না ধরেই ধরে নিয়ে যাবে, ডাক দেবে নিশির ডাকের মতো, বনের গভীরে নিয়ে যাবে, ডাইনি-জ্যোৎস্নার ভিতরে, তুই আর ফিরে আসতে পারবি না। কলকাতাতে আমি একা ফিরলে, মাসিমা কেঁদে কেঁদে বলবেন, বিধবার একমাত্র ছেলেটাকে কোথায় ফেলে এলে বাবা তকাই? আমার যে আর কেউই নেই।

তকাই বলল।

তারপর সিরিয়াস গলাতে বলল, তবে এ যাত্রায় হয়তো বেঁচে যাবি কারণ তোর হৃদয় নেবার মতো এখন এখানে কেউই নেই।

ভেটকু বলল, সকলেই তোর মতো সেন্টিমেন্টাল ফুল নয়। আমি বিজ্ঞানের ছাত্র। চাঁদ, পাখি, বসন্তের হাওয়া, ডাইনি না ফাইনি জ্যোৎস্না, এ সব ফালতু ব্যাপার আমার ওপরে কোনও প্রভাবই ফেলবে না।

তকাই বলল, ঠিক আছে। দেখব, কিন্তু সত্যিই যদি না ফেলে, তাহলে বুঝতে হবে তুই একটা রামছাগল। মানুষও খুন করতে পারিস। যে মানুষ বসন্ত না ভালবাসে সে অবশ্যই মানুষ খুন করতে পারে।

ট্রেনটার গতি কমে এল। দু পাশেই লাল খাপরার চালের মাটির ঘর, বাঁশের বাখারি বা শালকাঠের খুঁটির বেড়া দেওয়া। কোনও কোনও বাড়ি থেকে উঁচু বাঁশে বা গাছের খুঁটিতে লাল পতাকা উড়ছে দুপুরের হাওয়াতে পত্ পত্ করে।

অনিকেত তা লক্ষ করে বলল, এদিকের মানুষেরা কি সবাই কম্যুনিস্ট নাকি? এত লাল পতাকার ছড়াছড়ি।

তকাই হেসে বলল, এরা কম্যুনিস্টদের যম। শুধু লালে কি কম্যুনিস্ট হয়? কাস্তে হাতুড়ি লাগে না? এরা কম্যুনিস্ট নয়, কম-অনিষ্ট।

মানে? কী বলছিস খুলে বল।

মানে, এই ঝাণ্ডাগুলোর নাম হনুমান-ঝাণ্ডা। আর এই ঝাণ্ডা হচ্ছে রামসেবক হনুমানের। যার ভাল নাম, বজরংবলী।

কী বলি?

বজরংবলী।

তারপর বলল, কম্যুনিস্টদের অনেক কিছুই ভাল কিন্তু তারা পশ্চিমবঙ্গ আর ভারতবর্ষর মধ্যে গুলিয়ে ফেলেছে। পশ্চিমবঙ্গ আর কেরালাই যে ভারতবর্ষ নয়, ভারতবর্ষ যে একটা বিরাট দেশ এবং সেই ভারতবর্ষে রাম তো অনেক বড় ব্যাপার, তার চ্যালা-হনুমানও যে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য ভারতীয়দের কাছে, এই কথাটার সত্য বুঝতে হলে সারা দেশকে জানতে হবে। কুয়োর ব্যাং হয়ে বসে থাকলে এই জ্ঞানচক্ষু কোনওদিনই উন্মীলিত হবে না।

এসব কথা ছাড়ত। নিয়ে এলি মামাবাড়িতে বেড়াতে। কোথায় তিনটে দিন একটু রিল্যাক্স করব তা নয়...

না, তুই তো আবার কিছু দাদা আর গোদার ভক্ত কিনা! তা তোর দিক দিয়ে ভালই করিস। তোর আখেরে লাভই হবে।

তুই থামত। মাথা ধরে গেল।

ট্রেনটা প্ল্যাটফর্মে ঢুকছে। খোলা প্ল্যাটফর্ম। শেড-টেড নেই।

অনি বলল, তুই আজকাল বড় বেশি কথা বলিস। ধান ভানতে শিবের গীত।

তকাই বলল, ওই তো ছোটমামা এসেছেন।

কোন জন?

ওই যে রে। উ্য কান্ট মিস হিম।

সুভাষ চক্রবর্তী নাকি? এমন মড পোশাকে।

ভাগ।

প্ল্যাটফর্মের আতা গাছটার নীচে দাঁড়িয়ে আছেন।

ওইটা বুঝি আতা গাছ?

হ্যাঁ।

ওই জিন-এর প্যান্ট, নাইক আর গেঞ্জি, মাথায় হ্যাট আর মুখে সিগার দেওয়া ভদ্রলোক। উনিই তোর ছোটমামা? শিক্ষিত চাষা?

ইয়েস। শিক্ষিত চাষা। এই পোশাকটা ভেক। তোর মতো সাহেবকে রিসিভ করার জন্যেই পরে এসেছেন। তোকে বাজিয়ে নিতে চান আর কী! উনি কিন্তু সত্যিই শিক্ষিত চাষা। আমার ছোটমামার মতো অরিজিনাল, জেনুইন, ভণ্ডামিহীন মানুষ এই দেশে অনেক বেশি সংখ্যাতে থাকলে দেশটার চেহারাই আজ অন্যরকম হয়ে যেত।

'নরাণাং মাতুলক্রমঃ'। সেই জন্যেই বোধহয় তোর সঙ্গে মিল আছে তোর ছোটমামার।

এটা প্রশংসা না গালি তা বুঝতে পারলাম না। এখন নামত। তার পরে দেখব। তুই পালাবি কোথায় রে ভেটকু। এখন তো আমারই কব্জায়। তোকে কিলিয়ে কাঁঠাল পাকাব।

ওভারনাইটার আর কাঁধে ঝোলানো ব্যাগটা তুলে নিয়ে অনি তকাই-এর পেছন পেছন নামবার জন্যে এগোল।

অনি বলল, এটা আবার কী রকম এক্সপ্রেশন।

আমরা তো বাঙাল। মামারা পশ্চিমবঙ্গীয়। ছেলেবেলাতে গ্রামে শুনেছি এই কথা—'কিলিয়ে কাঁঠাল পাকাব'। বহু বছর বাদে ঠোঁটের ডগায় এসে গেল, তাই দেগে দিলাম তোকে।

আয়। আয়। বলে তকাই-এর ছোটমামা ভবতোষ চাটুজ্যে এগিয়ে এলেন। প্ল্যাটফর্মের ওপরে।

এই যে আমার বন্ধু অনিকেত রায়। আর এই আমার ছোটমামা। তোমার কথা ওকে অনেক বলেছি। ওর ডাকনাম ভেটকু।

অনি বলল, আপনার সম্বন্ধে যা বলেছে তকাই ছোটমামা, তাতে তো মনে হচ্ছে আপনার সব সম্পত্তি হাতাবারই মতলবে আছে তকাই। নইলে, এত প্রশংসা কেউ এমনি এমনি করে বলে আমার মনে হয় না।

ভবতোষ বললেন, তোমার অনুমান ভুল। কারণ, এই ভবা চাটুজ্যে মরে গেলে দেখা যাবে তার দেনাই আছে বিস্তর। সম্পত্তি থাকবে না আদৌ। তকাই আমাকে সত্যিই ভালবাসে। এবং ভালবাসা অন্ধ বলেই এ রকম বলে। ওর কথা সিরিয়াসলি নিও না বাবা।

বলেই, পাশেই দাঁড়ানো প্রায় ওদেরই সমবয়সি ছেলেটিকে বললেন, এই সাঁটুল। হাঁ করে কথা গিলছিস কি? মালগুলো নে না অতিথি আর তকাইদার হাত থেকে। সহবত যদি একটুও শিখলি! নতুন মানুষ দেখলেই ভোঁদা বনে যাস তুই।

ওভারনাইটারটা দিয়ে কাঁধে ঝোলানো ডিজিটাল-লক-এর ব্যাগটা হাতেই রাখল।

ছোটমামা বললেন, ওতে বুঝি টাকা আছে? তা থাকুক। দিয়ে দাও সাঁটুলকে। আমাদের হৃদয়পুরে চোর নেই। সবাই হৃদয়বান এখানে। তাছাড়া সাঁটুল বলতে গেলে, আমাদের ফ্যামিলি মেম্বার।

লজ্জা পেল খুবই অনিকেত। সত্যিই ওর মধ্যে ওর পার্সটা ছিল। হাজার ছয়েক টাকা ছিল। যদিও প্রয়োজন হবে না হয়তো, তবু বাইরে গেলে সঙ্গে নিয়ে বেরোয়। অভ্যাসবশেই।

না, না, মানে, এখানে তো ক্রেডিট কার্ড চলবে না, তাই...

লজ্জিত হয়ে ব্যাগটা সাঁটুলকে দিতে দিতে বলল, অনিকেত।

এখানে ক্রেডিট কার্ড না চললে কোথায় চলবে বৎস? হৃদয়পুরে তুমি তকাই-এর মামাবাড়িতে এসেছ, দু-চোখ বুজে সই কর। তোমার সব সইই এখানে অনার্ড হবে—কোনও লিমিট নেই কিছুরই ওপরে। আনলিমিটেড ক্রেডিট।

হাসল অনিকেত। ভাবল, তকাই-এর ছোটমামা ভারি ওভার-কনফিডেন্ট মানুষ। অন্যে অপ্রতিভ হল কি হল না তা নিয়ে তাঁর কোনও মাথাব্যথা নেই।

যেন অনিকেতের মনের কথা বুঝতে পেরেই ছোটমামা বললেন, সম্পত্তির ওয়ারিশানের কথা বলছিলে বাবা তুমি, সম্পত্তি বলতে তকাই পেয়েছে আমার টাক আর বুকের চুল। বুকের চুল তো নয়, আমাদের পরিবারের এ বস্তুকে জঙ্গল বলাই ভাল। বড়দার মেয়ে হিমিকা ছেলেবেলাতে আমার পেটের ওপরে বসে বলত, 'থোতোকাকু, তোমার বুক কম্বলে থোব একটু?'

বলেই, বললেন, ভাল কথা, তকাই, তোকে বলাই হয়নি, হিমি এসেছে পরশু।

ও কি এখনও ব্যাঙ্গালোরেই আছে? বম্বেতে ট্রান্সফার হবার কথা ছিল না।

না। এখনও ব্যাঙ্গালোরেই। পনেরো দিনের ছুটিতে এসেছে।

ওভারব্রিজ দিয়ে লাইন পেরিয়ে ওরা যখন আবার প্ল্যাটফর্মে নেমে গেটের দিকে এগোতে লাগল, তকাই বলল, হিমি কি বিয়ে করবে না?

ওসব কথা তুইই ওকে জিজ্ঞেস করিস। আজকালকার সব ছেলেমেয়ে। ওদের কথা, ওরাই জানে।

তারপর একটু চুপ করে থেকে বললেন, কাল রাতেই খেতে বসে বড়দাকে বলছিল। বড়বউদি তো মরে গিয়ে বেঁচে গেছেন। হিমি বলছিল যে, বাবা, অল্পবয়সে না বুঝে-সুঝে ওই অপকর্মটি যারা চোখ-কান বুজে ক্যাস্টর অয়েল গেলার মতোই করে ফেলতে পারে তাদের কথা আলাদা। পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে বিয়ে করাটা বাঘ মারার চেয়েও সাহসের কাজ। ভীষণই রিস্কি ব্যাপার। তোমাদের সময় তো আর

নেই। বিয়েটা আর এখন Means to an end নয়। ডিভোর্স হতে কতক্ষণ? তাহলে বিয়ে আদৌ করা কেন?

ভবতোষ ভেটকুর দিকে ফিরে বললেন, তোমার ছেলেমেয়ে কী বৎস?

আজ্ঞে?

প্রশ্নটা ঠিক বুঝতে না পেরে, অনিকেত প্রশ্ন করল।

উনি বিশদ করে বললেন, মানে, তোমার সন্তানাদি কী? 'হাম দোনো, হামারা দোনো' এক ছেলে এক মেয়ে? ব্যস। ফ্যামিলি প্ল্যানিং কমপ্লিট?

অনি অপ্রতিভ হয়ে বোকা বোকা হাসল।

অনিকেত তো বিয়েই করেনি ছোটমামা।

তকাই বলল।

তাই? তারপর বললেন, ভেরি স্ট্রেঞ্জ ইনডিড। স্ট্রেঞ্জই বা বলি কী কেন। বাড়িতেই তো একটি স্যাম্পল আছে।

তারপর বললেন, তা, তোমার বয়স কত হল বাবা?

আটত্রিশ।

চমৎকার।

তকাই বলল, তাতে কী হল? আমারও তো বউ নেই।

সে তো তোর বউ ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়াতে মরে গেল বলে নেই। আহা! সুমির কথা মনে পড়িয়ে দিয়ে মনটা খারাপ করে দিলি রে।

তকাই বলল, আচ্ছা ছোটমামা, তুমি নিজে ব্যাচেলর হয়ে বিয়ে বিয়ে করে খেপে উঠলে কেন বল তো? তুমি নিজে কেন ব্যাচেলর থাকলে?

সে কথা তোরা জানিস না? সেই যে কথা আছে না "a bachelor is a souvenir of a woman who had found a better one at the last moment."

তারপর বললেন, না, এই পৃথিবীটার কোনও রোগ হয়েছে। হয় তাই, নয় আমরা সব অবসলিট হয়ে গেছি। তোমাদের কাণ্ড-মাণ্ড ক্রিয়া-কলাপ কিছুমাত্র বুঝি না। মাঝে মাঝেই এই পৃথিবীকে বড় অচেনা লাগে।

জিপের ড্রাইভিং-সিটে ছোটমামা উঠে বসে তকাই আর ভেটকুকে পাশে বসালেন। ভিতরে তকাই, বাইরে ভেটকু। জিপটার মাথার ওপর ক্যানভাসের চাঁদোয়া থাকার কথা ছিল। সেটা এখন নেই। নেই-ই, না আপাতত খুলে রাখা হয়েছে, তা বুঝতে পারল না তকাই।

ছোটমামা এঞ্জিন স্টার্ট করেই বাঁই বাঁই করে স্টিয়ারিং ঘোরাতে লাগলেন কিন্তু জিপ একটুও ডান দিক বাঁ দিক হল না। স্টিয়ারিং বার দশেক পুরো ঘোরালেন তার পরে টাই-রড কথা বলল স্টিয়ারিং-এর সঙ্গে। তারপর জিপটা বাঁদিকে মুখ ফেরাল।

ছোটমামা বললেন, দশ পাক ফলস আছে স্টিয়ারিং। এ গাড়ি আমি ছাড়া আর কেউই চালাতে পারবে না। হিন্দিতে একটা কহবৎ আছে না? 'জিসকি বাঁদরী ওহি নাচায়' এও হচ্ছে সেই ব্যাপার। এই জিপের মান-অভিমান-রাগ এসব কোনও কিছুই আমি ছাড়া অন্যে আদৌ বোঝে না।

বলেই বললেন, কীরে তকাই, 'টিকিয়া উড়ান' চালাই?

তকাই বলল, চালাও।

ছোটমামা হ্যাটটাকে পেছনে, মালপত্র সামনে বসে থাকা সাঁটুলের হাতে চালান করে দিয়ে বললেন, আমার তো মাথা ভরা টাক। টিকি থাকলে তবুও না হয়...

তকাই বলল, কহবৎটার মানে বুঝলি?

বোকার মতো ভেটকু বলল, না।

কহবৎ কী?

আরে, কহবৎ হচ্ছে প্রবাদ।

'টিকিয়া উড়ান' চালানো মানে, গাড়ি এতই জোরে চলবে যে ড্রাইভারের টিকিটা উড়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে উঠবে মাথার পেছনে। সেই রকম ড্রাইভিংকেই বলে 'টিকিয়া উড়ান' চালানো।

॥ ২ ॥

খুব ভোরেই উঠে ট্রেন ধরেছিল তাই দুপুরের ভূরিভোজের পরে ঘুমিয়ে পড়েছিল অনিকেত।

তাকে যে ঘরটি দেওয়া হয়েছে তার জানালা দিয়ে তাকালে দেখা যায় একটি পাহাড়, গভীর জঙ্গলে ভরা। তবে পাহাড়টি কাছে মনে হলেও অবশ্যই অনেক দূরে। তার পাদভূমিতে নানা গাছের জঙ্গল। দুপুরের উথাল পাথাল করা চৈতি হাওয়াটা এখন শান্ত হয়েছে, তবু বনমর্মর শোনা যাচ্ছে মৃদু। বিছানা ছেড়ে উঠে জানলার কাছে এসে দাঁড়াল অনিকেত। কী সুন্দব এই প্রকৃতি। এক মিশ্র গন্ধ ভেসে আসছে পাহাড় ও বনকে ছুঁয়ে আসা ওই বাসন্তী হাওয়ায়। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ও জানালারই সামনে রাখা ইজিচেয়ারটাতে বসল। এই ঘরটা নাকি গেস্ট-রুম। আরও দুটি ঘর আছে এ রকম এই বাংলোতে। তকাই বলছিল।

এখন চারটে বাজে, চারদিক লালে লাল হয়ে রয়েছে। ট্রেন থেকে যে কুসুম গাছ দেখিয়েছিল তকাই সেই গাছও আছে পাহাড়তলিতে অনেকগুলো। আরও নানা গাছে লাল ফুল ফুটেছে। গাছগুলোর একটারও নাম জানে না। জানতে হবে। তকাই-এর মামাবাড়িটি বাংলো ধাঁচের। বাইরে চওড়া বারান্দা। ভিতরেও বারান্দা। বারান্দার পরে উঠোন। উঠোনের ও পাশে রান্নাঘর, ভাঁড়ার ঘর। কাজের লোকদের থাকার জায়গা।

তকাই-এর মেজমামা মারা গেছেন বছর পাঁচেক আগে। তাঁর একই ছেলে। স্টেটস-এর হ্যুস্টনে থাকে। বিয়ে করেছে। একটি মাত্র মেয়ে। পুজোর সময়ে আসে। হৃদয়পুরে তকাই-এর মামাবাড়িতে প্রতি বছর দুর্গাপুজো হয় নাকি সব রীতিনীতি মেনে। সবাই উপোস করেন, অঞ্জলি দেন। পাঁঠাবলিও হয়। হৃদয়পুরে দুটি বারোয়ারি পুজো হলেও ওঁদের বাড়ির পুজো দেখতে বহু দূর দূর থেকে মানুষ আসে নাকি। আসলে কলেজে পড়ার দিন থেকেই তকাই ভেটকুকে মামাবাড়ির পুজোর কথা বলে আসছে। বহুবার যেতে বলেছে কিন্তু আসা হয়ে ওঠেনি। অবশেষে এল এত বছর পরে। যদিও পুজোর সময়ে নয়। আগে যে কেন আসেনি, তা ভেবে আফসোস হচ্ছে এখন ভেটকুর।

বড়মামা ভারি চমৎকার মানুষ। বয়স হয়েছে। খুব রাশভারি। পাইপ খান। দিনে রাতের অধিকাংশ সময়ই নিজের লাইব্রেরি ঘরে কাটান। হৃদয়পুরের পাবলিক লাইব্রেরি, হাসপাতাল ইত্যাদিতেও তাঁদের অনেক দান-ধ্যান আছে। গত বছরই নাকি একটি প্রাথমিক স্কুলের পত্তন করেছেন সরকারের কোনও রকম অনুদান না নিয়েই। ভবিষ্যতেও নেবেন না।

খাওয়ার সময়ে উনি বলছিলেন যে, রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থারই সবচেয়ে অবনতি হয়েছে এবং স্বাস্থ্য পরিষেবারও। সারা রাজ্যের মানুষের যদি পাঠ্যপুস্তকের মান, শিক্ষকদের মান,

তাদের নিয়োগ এবং বদলি ইত্যাদি নিয়ে কিছুমাত্র মাথাব্যথা না থাকে, তাহলে ভুগবেন তাঁরাই। যথেষ্টই ভুগেছেনও। ক্ষতি যা হবার তা হয়েছে অনেকদিনই।

রাজ্যে যা হবার হোক, উনি প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে এই অন্যায়ের প্রতিবাদ হিসেবেই এই স্কুলের পত্তন করেছেন। তাঁদের বাবা দেবতোষের নামে স্কুলটি প্রতিষ্ঠা করেছেন। প্রায় অবৈতনিক। স্কুলে অনেক ছাত্র-ছাত্রী হয়েছে ইতিমধ্যেই। কলকাতার দু-তিনটি ভাল প্রাইভেট স্কুলের সঙ্গে বন্দোবস্ত করেছেন তাঁর স্কুলের ছেলেমেয়েরা যাতে সরাসরি সেখানে ভর্তি হতে পারে। সপ্তম শ্রেণী অবধি রেখেছেন তাঁর স্কুলে। সরকারের অ্যাফিলিয়েশন চাননি, অনুদান তো নেনই নি কোন, ভবিষ্যতেও নেবেন না। ভদ্রলোক অত্যন্ত শক্ত ধাতের মানুষ। যাকে অন্যায় বলে জেনেছেন তার বিরুদ্ধে তাঁর যা করণীয় তা একা হাতেই করতে তিনি বদ্ধপরিকর। তাছাড়া প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যমে শিশুদের কম্যুনিষ্ট বানানোর চক্রান্তকে অন্তত ঘৃণ্য বলে মনে করেন তিনি। এতে শিশুদের ভবিষ্যৎ নষ্ট হবে পুরোপুরি এমনই তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস।

হৃদয়পুরের স্কুলের ছেলেমেয়েরা সপ্তম শ্রেণীর পড়াশুনো শেষ করে যাতে কলকাতার ইন্ডিয়ান স্কুল লিভিং সার্টিফিকেটের পরীক্ষাতে বসতে পারে সে বন্দোবস্তও দুটি প্রাইভেট স্কুলের সঙ্গে লিখিত-পড়িত করেছেন। তাঁর স্কুলের ছাত্রদের প্রথম ব্যাচ দু-হাজার আট খৃষ্টাব্দে কলকাতা যাবে। কলকাতাতে তাদের থাকার জন্য এজমালি সম্পত্তি থেকে একটি বাড়ির বন্দোবস্তও করে ফেলেছেন। সেখানেই ছাত্ররা স্কুলের পরীক্ষা পাশ করা অবধি থাকবে ও খাবে। যাদের অবস্থা তেমন ভাল নয় এবং যারা মেধাবী, তারা যদি সচ্ছল পরিবারের ছেলেমেয়েও হয়, তবুও তাদের জন্যে হৃদয়পুরের স্কুলে যেমন বিনা পয়সাতে পড়াশুনো, বইপত্রের এবং বিশেষ প্রশিক্ষণের বন্দোবস্ত করেছেন তেমনই কলকাতাতেও তাদের বইপত্র এবং যাবতীয় অন্যান্য খরচের ভার যাতে উনিই নিতে পারেন সে জন্যে একটি ট্রাস্ট গঠন করে সেই ট্রাস্টে পনেরো লক্ষ টাকা সরিয়ে রেখেছেন। সাত বছর পরে সুদ সমেত সেই টাকা দু-গুণেরও বেশি হবে। সচ্ছল ঘরের ছেলেরা ন্যাশনাল স্কলার হলেও তাদের বৃত্তি দেওয়া হয় না, শুধু সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। অল্পবয়সে বৃত্তির টাকা হাতে পাওয়াটা যে কত আনন্দের, তা থেকে সচ্ছল হওয়ার অপরাধে তারা বঞ্চিত থাকে। ওরকম উদ্ভট নিয়ম পৃথিবীর কোথাও আছে বলে জানেন না তিনি।

উনি রবীন্দ্রনাথের কথা বলছিলেন—রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন এবং 'পূর্ণ মানুষের' সংজ্ঞার কথা বলছিলেন। উনি বলছিলেন, সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্রকলা সব ব্যাপারেই এখন তোষণ-নীতিই একমাত্র নীতি। বড় বড় সংবাদপত্র ও ব্যবসায়ীদেরও রাজ্যের ভালর জন্যে, দেশের ভালর জন্যে অনেক কিছুই করার ছিল। দেশ ও দশের জন্যে কারওরই কোনও মাথাব্যথা নেই। ইংরেজি মিডিয়াম স্কুল এবং রাজনৈতিক দলগুলোর লীলাক্ষেত্র অধিকাংশ বাংলা মিডিয়াম স্কুলগুলোতে যে সব ছেলেমেয়ে পড়ে পাশ করে বেরোচ্ছে তাদেরও চরিত্র গঠন, ন্যায়-অন্যায় বোধ, আদর্শ, কিছুই গড়ে উঠছে না। আমাদের সময়ে ও রকম ছিল না। সেই সব ছেলেমেয়েদের মা-বাবারাও অবশ্য সে জন্যে সমান দায়ী। তাঁদেরও তো জীবনের

একমাত্র গন্তব্য শুধুমাত্র চাকরি, বা ব্যবসা বা যেন তেন প্রকারেণ টাকা রোজগার।

উনি বলছিলেন, আমার একমাত্র মেয়ে হিমিকাকেও এই সব কথা বোঝাবার চেষ্টা করেছি কিন্তু তারও কোনও গরজ দেখি না। আমি আর কতদিন বাঁচব? আরও সাত বছর না বাঁচারই সম্ভাবনা। কিন্তু আমি থাকতে থাকতে এই স্কুলের একটি পাকাপোক্ত বন্দোবস্ত করে যেতে পারলে শান্তিতে মরতে পারতাম।

বেড়াতে এসে এমন সব গুরুভার জ্ঞানের মধ্যে পড়ে যাবে ভাবেনি অনিকেত। তবে সত্যি কথা বলতে কী, কথাগুলো শুনতে আদৌ খারাপ লাগেনি। শুধু যে খারাপ লাগেনি তাই নয়, নিজেদের কথা ভেবে লজ্জিতও বোধ করেছে। তার মনে, জীবন এই প্রথমবার মনে হয়েছে আদর্শহীন জীবনও কি জীবন? পয়েন্টলেস, গন্তব্যহীন জীবনের সার্থকতা কী? মানুষ হয়ে জন্মে শুধু কি খেতে-পরতে, ভাল থাকতে এবং নিজের নিজের আখের গোছাতেই এসেছে এখানে? তাহলে আর ওর সঙ্গে অন্য দশজন ধান্দাবাজ ভণ্ড মানুষের তফাত কী থাকল!

মনের মধ্যে, সত্যি বলতে কী, ঝড় উঠেছে দুপুর থেকেই। বাইরেও চৈতি হাওয়ার ঝড় ছিল কিন্তু সে হাওয়াতে সুগন্ধ ছিল। বুকের মধ্যের এই গম্ভীর ঝড়ে দমবন্ধ হয়ে আসছে। ঝড়ে ঝড়ে তফাত থাকেই!

আজকাল তো আদর্শবান মানুষ দেখাই যায় না। দেশ বা দেশের মানুষকে ভালবাসেন এমন মানুষও নয়। যে যার নিজের ভোগ, নিজের বিলাস, নিজের পরিবারের মানুষদের সুখবিধান নিয়েই ব্যস্ত। টাকা, আরও টাকা, ক্ষমতা আরও ক্ষমতা, প্রাইজ আরও প্রাইজ, এই সবই প্রার্থনা মানুষের। তা তাঁরা চাকরিজীবীই হন, কী ব্যবসায়ী বা পেশাদার বা অধ্যাপক বা সাহিত্যিক। চরিত্র-দূষণ গত কয়েক বছরে সব শ্রেণীর মানুষের মধ্যে এতখানিই ঘটেছে যে, ভাবলে সত্যিই আতঙ্কিত হতে হয়। সবচেয়ে দূষিত আজকাল বুদ্ধিজীবীরা। প্রকৃত বুদ্ধিজীবী এখন কমই আছেন পশ্চিমবঙ্গে। অধিকাংশ দুর্বুদ্ধিজীবী, সুবিধা ও সুযোগজীবী।

অনিকেত জানালার সামনে একটি ইজিচেয়ারে বসে হৃদয়পুরের বসন্তের রূপ দেখতে দেখতে এসব ভাবছিল। এমন সময়ে একটা কোকিল এমন করে ডাকতে লাগল যেন সাপে তার বাসাতে উঠে ডিম খাচ্ছে বলে মনে হল।

দরজায় টোকা দিল কে যেন।

অনিকেত উঠে দরজা খুলতেই তকাই এসে ঢুকল।

বলল, কী রে ভেটকুবাবু, রাতের গাড়িতেই কলকাতা ভেগে পড়বি কি না তাই ভাবছিস বুঝি?

কেন?

না, বড়মামার জ্ঞান হজম করা তো সোজা কথা নয়। সকলে পারে না। দেখলি না, আমাকে না বলে তোকেই সব বললেন।

অনিকেত বলল, কী বলিস তুই! এমন মানুষ পশ্চিমবঙ্গে আরও কয়েকজন থাকলে দেশের অবস্থা অন্যরকম হয়ে যেতে পারত। তোর দু-মামাই গ্রেট। এমন বাঙালি আমি বেশি দেখিনি।

বলল, সেটা ঠিকই বলেছিস। আই অ্যাম রিয়ালি প্রাউড অফ মাই বড়মামা। অ্যান্ড ছোটমামা অ্যাজ ওয়েল।

বলেইছি তো! তোর ছোটমামাও ভাল; দুজনেই অরিজিনাল মানুষ।

তকাই বলল মেজমামাও চমৎকার মানুষ ছিলেন। উনি এম. আর. সি. পি., এফ. আর. সি. এস. ডাক্তার ছিলেন। কিন্তু কলকাতাতে টাকা কামাবার কল না খুলে এই হৃদয়পুরেই প্র্যাকটিস করতেন। মেজমামার কাছে গরুর গাড়ি, সাইকেল রিকশা, মোটর সাইকেল এবং গাড়ি করে যে কত দূর দূর থেকে রোগীরা আসত, তা বলার নয়। সবাই বলত 'ধন্বন্তরী'। সার্জিকাল কেস খুব একটা নিতেন না কারণ কলকাতার হাসপাতালে যে সব সুবিধা ছিল তা তো এখানে ছিল না। মেডিসিনের প্র্যাকটিসই বেশি করতেন।

রোগীর ভিড়ের ঠেলাতে হিমসিম খেতে দেখে মেজমামাকে বড়মামা আর ছোটমামা মিলে এখানেই আলাদা হাসপাতাল করে দিলেন। অধিকাংশ রোগীর কাছ থেকেই পয়সা নিতেন না মেজমামা। অন্য মামারা, যে সব রোগীরা অ্যাফোর্ড করতে পারে, তাঁদের বলেছিলেন শেষেব দিকে, মানে অসময়ে চলে যাবার আগে, যাঁর যেমন ইচ্ছে ফিজ দিতে। শেষের দিকে অপারেশনও করতেন নিজেদেব হাসপাতালেই। মডার্ন অনেক ইকুইপমেন্টস এনে দিয়েছিলেন অন্য মামারা হৃদয়পুরেই। হৃদয়পুরের হাসপাতালের একতলাতেই মেজমামার নতুন চেম্বার হয়। জুনিয়ার আগে মাত্র একজন ছিলেন হাসপাতালে, পরে মেজমামাকে নিয়ে সবসুদ্ধ দশজন ডাক্তার হলেন। নার্সও এলেন অনেক। একটি নার্সিং স্কুলও করে দিলেন মামারা।

মেজমামা আজকে না থাকলে কী হয়, ডঃ দাশ আর ডঃ মাহাতো কী চমৎকার ঝকঝকে তকতকে রেখেছেন হাসপাতালটি। ওঁরা দুজনেই রেসিডেন্ট। একজন সার্জন আর অন্যজন মেডিসিনের। রোগীরা ধন্য ধন্য করে। ফিজও দেয়। চিকিৎসা বিনিপয়সাতে করা গেলেও সুশ্রুষা করতে তো খরচ লাগেই। তাই এখন হাসপাতালে যাঁরা ভর্তি হন তাঁদের জন্যে একটি ফিজ ধার্য হয়েছে।

কতগুলো কেবিন আর বেড আছে জেনারেল ওয়ার্ডে?

কেবিন-ফেবিন নেই। শুধুই জেনারেল ওয়ার্ড। তবে মেল-ফিমেল ওয়ার্ড অবশ্যই আলাদা। বড়মামার বা মেজমামার তেমন অসুখ হলে ওই জেনারেল ওয়ার্ডের রোগী হিসেবেই চিকিৎসা হয়।

ওঁরা প্রকৃতই সোশালিষ্ট আমাদের নেতাদের মতো নন। ডাবল-স্ট্যাণ্ডার্ড-এর মানুষ নন তাঁরা। তুই যদি সত্যিই দেখতে চাস তো কাল সকালে তোকে সব দেখাব ঘুরিয়ে। কালকে হিমিও থাকবে। ওর তো আজই বিকেলে ফিরে আসার কথা ছিল। এখনও তো এল না দেখছি।

কোথায় গেছে তোর বোন হিমিকা?

সে গেছে দুর্গা পাহাড়ে। সেখানে চিরবাবু 'পাখি-পাহাড়' করছেন না? পাহাড় কেটে ছেনি দিয়ে অগণ্য পাখি আঁকছেন পাহাড়ের গায়ে। তিনি তো এক পাগল।

দেখতে চাস তো নিয়ে যাব। চিরবাবুর ওই প্রজেক্টের জন্যে ব্যাঙ্গালোর থেকে চাঁদা তুলে নিয়ে এসেছে হিমি। সেই টাকা ড্রাফ্‌ট করে নিয়ে এসেছে, দিতে গেছে চিরবাবুকে। অযোধ্যা পাহাড়েও একজন, সম্ভবত চিত্ত দে এ রকম করছেন বলে শুনেছিলাম। পাহাড়তলির এক আদিবাসী গ্রামে হিমির এক সহেলি থাকে। তার কাছেও যাবে। সেইখানেই বোধহয় আটকে গেছে। মেজমামিমা বলছিলেন, দুপুরে সেখানেই খেয়েদেয়ে আসবে। নিজেই গেছে গাড়ি চালিয়ে। মেজমামার সাদা মারুতি গাড়িটা ওর জন্যেই গ্যারাজে রাখা থাকে। যখন আসে, ওই ব্যবহার করে।

তারপর বলল, চা-টা খাবি না?

খেলে হয়। শুধু চাই যথেষ্ট। বেলা দুটোতে তো অত পদ দিয়ে খেয়ে উঠলাম, 'টা' খাবার জায়গা কোথায়?

তা বললে তো হবে না ভেটকুবাবু। পড়েছ যবনের হাতে খানা খেতে হবে সাথে। তোর জন্যে তো বটেই হিমির জন্যেও এই তিনদিন বিশেষ ব্যবস্থা হবে খাওয়া-দাওয়ার। বাড়িতে গিন্নি বলতে তো ওই একজনই, কিন্তু মেজমামি একাই একশো। তোর জন্যে মাংসের সিঙাড়া, মাছের কচুরি আর ছানার গজা হচ্ছে 'টা' হিসেবে।

তোর মামাবাড়ির মানুষেরা কি রাক্ষস?

না, তাঁরা সকলেই মিতাহারী। মেজমামি আর ছোটমামা তো নিরামিশাষী। এসবই অতিথির জন্যে। তাছাড়া হিমি অতিথি না হলেও প্রবাসে থাকে, যখন আসে তখন বাবা-হারানো মেয়ের ওপরে সকলেরই স্নেহ স্বাভাবিক কারণেই উপচে পড়ে।

আমার কিন্তু সত্যিই পালাতে হবে। বড়মামা ভাববেন তাঁর জ্ঞান শুনে পালাচ্ছি কিন্তু আসলে পালাব খাওয়ার অত্যাচার থেকে বাঁচতে।

তকাই বলল, খা, খা। তোর ওপরে অত্যাচার করে যদি অন্যে সুখী হন তবে সে অত্যাচার সহ্য করতে হয়। তোদের বাড়ি গেলে মাসিমাও তো আমাকে কত কি খাওয়ান। প্রাণ গেলেও, ওঁর মুখে হাসি দেখার জন্যে প্রতিবাদ করি কি আমি? তাছাড়া আমার সুমি চলে যাবার পরে আমার নিজের মা তো মানসিক অবসাদগ্রস্ত হয়ে গেছেন। আমার বাড়ি গেলে আমি তো তোকে আলু পোস্ত আর বিউলির ডাল ছাড়া আর কিছুই খাওয়াতে পারি না আজকাল।

ভেটকু বলল, আচ্ছা, সত্যিই তুই একটা বিয়ে কেন করছিস না বলত? বিয়ে একটা করলে, মাসিমা এসে এখানে নিজের দু ভাই আর মেজমামিমার কাছে কত আরামে থাকতে পারতেন। তোর একটা হিল্লে না করে তো ওঁর পক্ষে আসা সম্ভব নয়। মাত্র দু-বছরই তো সংসার করেছিলি। তার স্মৃতি কি ভোলা সত্যিই যায় না? তাকে অপমান করা হবে কি আবার বিয়ে করলে?

তকাই একটু চুপ করে থেকে কান খাড়া করে বাইরে কোকিলের ডাকটা শুনেই হেসে ফেলল। বলল, হৃদয়পুরে সত্যিই বসন্ত এসেছে।

কেন?

এই পাগলা কোকিলটাই বসন্তের পেয়াদা। বসন্তে এখানে এখন ডিক্রি জারি করেছে। প্রতি বসন্তে এ আসে এবং পাগলের মতো ডাকতে থাকে। ওই দ্যাখ,

ওই গামহার গাছে ও বাসা বানায়। মেজমামা বেঁচে থাকতে একদিন বলেছিলাম, আচ্ছা, মেজমামা! তুমি এত রোগীকে ভাল করো, এই কোকিলটার পাগলামি কি ভাল ভরতে পার না?

মেজমামা মুখ থেকে সিগারেটটা নামিয়ে বলেছিলেন, সব পাগলকে ভাল করতে নেই।

বলেছিলাম, কেন?

কিছু পাগল সংসারের, সমাজের উপকার করে। পাগল পাখি যেমন করে, পাগল মানুষ তেমনই করে। মাঝে মাঝে আমারই পাগল হয়ে যেতে হচ্ছে হয়। তুই কলকাতার হাসপাতালগুলোর অবস্থা দেখেছিস? বড়লোকেরা না হয় নার্সিংহোমে যান। কিন্তু গরিবেরা? সরকার যদি সত্যিই জনগণেরই হতো তবে জনগণের সরকারি হাসপাতালগুলোর অমন অবস্থা হয়? জনগণের এমন হেনস্তা হয়? নোংরা, খাবারে চুরি, ওষুধে চুরি, চোখে দেখা যায় না। পুরুলিয়ার হাসপাতালের কথা ছেড়েই দিলাম, আমি খাস রাজধানী কলকাতার হাসপাতালের কথাই বলছি। যদি পাগল হতাম তবে মুখে একটা চোঙা লাগিয়ে পথে পথে ঘুরে কলকাতার হাসপাতালের অবস্থাটা জানাতাম মানুষকে। পাগল নই বলেই পারি না। পাগলদের পাগলই থাকতে দে। তাছাড়া বাঙালিদের সহ্যশক্তিরও শেষ নেই। কী করে মুখ বুজে এই অন্যায় তারা দিনের পর দিন সহ্য করে তা জানি না।

অনিকেত বলল, তবে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এবং তাঁর নতুন ক্যাবিনেট অন্যরকম। মানুষটা সত্যিই অন্যরকম। মনে হয়, উনি কিছু করার চেষ্টা সত্যিই করছেন। তাছাড়া মানুষটি সৎও। দেখাই যাক কী করতে পারেন!

তকাই বলল, তাঁর ব্যক্তিগত এবং অর্থনৈতিক সততা, ঠিক আছে। মানছি। ওই সততা দিয়ে উনি যদি ওঁর সরকারকে সত্যিই স্বচ্ছ করে তুলতে পারেন তবেই বোঝা যাবে। উনি চেষ্টা অবশ্যই করছেন কিন্তু কতদূর কী করতে পারবেন জানি না। গত পঁচিশ বছরে বামফ্রন্ট সরকার যে পশ্চিমবঙ্গের কর্মসংস্কৃতিকে একেবারেই খতম করে দিয়েছেন। খালি কথা আর বক্তৃতা। তাছাড়া সততার তো আরও অনেক রকম আছে। সেই সব ক্ষেত্রেও ওঁর সততা ওঁকে প্রমাণ করতে হবে। তাছাড়া যা দেখছি তাতেও মনে হচ্ছে ওঁর দল ওঁর হাত পা বেঁধে রাখার চেষ্টা করছে। ঠুঁটো জগন্নাথ করে দিলে তিনি সত্যিই কি করতে পারবেন করার মতো কিছু?

দাদাবাবু, মা ডাকছেন আপনাদের খাবার ঘরে চা খেতে।

একজন কাজের মেয়ে এসে বলল। সে দুপুরেও ছিল খাবার ঘরে। মামিমাকে সাহায্য করছিল।

চল ভেটকু। বলল, তকাই।

॥ ৩ ॥

খাওয়ার ঘরে গিয়ে অনিকেত দেখল, বিরাট আয়োজন। বড়মামা ও ছোটমামাও বসে আছেন খাবার টেবিলে ওদের অপেক্ষায়। মেজমামিমা বললেন, এসো বাবা, বসো।

দশ গাঁয়ের মানুষ যে আপনাদের 'বুর্জোয়া' কেন বলে তা এখন বুঝছি। সত্যি! দুটোর সময়ে খেয়ে উঠে চা-এর সঙ্গে এত পদ খাওয়া যায় বিকেলে।

অনিকেত বলল।

বড়মামা বললেন, বুর্জোয়া আমরা হতে পারি কিন্তু পঞ্চায়েতের টাকা মেরে বা সরকারি তহবিল কেটে বুর্জোয়া হইনি বাবা। যা কিছু দেখছ এবং দেখবে সবই আমাদের স্বোপার্জিত। আমার বাবার, দাদাদের এবং আমারও। কোনও পার্টি বা দাদা বা গোদার দয়াতে হয়নি কিছুমাত্রই। রবীন্দ্রনাথও তো বুর্জোয়া। এই হা-ভাতেদের দেশে, নিশ্চেষ্টদের দেশে, মতলববাজদের দেশে যেই একটু ভাল থাকে, ভাল খায়, সেই বুর্জোয়া। কে কী বলল, তাতে আমাদের বয়েই গেল। আমরা বুর্জোয়াই থাকতে চাই। সবকিছুর জনগনায়ন আমরা কেউই সমর্থন করি না। এতে দেশের ক্ষতি যতখানি হয়েছে ভাল তার ছিটেফোঁটাও হয়নি।

ছোটমামা বললেন।

মামিমা বললেন, ঠাকুরঝির চিঠি এসেছে রে তকাই আজই দুপুরে। কতবার বলি হপ্তাতে একটা ফোন কোরো। তা নয়, ঠাকুরঝি আমার চিঠি লিখতে খুবই ভালবাসে আর চিঠি লেখেও ভারি সুন্দর। আমার শাশুড়ি মা মেয়েকে নিজে হাতে বাংলা পড়তে-লিখতে শিখিয়েছেন। বুঝলে বাবা অনিকেত, এ বাড়িতে বউ হয়ে এসেছিলাম পাটনা থেকে এ আমার পরম সৌভাগ্য। অমন দেবতুল্য শ্বশুর, শাশুড়ি-মা, দেবতুল্য ভাসুর এবং নিজের সহোদরের চেয়েও বেশি কাছের আমার একমাত্র দেওর এই ভবা।

তারপরেই বললেন তকাইকে, তকাই, 'ভেটকু' আবার কী নাম? এমন সুন্দর ছেলের নাম ভেটকু হল কী করে! দিদির চিঠিতে জানলাম যে ওর নাম ভেটকু।

সুন্দর বলেই হয়তো ছেলেবেলাতে কপালে কাজলের ফোঁটা দিয়ে প্যারামবুলেটরে করে ছেলেকে বেড়াতে পাঠাতেন মাসিমা পাছে আরও কারও নজর লাগে, তাই হয়তো একটা বিচ্ছিরি নাম দিয়েছিলেন, 'ভেটকু'।

সকলেই হেসে উঠলেন তকাই-এর কথাতে।

মেজমামিমা স্বগতোক্তি করলেন, হিমিটা এখনও এল না। বলি যে দু-দুজন ড্রাইভার বসে আছে, একজনকে নিয়ে যা, তা না, মেয়ের জেদ। সে বলে, ব্যাঙ্গালোরে কি আমার ড্রাইভার আছে? নিজেই তো চালাই হয়। আর এখানে নিজের জায়গাতে এবং এমন ফাঁকা জায়গাতে গাড়ি চালানোটা তো একটা আনন্দই।

কষ্ট তো একটুও নেই।

পরক্ষণেই মামিমা বললেন, বুঝলি তকাই, অনিকেত সম্বন্ধে অনেক কিছু লিখেছেন ঠাকুরঝি। তোমার যে এত রকম গুণ তা তো তকাই আমাদের কখনও বলেনি। বাবা তোমরা দুজনে তো এতদিনের বন্ধু, আগে এলে না কেন? এত বছর লাগল এটুকু পথ এসে পৌঁছতে?

অনিকেত বলল, তকাই যে আমাকে ঈর্ষা করে। তাই বলেনি মামিমা। তাছাড়া ভাল করে আসতে বললে তো আসব। আমি এলে ওর যত্ন-আত্তি যদি কম হয়ে যায় এই ভয়েই হয়তো নিয়ে আসেনি এতদিন।

তারপরই বলল, গুণ না ছাই। মা-মাসির চোখে সব ছেলেই গুণের আধার। আর মাসিমা, মানে, তকাইয়ের মায়ের মুখে তো আমি কারওরই নিন্দা শুনিনি আজ অবধি। এমনকী ভুলেও কখনও জ্যোতি বসুরও নিন্দা করেননি। তাই মাসিমার প্রশংসার সার্টিফিকেটের কোনোই দাম নেই।

মাছের কচুরি ভেঙে আদার আচার দিয়ে খেতে খেতে তকাই বলল, কী ছোটমামা, আমার বন্ধুতো শুক্লপক্ষ-কৃষ্ণপক্ষর তফাত বোঝে না। তাকে ভালু-টোংড়িতে নিয়ে গিয়ে হৃদি-ঝোড়ার পাশে বসিয়ে এই বাসন্তী রাতের রূপ দেখাবে না?

আজ আমি তোদের সঙ্গে যেতে পারব না। তবে বন্দোবস্ত সব করে রেখেছি। আমি বোধহয় তোর মন পড়তে পারি। সাঁটুলকে সঙ্গে নিয়ে যা। আমার কিছু জরুরি কাজ আছে হিমির সঙ্গে। সে এসে গেলে অবশ্য অন্য কথা ছিল। সেও যেতে পারত। আমিও যেতাম।

তা তো পারতই।

তারপর বলল, তোমার জিপটাই নিয়ে যাব কি?

একদম না। ওই আমার একমাত্র স্ত্রী। বহু পুরনো স্ত্রী। এমন চাঁদের রাতে বনপাহাড়ে দুজন যুবকের হাতে তাকে আমি ছাড়তে একেবারেই রাজি নই। বড়দার ফোর্ড-আইকনটা নিয়ে যা তোরা।

তুমি যা বলবে।

বড়মামা বললেন, কদিনের ছুটি নিয়ে এসেছ অনিকেত?

বড়মামার চা খাওয়া হয়ে গেছিল। তখন পাইপ খাচ্ছিলেন। পাইপের টোব্যাকোর গন্ধে খাওয়ার ঘরটা ভরে ছিল।

অনিকেত বলল, তিনদিনের। মানে, পরশু অবধি।

দোল অবধি থেকে যেতে পারবে না? এখানের দোল দেখার জিনিস। তোমাকে আমাদের ফার্ম হাউসে নিয়ে যাব। আমাদের যারা ভালবাসে সেই সব গ্রামীণ ও আদিবাসী মানুষেরা সকালে দোল খেলতে আসবে আর রাতে নাচ-গান করবে। তা বলে ভেবো না যে ভদ্রলোকেরা আমাদের ত্যাগ করেছেন। না, তাঁরাও আসবেন অনেকে। তবে সত্যি কথা বলতে কি অশিক্ষিত মানুষজনই আমার বেশি ভাল লাগে। এদেশে যাঁরাই শিক্ষিত হন তাঁদের অধিকাংশই কপট মতলববাজ এবং চোর। এ বড় দুঃখের কথা। তবু, তাঁদের বাদ দিয়েও তো সমাজ চলে না।

কীর্তন হবে দোলের আগের রাতে ঠাকুর-দালানে।

মেজমামিমা বললেন।

কে গাইবেন কীর্তন?

অনিকেত জিজ্ঞাসা করল।

নিমীলা রায়। বড় ভাল গান বলে শুনেছি। নবদ্বীপ থেকে তিনি আসবেন আগের দিন। ছবি ব্যানার্জির কাছে নাকি শিখেছিলেন। সত্যি! ছবিদি গান গাওয়া তো প্রায় বন্ধই করে দিয়েছেন। আমাদের দুর্ভাগ্য। তেমন কীর্তনীয়া তো আর কেউই নেই, কী পুরুষ কী মেয়ে।

মেজমামিমা বললেন, অনিকেতের পাতে মাংসের সিঙাড়া তুলে দিতে দিতে।

শুনতে পাই, কীর্তন নাকি ধর্মীয় সঙ্গীত। তাই এই "ধর্মনিরপেক্ষ" রাজ্যে কীর্তনের উন্নতিকল্পে সরকারের পক্ষে কিছু করাটাও নাকি সম্ভব নয়। বাংলার এত বড় একটা সম্পদ নষ্ট হয়ে যেতে বসেছে চোখের সামনে। অথচ...

বড়মামা বললেন।

এখন তো পুজো করা, পার্বণ মানা, ধর্মাচরণ করাটাও আউট অফ ফ্যাশন। বুদ্ধিজীবীদের "ইমেজ"-এর পক্ষে ক্ষতিকারক। প্রাইজ পাওয়ার পক্ষে অসুবিধের। দুর্গাপুজোতে অঞ্জলি দেওয়াটাও তো এখন অন্ধ কুসংস্কার।

ছোটমামা বললেন।

বড়মামা বললেন, এখন মন্ত্রীদের এবং রাজনীতিকদের ফ্যাশন হচ্ছে রমজানের শেষে মাথাতে রুমাল চাপিয়ে ইফতার পার্টিতে কবজি ডুবিয়ে খাওয়া। সেটা কুসংস্কার নয়। তা করাটা গর্বের ব্যাপার।

অনিকেত বলল, একটা উপন্যাস আমাদের পড়া উচিত। আপনাদের যা মানসিকতা তাতে অবশ্যই ভাল লাগবে।

কোন উপন্যাস?

চাপরাশ। ঈশ্বরের চাপরাশ যাঁরা বহন করেন সেই চাপরাশিদের নিয়েই লেখা ওই বইটি।

ছোটমামা বললেন, একটা পাঠিয়ে দিস তো তকাই। তুই তো কালাপাহাড়। তুই তো পড়বি না।

ওই বইটা পড়েছি। ইন্টারেস্টিং বই। তবে আমি তো অ্যাথেইস্ট। দেব তোমাদের পাঠিয়ে। আনন্দ পাবলিশার্স-এর বই।

॥ ৪ ॥

চা-টা খেয়ে ওরা যখন বেরোল তখন সাড়ে পাঁচটা বাজে।

তকাই স্টিয়ারিং-এ বসল, পাশে ভেটকু। পেছনে-বসা সাঁটুলকে তকাই বলল, জলের বোতল আর টর্চ নিয়েছিস তো সাঁটুল সঙ্গে।

হ্যাঁ তকাইদা।

আর বন্দুক?

নিলে ভাল হত তবে বন্দুক নিইনি। ছোট যন্তর আছে আমার কোমরে। দিনকাল তো ভাল নয়। ছোটবাবু ডি. এম.-কে বলে ছোটবাবুর বডি-গার্ড হিসেবে আমার একটা লাইসেন্স করিয়ে দিয়েছেন।

এখন দেশে যাদেরই লাইসেন্‌স্‌ড আর্মস আছে তাদেরই বিপদ। এদিকে কার কাছে যে আর্মস নেই, মায় এ. কে. ফর্টিসেভেন পর্যন্ত, তা ঈশ্বরই জানেন। কোথা থেকে আসছে, কারা তা সংগ্রহ করছে, সে বিষয়ে কোনওই মাথাব্যথা নেই পুলিশের। ডাকাতি-কিডন্যাপিং লেগেই আছে। কারা ও সব করছে তাদের নাম তো কাগজে রোজই বেরোচ্ছে কিন্তু হোম ডিপার্টমেন্টের তাতেও কোনও মাথাব্যথা নেই। আমরা এক আগ্নেয়গিরির ওপরে বসে আছি। উই আর লিভিং ইনা আ ওয়ার্লড অফ উইশফুল ফিকিং। ভবিষ্যৎ অত্যন্তই খারাপ পশ্চিমবঙ্গের। অত্যন্তই খারাপ।

অনি বলল, এলাম এখানে বেড়াতে আর তোরা মামারা আর বোনপো মিলে কী শুরু করলি বলত? দেশ দেশ করে মাথা খারাপ করে দিলি। বলেই বলল, যোগেন একটা প্রবাদবাক্য বলে না?

কী?

"মামা ভাগ্নে যেখানে আপদ নেই সেখানে।" প্রবাদটি যে কত বড় সত্য এখন তা বুঝছি।

যোগেনরা কি বাঙাল? 'ভাগ্নে', 'ভাস্তে' এসব বলে কেন? বোনঝি বোনপোকে?

বলে। এক এক জায়গায় এক এক রকম বুলি। এতে আশ্চর্য হবার কী আছে।

তকাই বলল।

তারপর সাঁটুলকে বলল, কী রে। কোমরে তো যন্ত্র গুঁজেছিস কিন্তু সেটা কি শুধুই দর্শনধারী? না চালাতেও শিখেছিস। চালাতে না জানলে এসব যন্ত্র যারা প্রকৃত যন্ত্রী তারা গালে থাপ্পড় মেরে কোমর থেকে খুলে নিয়ে যাবে। কী যন্ত্র তোর? কত বোরের?

ওয়েবলি স্কট। ইংলিশ। রিভলবার। পয়েন্ট থ্রি-টু। বড়মামার নামে ছিল আমার নামে ট্রান্সফার করে দিয়েছেন।

ছোটমামার নিজের নেই?

আছে না? কোল্ট পিস্তল। আমেরিকান। পয়েন্ট থ্রি টু ই।

মাঝে মাঝে হাত ঠিক করেন তো? তুই করিস?

হ্যাঁ। করে তো। আমিও করি। ওই ভালু-টোংড়িতে গিয়েই করি।

ভালু-টোংড়িতে ভালু আছে এখনও? নাকি ছোটমামা আর তোর গুলির আওয়াজে সব ভাগলবা হয়েছে?

না, না, অনেক আছে। পেছন দিকের পাহাড়টাতে যে অনেকগুলো বড় বড় গুহা আছে। সেখানে থাকে। গাবলু-গুবলু বাচ্চারাও থাকে।

তকাই বলল, বাচ্চারা কি আর চিরকাল গাবলু-গুবলু থাকে। আমি-তুই সকলেই তো শিশুকালে গাবলু-গুবলুই ছিলাম। আমাদেরও তো ধেড়ে হতে হল। ওরাও ধেড়ে হয়ে যাবে। অবশ্য ওদেরও গাবলু-গুবলু বাচ্চা হবে।

সাঁটুল বলল, কপালে থাকলে আজই দেখা হয়ে যেতে পারে। এখন তো মহুয়ার সময়। এখনই তো ওদের দেখতে পাওয়া ভারী সহজ।

মহুয়া কী রে?

ভেটকু বলল।

তোকে নিয়ে চলে না। কলকাত্তাইয়া বাবু। দাঁড়া। তোকে মহুয়া দেখাই আর মহুয়া শোঁকাই।

বলেই, গাড়িটা পাহাড়ে পাহাড়ে যাবার লাল মাটির পথে দাঁড় করাল।

সাঁটুল বলল, এখানে না দাঁড়িয়ে একটু আগেই মোড়ে দাঁড়ালে ভাল হবে।

কেন?

ওখানে অনেকগুলো বড় বড় মহুয়া গাছ আছে। তাছাড়া দিদি যদি ফেরে অযোধ্যা পাহাড় থেকে তবে ওই মোড়েই দিদির সঙ্গে দেখাও হয়ে যাবে। যদি দিদি পরে, বলে, আমাকে ফেলে চলে গেলি কেন তোরা?

তকাই বলল, ভাগ। তোর দিদি তো থাকবে এখনও অনেকদিন। আমার বন্ধু তো চলে যাবে দুদিন পরেই। তোর দিদির সঙ্গে আমাদের কী?

কিছু না। তবে যদির কথা ভেবে মা দিদির জন্যে হটকেস-এ মাছের কচুরি আর মাংসের সিঙাড়া দিয়ে দিয়েছেন। ন্যাপকিন, প্লেট, কাঁটা-চামচ সব। জলও আছে। ফ্লাস্কে কফিও আছে।

তোর জন্যে কিছু দেননি মামিমা?

দেননি আবার? তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসতে হল, আমার খাওয়া হল না বলেই তো আমার ভাগটাও দিয়ে দিয়েছেন। দিদির সঙ্গে দেখা হলে ভাল। নইলে তো সব আমার পেটেই যাবে।

খেয়ে খেয়ে তো একটা রাক্ষস হয়েছিস।

দেবতা পাহারা দিতে রাক্ষসদেরও দরকার।

কথাও তো শিখেছিস দেখছি অনেক। গত বছর যখন পুজোতে এসেছিলাম তখন তো সাত চড়ে মুখ দিয়ে 'রা'ও বেরতো না।

হেঁ। তখন কি আর ভালু-টোংড়িতে এসেছিলাম তকাইদা। বড়বাবুদের সামনে আর মায়ের সামনে আমি বোবা হয়েই থাকি।

আর ছোটবাবু?

ছোটবাবু বন্ধুর মতো। শুধু আমারই নয়, উনি সকলেরই বন্ধু। ছোটবাবু যে দিন মরে যাবেন সে দিন কত হাজার যে লোক হবে তা ভেবেই আমি আনন্দে আটখানা হয়ে যাই।

তকাই বলল, কথা শুনলি ভেটকু?

তারপর সামনের মোড়ে পৌঁছে গাড়িটা থামিয়ে দিয়ে বলল, আমার ছোটমামার মরেও দরকার নেই আর তোরও আনন্দে আটখানা হবার দরকার নেই। নাম এবারে। আমার বন্ধুকে সব গাছ-টাছ চেনা। শুধু মহুয়া গাছই নয়।

গাড়ি থেকে নেমে জোরে নাক টেনে প্রশ্বাস নিয়ে তকাই বলল, না। যখন পাহাড়ে উঠব, কাচ নামিয়ে নেব। এয়ারকন্ডিশন্ড গাড়িতে বসে বনের শব্দ-গন্ধ কিছুই উপভোগ করা যায় না।

দরজাটা বন্ধ করে বলল, মেজমামি তো তোর জন্যে আর হিমি দিদির জন্যে অনেক কিছুই দিলেন তা আমার ছোটমামা আমার আর আমার বন্ধুর জন্যে কিছু দেননি রে সাঁটুল?

সঙ্গে সঙ্গে সাঁটুলের থার্টি-টু অল আউট হয়ে গেল।

সব দাঁত বের করে বলল, তা কি আর না দিয়েছেন? মামা-ভাগ্নে বলে কথা।

কী দিয়েছেন?

আজ্ঞে রাম্। ছোটবাবু বললেন, তকাইটা একটা হনুমান। রাম্-এ বড় ভক্তি। তার বন্ধু তো ওর মতো হনুমান নাও হতে পারে, হয়তো খায়ই না। যদি খায় তো জেনে আমাকে বলিস কাল ওর জন্যে একটা সিভাস-রিগ্যাল দেব। হুইস্কি। গত মাসে কলকাতা যখন যাই তখন পার্ক স্ট্রিটের জুবিলি স্টোর্স-এর পল্লব ব্যানার্জি দিয়ে দিয়েছিলেন। কোনও বিশেষ উপলক্ষর জন্যে জমিয়ে রেখেছিলাম। তা, বলিস আমাকে।

যে মক্কেল এসব খায় না তার সঙ্গে আমার বন্ধুত্বই হত না। তবে আমার বন্ধু খুব বড়লোক তো! আজে বাজে জিনিস খায় না। ছোটমামাকে বলিস। ও রাম্ খেলে বাকার্ডি রাম্ খায়।

সেটা আবার কী?

সাদা রাম্।

রাম্ সাদা? অবাক হয়ে বলল সাঁটুল। কখনও দেখিনি তো।

থাম তো। এই বিপুলা পৃথিবীর কতটুকু জানিস তুই? আমিই বা কতটুকু জানি। তবে হ্যাঁ যতটুকু জানিস তাই দেখা এবং শোনা আমার বন্ধুকে।

ভেটকু বলল, যোগেনের প্রবাদটা সত্যিই একশোতে একশো পাবে।

দেখা দেখা, বাবুকে মহুয়া গাছ দেখা। গাছ গাছালি সব চিনিয়ে দে কলকাতার বাবুকে।

হ্যাঁ। ওই যে বাবু। ওই যে একটা দুটো তিনটে চারটে পাঁচটা ওই সবগুলো গাছই মহুয়া। গন্ধ পাচ্ছেন না হাওয়ায় একটা মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ?

হ্যাঁ। তাই তো। ভারি মিষ্টি তো গন্ধটা।

মিষ্টি তো হবেই বাবু। এ দিয়ে তো মদ তৈরি হয়।

ও হ্যাঁ। সে তো শুনেছি। নানা বইয়ে পড়েওছি।

আর ওই যে গন্ধটা...

কোন গন্ধ ...

মহুয়ার থেকে আলাদা গন্ধ, পাচ্ছেন না? ওটা হচ্ছে করৌঞ্জের গন্ধ।

তকাই বলল, আরে প্রথম দিনই কি গন্ধর ফারাক করতে পারবে? বার বার আসবে যখন তখন পারবে। সবাই কি গন্ধ-গোকুল?

বার বার আসবেন বুঝি বাবু? এলে তো ভারি ভাল হয়। মা, তাই বলছিলেন।

মামিমা? কী বলছিলেন?

তকাই জিজ্ঞেস করল।

বলছিলেন...।

বলেই, তকাই-এর দিকে ফিরে বলল, না, না, কিছু না...

তকাই ধমকে বলল, কিছুই না যখন তখন বলতে গেলি কেন?

আমার চাকরি চলে যাবে। মানে, বললে, আমার চাকরি চলে যাবে।

তোর চাকরি, আমাকে না বললে, আমিই ছোটমামাকে বলে খেয়ে দেব। কী বলছিলেন মামিমা, তাই বল?

বলব?

আঃ! কী ন্যাকামি হচ্ছে।

বলছিলেন যে, হিমিদিদির যদি এমন একটা বর থাকত, কী ভালই না হত। একেবারে সৌমিত্র চ্যাটার্জির মতো, মানে যৌবনের। ভদ্র সভ্য, কম কথা বলে, তাছাড়া কত বিদ্বান এবং বড়লোক।

তকাই খুবই লজ্জা পেল ভেটকুর সামনে। কথাটা যে এই, তা আগে জানলে জানবার জন্যে পীড়াপীড়ি করত না।

ও অস্ফুটে বলল, সরি ভেটকু।

অনিকেত বলল, কী যে বলিস।

কিছু মনে করিস না।

এতে মনে করার কী আছে বল? আমি কি বোকা না পাগল?

আমার বিধবা মামিমার যদি তোকে খুবই ভাল লেগে গিয়ে থাকে তাহলে সে অপরাধ নিজ গুণে ক্ষমা করে দিস।

দ্যাখ তকাই। বাড়াবাড়ি করিস না। জীবনে আমাকে যদি একজনের ভালই লেগে থাকে সে তো পরম আনন্দেরই কথা। মামিমার ভাল লাগলে যে তোর বোনেরও ভাল লাগবে আমাকে এমন কোনও মানে নেই। তাছাড়া যদি আমাদের দুজনের দুজনকে ভাল লেগেই যায় তবেও বিয়ে হবার কোনও সম্ভাবনা কষ্ট-কল্পনা। আমরা দুজনেই যদি এতগুলো বছর বিয়ে না করে থাকতে পারি নিজ নিজ নিজস্ব কারণে তাহলে দুজনেই হঠাৎ বিয়ে করে ফেলব একে অন্যকে সেটাও সুদূরপরাহত।

মাসিমাকে দোষ দেবার প্রশ্নই হয় না। বরং আমি রীতিমত যাকে বলে elated। আমি নিজেই মামিমাকে বলব গিয়ে প্রণাম করে যে, আমি সম্মানিত বোধ করছি।

তকাই পকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে লাইটার দিয়ে ধরিয়ে বলল, নে ভেটকু, খাবি না কি?

নো। নেভার। কী করে যে শিক্ষিত মানুষ হয়ে এখনও সিগারেট খেয়ে যাচ্ছিস ভাবতে পর্যন্ত পারি না। গত সপ্তাহেই বস্টনে যেতে হয়েছিল দুদিনের জন্যে। অত বড় এয়ারপোর্টে দেখি একটি ছ বাই ছ ফিট-এর এনক্লোজার। তার চারধারে দড়ি দেওয়া। দেওয়ালে লেখা আছে Smokers। দুজন মাত্র দেখলাম, তোরই মতো অ্যাডিক্ট। তার মধ্যে ঢুকে একজন সিগারেট আর অন্যজন পাইপ খাচ্ছেন আর পুরো এয়ারপোর্টের মানুষে গ্রামের মেলাতে যেমন চোখ-মুখ করে তাঁবুর মধ্যে টিকিট কেটে ঢুকে চার পা-ওয়ালা ছেলে বা তিন মাথা-ওয়ালা মেয়ে দেখে, তেমন চোখ করেই তাদের দিকে চেয়ে আছে। ছিঃ।

নরাণাং মাতুলক্রমঃ।

তকাই বলল।

তারপর বলল, আমার মামাদের জ্ঞান দিয়ে পাইপ আর সিগার খাওয়া ছাড়াতে যদি পারিস তাহলে আমিও ছেড়ে দেব। প্রমিস।

ভেটকু সাঁটুলকে জিজ্ঞেস করল, ওটা কী গাছ?

ওই গাছটার নাম ফাগুন বউ। অনেকে বসন্তিও বলে। এই সময়েই ফুল আসে ওদের। সুন্দর হলুদ ফুল হয়েছে দেখেছেন। পাতা ঝরে যায় এখন। শুধু ফুলগুলো থাকে, কী সুন্দর যে দেখায়। সুন্দর দেখাচ্ছে না। ওই দেখুন, ওদিকে নীল কৃষ্ণচূড়া। বেগুনি জাকারান্ডা। সবই এই সময়েই ফোটে। আর ওই সাদা সাদা কাগজের মতো ফুল যে গাছটাতে, ওটা অস্ট্রেলিয়ান গাছ। ওদের নাম সুপার্বা গ্লিনিসিডিয়া।

ভেটকু সাঁটুলের জ্ঞান দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছিল। বলল, আঙুল দিয়ে দূরে দেখিয়ে, ও গাছগুলো কী গাছ?

তকাই স্বগতোক্তি করল, 'প্রাঙ্গণে মোর শিরিষ শাখায়'।

তুই চিনিস?

শান্তিনিকেতনে দেখেছিলাম।

ওগুলো তো শিরিষই। সাদা শিরিষ আর কালো শিরিষ। দু'রকমের হয়। আর ওইটা হচ্ছে আফ্রিকান টিউলিপ।

সাঁটুল, তুমি জানলে এত কী করে?

ছোটবাবুর কাছেই শিখেছি। মাও অনেক গাছ চেনেন। এসব গাছের অধিকাংশই তো ছোটবাবুরই লাগানো।

তাই? এই সব জমিও কি ওঁদের?

জমি? না তো। জমি তো বনবিভাগের।

তবে?

আনন্দ করে, ভালবেসে নিজের পয়সা খরচ করে গাছ লাগিয়ে বনকে আরও

সুন্দর করছেন ওঁরা, বনবিভাগ আপত্তি করবেন কেন? তাছাড়া, বনবিভাগের সাহেবরা সবাই তো আসেন আমাদের ওখানে। গত সপ্তাহেই রাহা সাহেব এসেছিলেন?

কে তিনি?

অতনু রাহা। চিফ কনজার্ভেটর, পার্কস। মানে, পশ্চিমবঙ্গের সব ন্যাশনাল পার্ক, টাইগার প্রজেক্ট শুদ্ধু তাঁরই এক্তিয়ারে।

কিন্তু ঠিক এই জায়গাটা কি পশ্চিমবঙ্গ?

সেটাই তো মজা। আমরা বাংলা-বিহারী, থুড়ি, ঝাড়খণ্ডী। আমরা ঝালেও আছি, ঝোলেও আছি, ছোটবাবু বলেন। দু'পা এগোলেই পশ্চিমবঙ্গ আর দু'পা পেছলেই ঝাড়খণ্ড।

তুমি এত সব জানলে কী করে।

সবই বাবুদের কাছে শিখেছি। পনেরো বছর তো হয়ে গেল চাকরির।

এখন তোমার বয়স কত?

চৌত্রিশ। দিদি আর আমি সমবয়সি।

বলেই বলল, আচ্ছা এটা কী গাছ বলুন তো?

কোনটা?

ওই যে লাল ফুল ফুটেছে।

আমি গাছ-টাছ চিনিনা। আমি কি বনবিভাগের আমলা?

তারপরে বলল, কী গাছ এটা? অশোক?

না।

পলাশ?

না।

তবে? শিমুল?

তাও নয়।

তবে?

ওটা মাদার। মাদার খুব জল খায়। মাদার বাংলাতেই ভাল হয়। এসব জায়গা তো রুখুসুখু। সেইজন্যেই এ পথ দিয়ে যখনই যাই আমি, ছোটবাবুর অর্ডার আছে, পলিথিনের জ্যারিকেনে জল রাখি গাড়িতে সব সময়ে। জল ঢেলে দিয়ে যাই। এখন থেকে আগামী তিনমাস নিয়মিত জল দিতে হবে। তারপরে বলল, দূরে আঙুল দেখিয়ে, ওই হল গিয়ে শিমুল। কত বড় বড় হয় গাছগুলো, দেখেছেন? গুঁড়িটাতে কেমন ভাগ ভাগ আছে দেখেছেন? আর সারা গায়ে কাঁটা। এই শিমুলের ফুল এখনই তো আসে—যে দিকে তাকাবেন লালে লাল। পলাশে আর শিমুলে। তবে পলাশ এদিকে বেশি হয়। বাড়ও খুব। সব গাছেরই আশেপাশে চারা গজিয়ে যায়। পলাশ না থাকলে গরিব মানুষদের হাঁড়ি চড়ত না। জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করে ওরা। পলাশ একেবারে রাবণের গুষ্টি। যতই কাটা হোক না কেন সমানে বাড়ে, সমানে গজায় বিনা আদর-যত্নে।

তারপর একটু থেমে বলল সাঁটুল, শিমুলের ফুল কোটরা হরিণরা খুব ভালবেসে

খায়।

এখানে হরিণ আসে নাকি?

এখন নামে না, আমাদের ছেলেবেলাতে তো এখানে গভীর বন ছিল, তখন দূরে দেখেছি। এখনও আছে, তবে পাহাড়ের ওপরের ঘন জঙ্গলে। ভালু-টোংরিতে আছে।

আর শিমুলের মগডালে যে বড় কালো পাখিটা বসে আছে সেটা কী পাখি বলুন তো?

তকাই বলল, তুই কি আমার বন্ধুর পরীক্ষা নিচ্ছিস না কি?

সাঁটুল হেসে ফেলল। তারপর জিভ বের করে দু কানে হাত দিল।

অনি বলল, আমি জানি না, কী পাখি ওটা?

ওটা এক ধরনের ঈগল। এর নাম, শাবাজ। এরা একাই থাকতে ভালবাসে। অদ্ভুত ডাক ওদের - কি - কি - কিই করে।

এদের ইংরেজি নাম Crested Hawk Eagle।

তকাই বলল।

সাঁটুল বলল, আপনাকে ওই যে আফ্রিকান টিউলিপ দেখালাম তার নাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরই দিয়েছিলেন নাকি আকাশমনি। এখন আকাশমণি বলেই সকলে চেনে ওই গাছকে। আরও কত ...

বলেই, থেমে গেল সাঁটুল।

স্বগতোক্তি করল, ওই তো দিদি আসছেন।

জীবনে নার্ভাস ফিল করেছে খুব কমই অনিকেত। কিন্তু লাল ধুলো উড়িয়ে একটা সাদা ছোট মারুতিকে আসতে দেখে কে জানে কেন, ওর বুক ঢিপ ঢিপ করতে লাগল। ও একটা ফেডেড জিনস, গল্ফ খেলার হলুদ রঙা গেঞ্জি আর জগিং শু পরেছিল।

তকাই মুখ তুলে অনিকেতের মুখে চাইল একঝলক, অনিকেতের নাড়ি বুঝতে।

অনিকেত টের পেয়েই মুখ ঘুরিয়ে নিল।

দেখতে দেখতে গাড়িটা ওদের গাড়ির কাছে এসে গেল। পথের উল্টোদিকে গাড়িটাকে পার্ক করে রেখে হিমিকা চট্টোপাধ্যায় নামল। একটা ফিকে বেগুনি রঙা শাড়ি, স্লিভলেস, সাদা ব্লাউজ এবং কোলাপুরি চটি পরে। গলাতে সাদা ঝুটো মুক্তোর মটরদানার হার, দু হাতে ওই রকমই মটরবালা, দুকানে মুক্তোর ইয়ার-টপ, হাতে সাদা রঙা স্ট্র্যাপে বাঁধা কালো ডায়ালের ঘড়ি, চোখে রে-ব্যানের রোদ চশমা। মেয়েটি বেশ লম্বা তাই আজকালকার অনেক মেয়েরই মতো লম্বা হবার জন্যে দু-ইঞ্চি রাবার হিলের জুতো পরতে হয়নি তাকে।

চোখ থেকে রোদ-চশমাটা খুলে ফেলে তকাইকে বলল, কী রে তকুদা। তুই তো ভুলেই গেছিস আমাদের। Long time no see!

তকাই বলল, তা তো বটেই। অফেন্স ইজ দ্যা বেস্ট ডিফেন্স। আমি তো প্রায়ই আসি, যে, বাড়ির মেয়ে, তাকেই দেখতে পাই না।

আর বলিস না রে। যা বিচ্ছিরি চাকরি না। ছুটি বলতে কি কিছু আছে? আমেরিকান কোম্পানিদের এই ধারা। মাইনে দেবে দারুণ, অন্য সব কিছু দেবে, কিন্তু তোকে নিশ্বাস ফেলার সময় দেবে না। আর পান থেকে চুন খসলেই চাকরি যাবে। ওরা সব মার্সেনারি—অর্থনৈতিক ব্যাপারে।

সেটা অবশ্য ঠিকই। আমার অভিজ্ঞতা আছে।

তারপরই বলল, পরে কথা হবে। আগে তোর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। আমার বন্ধু অনিকেত রায়। অনিকেতের দিকে ফিরে বলল, আমার মেজমামার মেয়ে হিমিকা, যার কথা তুই শুনেছিস।

নমস্কার। দুহাত জড়ো করে বলল, হিমিকা।

অনিকেত বলল, নমস্কার।

ভাল লাগল অনিকেতের। মনে মনে ও আসলে এখনও বেশ প্রাচীনপন্থী আছে। মেয়েরা শাড়ি পড়লে ওর খুব ভাল লাগে। বাঙালির সঙ্গে কথোপকথনের সময়েও অকারণ ইংরেজি তো বটেই আমেরিকান কায়দা-কানুনও ওর আদৌ পছন্দ নয়। হিমিকা যে 'হাই' না বলে, 'নমস্কার' বলল তাতে সত্যিই ভাল লাগল ওর। নিজেদের এমন ঐতিহ্য, এমন সব সুন্দর সামাজিক ও ধার্মিক রীতিনীতি থাকতে কেন যে অনেকেই অন্যদের অন্ধ অনুকরণ করে বোঝে না ও। যারা অগভীর তারাই সম্ভবত ও রকম করে। ইংরেজি জানতে হয়, বলতে হয়, লিখতে হয়। আজকাল কম্পিউটারের যুগে ইংরেজি না জানলে অবশ্যই চলে না। তবুও ই-মেইল-এ 'আই মিস ইউ' না লিখে Tomar janye mon kharap lage লেখাটাই অনেক উচিত বলে মনে হয় ওর।

চশমাটা খুলে ফেলতেই দুটি উজ্জ্বল, ফিঙের মতো কালো চোখ প্রকাশিত হল, কখনও কখনও কারও হৃদয় যেমন 'প্রকাশিত' হয় তেমন। অনিকেত ভাবল, পরে বলবে হিমিকাকে যে, যাকে ঈশ্বর এমন এক জোড়া চোখ দিয়েছেন তার রোদ-চশমা পরা উচিত নয়। চোখই তো মনের জানালা। চোখে চেয়েই তো একজন মানুষের শিক্ষা, পটভূমি, বুদ্ধি, মানসিকতা সব কিছু বোঝা সবচেয়ে সহজ। ধোঁকা যে খেতে হয় না একেবারেই এমন নয় কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখেছে যে চোখ মিথ্যা বলে না।

হিমি দুষ্টুমিভরা হাসি হেসে বলল, ও আপনিই সেই গ্রেট অনিকেত রায়। আপনার বন্ধু তো আপনার মস্ত ভক্ত। আপনাকে না দেখেও আপনার সম্বন্ধে এত কিছু জানি.যে আপনি জানলে বিস্ময়ে অজ্ঞান হয়ে যাবেন।

অনিকেত হেসে বলল, কী রকম?

আপনার একটা বিচ্ছিরি ডাকনাম আছে না? ভেটকু?

অনি হেসে ফেলল।

দাঁড়ান মশাই। এখনই কি? আপনি ইউনিভার্সিটির ক্রিকেট ব্লু ছিলেন? ক্রিকেটের ক্যাপ্টেন ছিলেন? আপনি সুবিনয় রায়-এর কাছে রবীন্দ্রসঙ্গীত শিখেছিলেন, ভাল গান করেন, আপনার বাঁ পায়ের উরু এবং ডান বাহুতে চারটে করে লাল তিল

আছে।

অনিকেতের দুকান লাল হয়ে উঠল, কিন্তু জোরে হেসে উঠে তকাই-এর দিকে ফিরে বলল, সত্যিই তকাই। তুই রিয়ালি ইনকরিজিবল।

তকাই বলল, চল হিমি, আমাদের সঙ্গে. আমরা ভালু-টোংড়ির মাথাতে সেই মস্ত বড় চ্যাটালো পাথরটাতে বসে থাকব হৃদি-ঝোড়ার পাশে। এক কলকাত্তাইয়াকে চাঁদ দেখাব। ওর গান শুনব। তুই গেলে তোরও। তোর খিদে পেয়েছে জানি কিন্তু তোর গর্ভধারিণী মা তাঁর খুকির জন্যে হটকেসে মাংসর সিঙাড়া ও মাছের কচুরি দিয়ে দিয়েছেন।

তাই?

বলল, হিমিকা।

কিন্তু ওসব খাবার পর যে চা বা কফি খেতে ইচ্ছে করবে।

তাও আছে।

হাউ থটফুল অফ হার।

ইয়েস। গরম কফি আছে ফ্লাস্কে। মিস্টার সাঁটুল শুধু ছোটমামার বডিগার্ডই নয়, সে তোর 'ভ্যালে'ও হবে।

বলছিস। তাহলে চল, যাওয়াই যাক। এখনও সময় আছে। ওখান থেকে তোর বন্ধুকে সূর্যাস্তটা দেখাতে পারবি। হৃদি-ঝোড়ার একটু দূরেই তো 'সানসেট পয়েন্ট'।

ঠিক তো। ভুলেই গেছিলাম।

তারপর বলল, তুই এ গাড়িতে আয়। ভার্সেটাইল সাঁটুল চন্দ্র তোর গাড়ি নিয়ে আসবে।

সবই ভাল কিন্তু সাঁটুল তো গিয়ার বদলায় না। কলকাতার ট্যাক্সিওয়ালাদের মতো থার্ড আর ফোর্থ গিয়ারে গাড়ি চালায় অথচ গিয়ারই হচ্ছে গাড়ির প্রাণ। এ কথা হাজারবার বলেও ওকে বোঝাতে পারিনি।

তকাই বলল, আয় ওঠ। ক্ষমা করে দে, ক্ষমা করে দে। আর কত কিছু জানবে বলত সাঁটুল? কোন ফসলে কোন সার দিতে হবে, পোকা লাগলে কোন ওষুধ দিতে হবে, ছোটমামার ড্রাইভিং লাইসেন্স কবে রিনিউ করতে হবে, বড়মামার ডেঞ্চার আনতে কবে কলকাতায় যেতে হবে ডেন্টিস্ট বারীন রায়ের কাছে ওয়াটারলু স্ট্রিটে, কবে ফাগুন বউ গাছে ফুল আসবে, এ বছর পুজোর কতদিন আগে থেকে হরশৃঙ্গার ফোটা শুরু হবে?

হরশৃঙ্গারটা কী ব্যাপার?

হিমিকা বলল।

ফোর্ড আইকন-এর পেছনের দরজা খুলে হিমিকাকে গাড়িতে বসাতে বসাতে অনিকেতও বলল, হরশৃঙ্গারটা কী ব্যাপার? হরধনু অবধি আমি জানি।

হিমিকা বলল, আমিও জানি না। হরশৃঙ্গার কোন গাছ? দেখতে কেমন?

রিয়ার-ভিউ মিরারে দেখে নিল তকাই, সাঁটুল গাড়ি ঘোরাল কি না। তারপর গাড়ি ঘোরালো, ওকেই আগে আগে যেতে বলল। স্বগতোক্তি করল, ও তো প্রায়ই

যায়, ওকে ফলো করাটাই ভাল হবে।

তা ঠিক। তবে ধুলো খেতে হবে।

এসি চালিয়ে দিচ্ছি কাচ তুলে দিয়ে।

তকাই বলল।

ফুলের গন্ধ, পাখির ডাক?

অনিকেত বলল।

সব পুষিয়ে দেব ওপরে পৌঁছে।

ঠিক আছে। কিন্তু হরশৃঙ্গার-রহস্যটা কী?

হরশৃঙ্গার মানে শিউলি। আমি জেনেছি ছোটমামার কাছ থেকে। ছোটমামাই একদিন বলেছিলেন। বিয়ের আগে...

ছোটমামার বিয়ে?

ভাগ্‌। প্রমথ চৌধুরী আর ইন্দিরা দেবীর বিয়ের আগে, মানে, কোর্টশিপ পিরিয়ডে, প্রমথ চৌধুরীর ইন্দিরা দেবীকে লেখা একটি চিঠিতে পড়েছিলাম হরশৃঙ্গারের কথা। কী দারুণ লিখেছিলেন। ও রকম চিঠি লিখতে না পারলে কি ইন্দিরা দেবীর মতো রূপসী এবং সর্বগুণসম্পন্না কারওকে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ প্রমথ চৌধুরী ওরফে বীরবল বধ করতে পারতেন। তাঁর নিজের অগ্রজকে সুপারসিড করে!

কী লিখেছিলেন চিঠিতে?

সেটা মনে করে রাখার মতো বলেই মনে করে রেখেছি। ছোটমামারও মুখস্থ ছিল। আসলে জানিস তো, আমার ছোটমামা এত বড় রবীন্দ্র-ভক্ত বলেই আমিও রবীন্দ্রনাথের এত বড় ভক্ত হয়েছি। আমি তো আমি, দেখলি তো সাঁটুলও হয়েছে। নইলে রবীন্দ্রনাথ আফ্রিকান টিউলিপ-এর নাম 'আকাশমণি' রেখেছিলেন এ কথা তো সাঁটুলের জানার কথা নয়?

হিমিকা বলল, শুধু ছোটমামাই কেন, বাবা, জেঠুমণি সকলেই রবীন্দ্র-ভক্ত। বলতে গেলে, ইট র‍্যান ইন দ্যা ব্লাড।

বল এবারে চিঠির কথাটা।

গাড়িটা গিয়ারে দিয়ে এসি-টা চালিয়ে তকাই বলল, বলছি। সঠিক মনে নেই, থাকার কথাও নয়। লিখেছিলেন ঃ ভৈরবীর মধ্যে কড়িমধ্যম এলে প্রাণের মূলে গিয়ে যে রকম আঘাত করে ঠিক সেই ভাবে একটুখানি চাঁদের আলো, একটি ফুলের গন্ধ, একটি গানের সুর আমাদের প্রকৃতির আসল অংশটা একেবারে হঠাৎ খুলে দেয়। তুমি সৌন্দর্য, কবিতা, মহত্ত্ব, বলে জিনিস যে পৃথিবীতে আছে তা বিশ্বাস কর, আমিও করি। কিন্তু জিনিসগুলোর পূর্ণ বিকাশ কেবলমাত্র গুটিকতক মাহেন্দ্রক্ষণেই হয়। নিজের চেষ্টায় হয় না। বাইরের সৌন্দর্য, কবিত্ব, মহত্ত্ব এসে তা ফুটিয়ে তোলে। একটি মানুষের ভিতর যা কিছু মহৎ, সুন্দর, মধুর, গভীর ভাব আছে তা একটি ফুলের গন্ধ যেমন করে ফুটিয়ে তুলতে পারে, তা দশ ভল্যুম ফিলজফিতেও পারে না।

যে-ফুলের গন্ধর উল্লেখ উনি করেছেন এখানে তাই হরশৃঙ্গার বা আমাদের

চিরচেনা শিউলি।

তকাই বলল, তুই এতখানি মুখস্থ করে রেখেছিস?

ইচ্ছে করে করিনি। বহুজনকে বহুবার বলতে বলতে নিজের অজান্তেই মুখস্থ হয়ে গেছে।

হিমিকা বলল, আমাদের জেঠুমণি ও ছোটকাকুর তো পুরো গীতা এবং চণ্ডীও মুখস্থ আছে। বাবারও ছিল। মুখস্থ করবেন বলে তো মুখস্থ করেনি। বাবা বলতেন, দাদুর আদেশানুসারে ঘুম থেকে উঠে যোগাসনে বসে কোনওদিন পুরো গীতা এবং কোনওদিন পুরো চণ্ডী পাঠ করতে হত। করতে করতে পুরোটাই নিজেদের অজান্তেই মুখস্থ হয়ে গেছিল। কেন? মুসলমানেরা কোরাণ মুখস্থ করে না?

যাকগে যাক। এ সব কথা আর কারোকেই বলিস না। কলকাতার বুদ্ধিজীবীরা জানতে পেলে তোকে বর্বর বলবে। গীতা বা চণ্ডী পড়লে পাপ হয়। ও সব "গৈরিকীকরণের" হাতিয়ার। এখন শুধু মার্কস আর কোরাণই পড়া চলতে পারে। হয়ত বাইবেলও।

তকাই বলল।

ভেটকু বলল, সত্যি! যে সংস্কৃত ভাষাকে ভর করে আমাদের তাবৎ ধর্ম-কর্ম, বিয়ে ও শ্রাদ্ধ সেই ভাষাই এখন বাঙালিদের কাছে ব্রাত্য হয়ে উঠেছে। এমন ঘোর দুর্বুদ্ধিজীবী, সুযোগ-সন্ধানী এবং আত্মবিস্মৃত জাতি ভারতবর্ষে আর বোধহয় একটিও নেই। ভাবলেও লজ্জা করে!

অনিকেত বলল, এতদিনে বুঝলাম তকাই-এর পুরো ইনকাম ট্যাক্স অ্যাক্ট, পুরো কোম্পানি অ্যাক্ট কী করে মুখস্থ হয়েছিল। সাব-সেকশন মায় সব প্রোভাইসো শুদ্ধু মুখস্থ বলতে পারত তকাই ওর সি এ পরীক্ষার আগে, বালিগঞ্জ লেক-এর বেঞ্চিতে বসে আমরা অবাক হয়ে যেতাম। এখন বুঝতে পারছি যে, রবীন্দ্র-ভক্তিরই মতো মুখস্থ করার শক্তিও also ran in the blood।

তকাই বলল, কথা না বলে দু'দিকে দ্যাখ। পথটা কেমন ঘুরে ঘুরে পাহাড়ে উঠেছে। দু'পাশে পর্ণমোচী বন। আহা! আমি Fall-এর সময় কানাডাতে থেকেছি...

আমিও থেকেছি। স্টেটস-এ ইয়ালোস্টোন ন্যাশানাল পার্ক-এ গেছি ঐ সময়ে।

হিমিকা বলল।

অনিকেত বলল, আমি ইয়োরোপের Fall দেখেছি। বহুবর্ণ পাতার সে কী রূপ।

হিমিকা বলল, আমাদের হেমন্তকালকেই ত পশ্চিমী দেশে Fall বলে। ও সব দেশে আমাদের মতো এমন ছয় ঋতুতো নেই।

অনিকেত বলল, আঃ! তখন ওসব দেশে পাতার কী রং হয়। কর্বুর।

হিমিকা বলল, কর্বুর মানে?

কর্বুর মানে, বহুবর্ণ। তকাই বলল।

তাই?

সত্যি। তুই কত যে জানিস তকুদা।

তকুদা, এবারে যা বলছিলি তা বল। সেনটেন্সটা শেষ কর।

হ্যাঁ। বলছিলাম, দু'পাশে পর্ণমোচী বন এবং এই বসন্তে আমাদের ভারতবর্ষের বন, পাহাড়, প্রকৃতি যেমন সুন্দর তেমন সুন্দর সম্ভবত পৃথিবীর আর কোনও জায়গার জঙ্গলই নয়। আর যেহেতু আমাদের সব গাছ-গাছালি পাতা পশ্চিমী দেশের মতো একই সময়ে ঝরে না, পাতা, কিছু গাছের ঝরলেও অনেক গাছেই তখনও পাতা থাকে। গ্রীষ্মে কিছু গাছের পাতা ঝরে আর কিছু গাছের ঝরে শীতে।

তাই? বলল হিমি।

তারপর বলল, মারুতিকে তো দেখাই যাচ্ছে না রে তকুদা। সাঁটুল কি পাহাড়ের ঘাটরাস্তাতেও 'টিকিয়া উড়ান' চালাচ্ছে?

তাই তো মনে হচ্ছে। ছোটমামার বডি-গার্ড তো।

তাড়াতাড়ি চালা তকুদা। সূর্য ডুবে গেলে তোর বন্ধুর সান-সেট পয়েন্টে গিয়ে সান-সেট আর দেখা হবে না।

মিনিট পনেরোর মধ্যেই ভালু-টোংড়ির ওপরে গিয়ে পৌঁছল গাড়ি। পাহাড়টা তো খুব উঁচু নয়। খুব উঁচু হলে তার নাম টোংড়ি হত না। ওপরে উঠে বোঝা গেল জায়গাটা মালভূমির মতো। তবে অধিকাংশই জঙ্গলে ভরা। দূরে মাঠমতো জায়গাটার অন্য প্রান্তে হিমিকার সাদা মারুতিটা দেখা গেল।

হিমিকা বলল, ঐ দেখো! দেখেছ, টাঁড়-এর শেষ প্রান্তে নিয়ে গেছে গাড়ি। আমরা কি ফুটবল খেলতে এসেছি এখানে। আশ্চর্য।

তকাই সেখানে নিয়ে গেল তার গাড়িও। গাড়ি থেকে সকলে নেমে একটা মস্ত গাছের নীচে একটি পাথরে বসল। সূর্য তখন পশ্চিমাকাশে দিগন্তরেখা থেকে হাতখানেক ওপরে আছে। প্রকাণ্ড একটা লাল থালার মতো।

অনিকেত বলল, এই তাহলে সান-সেট পয়েন্ট।

সাঁটুল বলল, এ জন্যেই গাড়ি এখান অবধি এনেছে, যাতে সময় নষ্ট না করে আমরা তাড়াতাড়ি স্পট-এ পৌঁছই।

তকাই অনিকেতের কনুই ধরে ফিসফিস করে বলল, ভেটকু।

বলেই, পুবে তাকাতে বলল।

অনিকেত তাকালে, বলল ও, আজ তো পূর্ণিমা নয়। একটু পরে উঠবে চাঁদ আজ। এখনই দেখা যাবে না।

সাঁটুল বলল, দিদি, সূর্য ডোবা দেখে এখানে বসেই কি খাবে তুমি? কাগজের প্লেট, ন্যাপকিন, হট-কেস সব বের করব?

তকাই বলল, দাঁড়া না সাঁটুল। সান-সেট দেখে সবাই গিয়ে আমরা হৃদি-ঝোড়ার কাছে সেই বড় পাথরটার ওপরেই বসব। আমাদেরও তো সেবা-টেবা করবি তুই নাকি? গ্লাস এনেছিস?

আজ্ঞে হ্যাঁ। সবই গুছিয়ে এনেছি। ঘি-এ ভাজা মাঠ্‌রীও এনেছি—রাম্-এর সঙ্গে খাওয়ার জন্যে।

সাঁটুলের খিদমতগারিতে কোনও ফাঁক থাকে না।

হিমি বলল।

তারপর তকাইকে বলল, তাই ভাল।

অনিকেত বলল, সত্যিই দারুণ।

অনেকটা পালামৌর নেতারহাটের সান-সেট দেখার জায়গা, 'ম্যাগনোলিয়া পয়েন্টের' মতো এই জায়গাটা।

তারপর বলল, একটা ক্যামেরা আনলে ছবি তোলা যেত।

সান-সেটের ছবি?

হিমি বলল।

হ্যাঁ।

সান-সেটের ছবি তা সমুদ্রেই হোক কি পাহাড়ে, এখন 'ক্লিশে' হয়ে গেছে।

তা অবশ্য ঠিক।

আমাদের সকলের তবু ছবি তুলতাম। থেকে যেত।

আমরা কেউ কি পটল তুলেছি? সকলেই যখন বেঁচে আছি এবং আরও বহুদিন বহাল তবিয়তে থাকব তখন ছবির দরকার কী?

তকাই বলল, মামিমা কিন্তু আমাকে বারবার করে আসতে বলছেন দোলে। আসবি নাকি? উইক এন্ডে একটা দিন ছুটি ম্যানেজ করতে পারলেই হয়ে যাবে।

তোর আবার ছুটি কি? নিজের ফার্ম। নিজেই তো নিজের মালিক।

আর সেই জন্যেই তো অসুবিধা। নিজের মালিক হলেই ছুটি নেওয়াটা সবচেয়ে অসুবিধের।

দ্যাখ চেষ্টা করে। হিমি তুই থাকবি তো দোল অবধি?

থাকব বলেই তো বলছি। তোরা এলে খুব মজা হবে। একদিন দুর্গা পাহাড়ে যাব, আরেকদিন মহাদেব-ঝুঁটিতে। পিকনিক করব।

অনিকেত একটু চুপ করে থেকে বলল, এখন তো সূর্যকে ডোবাই আগে, তারপর ভাবা যাবে।

তোর গান শোনাতে হবে কিন্তু হিমিকে।

ভাগ।

ভাগ মানে?

অমি তো বাথরুম সিঙ্গার।

হলে কী হয়। ইউনিভার্সিটিতে কত মেয়ে ওর গান শুনে প্রেমে পড়েছিল, জানিস হিমি।

বেচ্চারিরা! সব ব্যর্থ প্রেমিকা।

বলল, হিমি।

অনিকেত দিনের শেষ আলোতে তাকাল হিমির দিকে। কাটা-কাটা নাক-চিবুক। ঠোঁট দুটি ভীষণই ব্যক্তিত্বময়। গায়ের রং বেশ কালোই। মাথাতে চুল খুব বেশি নেই। পনি টেইল করে বাঁধা শাড়ির রঙ মেলানো একটি হালকা বেগুনি রিবন দিয়ে। আজ অবধি যত মেয়ে দেখেছে অনিকেত, হিমি তাদের কারও মতোই নয়। সুন্দরী বলতে সাধারণত যা বোঝায় তাও নয়। এই স্বাতন্ত্র্যটুকুই অনিকেতের চোখে

হিমিকে বিশিষ্ট করে তুলল। গলার স্বরটি গাঢ়। যখন কথা বলে তখন থতড়ন-এ কথা বলে কিন্তু অনেক নারী-পুরুষেরই স্বরের মতো তা ইচ্ছাকৃত নয় আদৌ। গলার স্বরটিকে গাঢ় বললে ঠিক বলা হয় না। ভরা কলসের মতো।

অনিকেত বলল, আপনি গান গান না?

গা-ই-তা-ম। বিয়ের জন্যে এক সময়ে সব বাঙালি মেয়েদেরই অন্তত গোটা ছয়েক গান তো শিখতেই হত। সেই সময়ে মা জোর করে শিখিয়েছিলেন। বিয়ে তো হল না, গানগুলো রয়ে গেছে। ওই ছটা গানের যে কোনওটি আপনাকে শোনাতে পারি কিন্তু তকুদা আর সাঁটুল এতবার শুনেছে ওর সবকটিই যে ওরা ভীষণই আপত্তি করতে পারে।

তকাই বলল, নারে ভেটকু। ইয়ার্কি। ও রীতিমতো ক্লাসিক্যাল শিখেছে এক সময়ে। বড়মামিমা খুব ভাল গাইতেন। বলতেন, এমনিতে রবীন্দ্রসঙ্গীত, অতুলপ্রসাদের, রজনীকান্তর, দ্বিজেন্দ্রলাল এবং নজরুলের অনেক গানই বেশি গায় মানুষে কিন্তু ক্লাসিক্যাল যদি ছেলেবেলাতে না শেখা যায় তবে ভালভাবে গান গাওয়া যায় না।

থামত তকুদা তুই।

হিমি বলল। তারপর অনিকেতের দিকে ফিরে বলল, আপনি কোথায় শিখেছিলেন? সুবিনয় রায়-এর কাছে তো শুনলাম, আর কোথায়?

'গীতবিতান' থেকে ডিপ্লোমা নিয়েছিলাম।

বাবা। তাহলে তো পাকা গাইয়ে একেবারে।

'গীতবিতান' বা 'দক্ষিণী' থেকে ডিপ্লোমা নিলেই বুঝি সবাই পাকা গাইয়ে হয়ে যান? তাহলে তো কথাই ছিল না।

থাক তো এ সব তাত্ত্বিক আলোচনা।

এবারে আমি একটা কথা বলি?

তকাই বলল।

কী কথা?

এবারে আধঘণ্টা আমরা সবাই চুপ করে থাকি। শহুরেরা এক হলেই একই কথা আলোচনা করে। এবার শোন ভেটকু এই শুক্লপক্ষের রাতে ভালু-টোংড়ির কী বলার আছে। আধঘণ্টার মধ্যে চাঁদও উঠে আসবে হামাগুড়ি দিয়ে গাছ-গাছালির মাথায়। তারপরে হিমি চা খাবে, আমরা অন্য কিছু। তারপরে গান শোনা যাবে হিমি এবং তোরও। এখন অ্যাবসল্যুট সাইলেন্স।

ওর কথা বন্ধ করতেই বন বাঙ্ময় হয়ে উঠল। পাগলের মতো একটা পিঁউ কাঁহা পাখি, যার ইংরেজি নাম ব্রেইন-ফিভার, সত্যিই যেন মস্তিষ্কের জ্বরে আক্রান্ত হয়ে প্রচণ্ড জোরে ডাকতে ডাকতে উড়ে গেল ওদের মাথার ওপরে দিয়ে। তারপরই হ্লদি-ঝোড়া নামক জলপ্রপাতের মৃদু মর্মর স্পষ্ট হল। হাওয়াটা বনময় ছুটোছুটি করে বেড়াতে লাগল মিশ্র বনগন্ধ নিয়ে। অনিকেতের যেন ঘোর লাগল।

স্তব্ধ হয়ে বসে রইল ও আধো অন্ধকারে। তকাই-এর এবং হিমির মুখ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল না। যাচ্ছিল না বলেই এক আশ্চর্য রহস্য যেন ঘিরে ছিল তাদের।

সাঁটুল পেছনে একটা নিচু পাথরে বসেছিল তাই তাকে দেখা যাচ্ছিল না। অনিকেতের মনে হচ্ছিল তকাই-এর অত চেনা মুখটিও যেন অচেনা হয়ে গেছে সেই রহস্যময় অন্ধকারে আর হিমির অচেনা মুখটি তার কল্পনাতে ধীরে ধীরে চেনা হয়ে উঠতে লাগল।

হৃদি প্রপাতের নীচের দিক থেকে একটা চিতল হরিণ টাউ টাউ টাউ করে ডেকে উঠল। বনের রহস্য তাতে আরও নিবিড় হল। দুটো পেঁচা কিঁচি-কিঁচি-কিঁচর শব্দ করে ওদের মাথার ওপরে ঘুরে ঘুরে উড়ে উড়ে ঝগড়া করতে লাগল। একটা পাখি, ওরা যে সান-সেট পয়েন্টে বসেছিল তার সামনের খোলা প্রান্তরের বুকের মধ্যে চমক তুলে তুলে ঝাঁকি দিয়ে দিয়ে দিয়ে ডাকতে লাগল ডিড-উ-ড্যু-ইট, ডিড-উ-ড্যু-ইট। পাথরটার নীচে শুকনো পাতার মধ্যে সরসর শব্দ করে কী একটা সরীসৃপ ধীরে ধীরে চলে গেল। অস্বস্তিতে অনিকেত ওর পা'টা তুলে বসল। তকাই দেখল, কিন্তু কথা বলল না কোনও। ভালু-টোংড়ির নীচের কোনও গ্রাম থেকে মাদল আর ধামসার সঙ্গে আদিবাসীরা গান ধরল। আশ্চর্য সে গান। নারী-পুরুষের সেই সম্মিলিত গানের দোলানি সুরে, ঘুম পেতে লাগল অনিকেতের-মনে হল, এ যেন কোনও ঘুমপাড়ানি গান, শিশুকালে মা তাকে কোলে করে যে রকম গান গাইতেন নিচু গ্রামে, তেমন। গান তারা জোরেই গাইছিল কিন্তু অনেক দূরে থাকায় ওদের কাছে তা নিচু গ্রামে এসে পৌঁছচ্ছিল।

তারপরে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল সেই মালভূমি। গন্ধবাহী হাওয়াটাও যেন কার অদৃশ্য আঙুলের সঙ্কেতে থেমে গেল! কিছুক্ষণ পরে আবার দুলে উঠল হাওয়াটা। শুকনো পাতা গড়িয়ে উড়িয়ে। আবার ফিসফিসানি শুরু হল। এমন সময়ে এক জোড়া কী যেন বড় জানোয়ার সেই ফাঁকা জায়গাটা পেরিয়ে চলে যেতে যেতে হঠাৎ তাদের দিকেই ঘুরে এগিয়ে আস্তে লাগল। কী জানোয়ার, কে জানে! প্রায়ান্ধকারে আকাশের পটভূমিতে তাদের কালো শরীরের শিল্যুট ক্রমশ বড় হয়ে উঠতে লাগল।

তকাই হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে সাঁটুলকে চাপা গলায় কী যেন বলল। সাঁটুল তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে ওদের ছাড়িয়ে সামনে একটু এগিয়ে গেল। পরক্ষণেই কোমরের বেল্টে বাঁধা রিভলবারটা বের করে পরপর দুটো গুলি করল। জানোয়ার দুটোর সামনে হাত দশেক আগে মাটিতে গুলি দুটো গিয়ে পড়তেই ওরা মুখ ঘুরিয়ে হাস্যকর ভঙ্গিতে অর্ধেক দৌড়ে অর্ধেক লাফিয়ে চলে গেল বাঁদিকে। তারা মাঠ ছেড়ে জঙ্গলে পৌঁছতেই তাদের নীচে নেমে যাবার শব্দ জঙ্গলের শুকনো পাতা এবং ঝোপেঝাড়ে স্পষ্ট শোনা গেল। তাদের চলে যাওয়াটা তারা গোপন রাখল না। যদিও আসাটা রেখেছিল। কিছুক্ষণ পরে তাদের শব্দ একেবারে থেমে গেল। থেমে যাওয়ার পরে সাঁটুল বলল, ভাগ্যিস তোমরা চুপ করে ছিলে। নইলে বাবাজীদের আসাটা তো আমরা লক্ষই করতাম না। রিয়্যাল কেলো হয়ে যেত।

অনিকেত একটু ভয়ও যে পায়নি এমনও নয়। এতক্ষণে ও কথা বলল। বলল, কী ও দুটো?

ভাল্লুক! আবার কী? তাদেরই তো জমিদারী এটা। আমরা বিনা অনুমতিতে এখানে হাজির হয়েছি, আমরা কারা, কী মতলবে এসেছি তাই খোঁজ করতে আসছিল আর কী। ভাগ্যিস গুলির শব্দ শুনেই তারা চলে গেল।

উল্টোটাও তো ঘটতে পারত।

ওরা তেড়ে এলে খুবই মুশকিল ছিল। সাঁটুল বলল, রিভলবার দিয়ে যত সহজে মানুষ মারা যায় অত সহজে অত বড় ভালুকদের ক্ষতি করা যেত না। তাছাড়া তাদের গায়ে গুলি লাগলে অন্য ফ্যাসাদেও পড়তে হত। বনবিভাগ কেস করত। তার ওপরে তারাই হয়ত আমাদের ফেড়ে দিয়ে যেত একেবারে। ভাল্লুকের মতো খারাপ জানোয়ার আমাদের দেশের বনে-জঙ্গলে আর দুটি নেই। সম্পূর্ণ বিনা অপরাধে, বিনা প্ররোচনাতেও তারা মানুষের নাক চোখ ঠোঁট খুবলে নিতে খুব ভালবাসে। মাংস খায় না, অথচ কেন যে অমন করে কলকাতার কোনো কোনো বুদ্ধিজীবীর মতো, কে জানে! গত জন্মে সব ভাল মানুষদের সঙ্গেই বোধহয় ওদের বিশেষ কোনও শত্রুতা ছিল।

তাহলে খুবই বেঁচে গেছি আজকে আমরা। কী বল সবাই।

দোষ তো তোমারই সাঁটুল। দ্যাখো, ওটা কী গাছ।

তকাই বলল।

তাই তো। এখানে বসাটাই ভুল হয়েছিল আমাদের।

হিমিকা বলল।

অনিকেত বলল, কেন?

ওটা মহুয়া গাছ। ফলে ভরে আছে এখন। গন্ধ পাচ্ছিস না? তীব্র মিষ্টি একটা গন্ধ হাওয়ার ঝলকে ঝলকে? মহুয়াই খেতে আসছিল ওরা।

আবারও যদি আসে?

অনিকেত বলল, ভয়ার্ত গলায়।

আপাতত আর আসবে না। পরে হয়তো আসবে।

বাবাঃ। সত্যিই খুব বেঁচে গেলাম আমরা আজকে। কী দরকার ছিল এখানে রাতের বেলাতে আসার?

অনিকেত রিয়াল কলকাত্তাইয়ার মতোই বলল।

তকাই বলল, ভয় আছে বলেই তো ভালু-টোংড়ির সৌন্দর্য দশগুণ বেড়ে গেল। ভালবাসার মধ্যে অনিশ্চিতি এবং ভয়ই যদি মিশে না থাকে তবে সেই ভাললাগা ভালবাসা বড়ই আনইন্টারেস্টিং।

অনিকেত বলল, কী জানি বাবা!

তকাই বলল, হিমিও বেঁচে গেলি খুব। ভাল্লুকেরা, হনুমানদেরই মতো, মেয়েদেরই বেশি পছন্দ করে।

তার মানে?

মানে, ভাল্লুকে মেয়েদের রেপও করে। অ্যানাটমিকালি অসুবিধের নয়, তাই। তাই বনেজঙ্গলে ফল-কুড়োনো কাঠ-কুড়োনো মেয়েরা বাঘের চেয়ে ভাল্লুককেই বেশি

ভয় করে।

হিমি হেসে বলল, যত আজগুবি গল্প তোর তকুদা। তাছাড়া ওরা তো মিস্টার অ্যান্ড মিসেসই ছিল।

আরে পুরুষ জাতটাই ছিঁচকে চোর। স্ত্রীর সামনে সবাই মহৎ, সবাই সৎ, সচ্চরিত্র। একা থাকলে তবেই না তাদের চরিত্র দাঁত বের করার সাহস পায়। তকাই বলল।

তারপর বলল, সত্যি বলছি রে। বিশ্বাস না হয় তো জিজ্ঞেস কর সাঁটুলকে।

সাঁটুল বলল, সে রকম হয় না যে তা নয়। তবে আমার অভিজ্ঞতায় জানি না। বাবার কাছে অমন একটা কথা শুনেছিলাম বটে। অবশ্য ছেলেবেলায়।

তকাই বলল, আচ্ছা মিস্টার সাঁটুল। এক সন্ধের পক্ষে আমার বন্ধুর অনেকই অভিজ্ঞতা হয়েছে। তোর মাধ্যমে নানা গাছ-গাছালি চেনা, হিমিকা দেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ, সান-সেট পয়েন্ট থেকে সূর্যাস্ত দেখা এবং তারও পরে ভাল্লুক-দম্পতি দর্শন, এবারে হিমির কফি ও 'টা' এবং আমাদের রাম্ পান করাও মাঠ্‌রী সহযোগে তা না হলে ছোটমামাকে নালিশ করে দেব আমাদের মোটেই দেখাশোনা করিসনি বলে।

ঠিক আছে। দিচ্ছি। বলেই, সাঁটুল গাড়ির বুট খুলে খাদ্য-পানীয় সব বের করতে গেল।

তকাই বলল, মিস্টার ভেটকু, ওপরে চেয়ে দ্যাখ, মিস মুন তোর জন্যে অপেক্ষা করছেন চার চোখের মিলনের জন্যে।

সকলেই ওপরে তাকাল একই সঙ্গে।

হিমি হেসে উঠল তকাইয়ের কথা বলার ধরনে।

দেখেছিস? এ রকম চাঁদ কখনও কলকাতাতে দেখেছিস? না দেখবি? শিরিষ গাছের ডালের ফাঁক দিয়ে মুখ দেখাচ্ছে আর উল্টোদিকে মুখ করে দ্যাখ, পশ্চিমাকাশে নীল, স্নিগ্ধ সন্ধ্যাতারাটা কেমন নিঃশব্দে উঠে তার দ্যুতিতে বিশ্ব চরাচরকে শান্তিতে ভরে দিয়েছে।

বাবাঃ। তুই তো দারুণ বাংলা বলছিস রে তকুদা। আজকাল।

ভুলে গেলি এরই মধ্যে যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল ফাইনাল পরীক্ষাতে বাংলাতে আমি সবচেয়ে বেশি নাম্বার পেয়েছিলাম।

ভোলা কি কখনও সম্ভব? বাবা-কাকারা, মা ও কাকিমারা তো উঠতে বসতে সে জন্যেই কথা শোনাতেন। বলতেন, লজ্জা করে না? তকুকে দ্যাখ। তুই খোট্টা হয়েই থাক। তোর আর বাংলা পড়ে দরকার নেই।

মেজমামা বেঁচে থাকলে জানতেন যে, আজকে সচ্ছল বাঙালি পরিবারের ছেলেমেয়েরা বাংলা আর হিব্রুর মধ্যে তফাত জানে না আর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বদান্যতায় বাংলা মিডিয়াম স্কুলের ছেলেমেয়েরাও যা বাংলা শিখছে তা আর বলার নয়।

কেন এমন হচ্ছে?

মাস্টারমশাইরা নিজেরা তেমন জানলে তো শেখাবেন! স্কুল মাস্টার, কলেজের অধ্যাপক সবের নিয়োগের ক্ষেত্রে, রাজনৈতিক প্রভাব এতখানিই পড়ে আজকাল

যে তা বলার নয়। লেখাপড়া করে কী হবে। রাজনীতি করলেই হবে।

এটা তোর একটু বাড়াবাড়ি হল।

অনিকেত বলল।

হলে হল। আমার যা মনে হয় তাই তো আমি বলব।

তারপরই বলল, মাঝে মাঝেই আমার কী মনে হয় জানিস ভেটকু?

কী?

মনে হয়, কলকাতার কাজ সত্যিই বন্ধ করে এখানে চলে আসি। মামাদের বহুদিনের ইচ্ছে। ওঁদেরও তো বয়স হচ্ছে। নানা Trust ওঁরা করে গেছেন কিন্তু তবু নিজেরা ভালবেসে না দেখাশোনা করলে কি হাসপাতাল, স্কুল এসব চলে। এখানে আমার কত কীই না করার ছিল। সত্যিকারের দেশের কাজ, দশের কাজ। মামারা আমার ওপরে কোনওদিনই তেমন জোর করতে পারেননি কারণ নিজেদের ছেলেমেয়েরাই তো কথাটা বুঝল না। হিমিও তো চাকরি করতে চলে গেল ব্যাঙ্গালোরে। মনে ওঁদের সকলেরই খুব দুঃখ এবং অভিমান। মুখে প্রকাশ করেন না। একমাত্র ছোটমামা মাঝেমধ্যে প্রকাশ করে ফেলেন।

বলেই বলল, আসবি এখানে ভেটকু? ছোটমামা আমাকে একটি ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল খুলতে বলেছিলেন। কিন্তু এলে আমি প্রথমে মোটর ড্রাইভিং-এর স্কুল দিয়েই আরম্ভ করব। কলকাতার ড্রাইভারদের মাইনে কত জানিস? তিন-চার হাজার। পার্কস নিয়ে অনেকে দশ হাজারেরও ওপরে পায়। অথচ তিন-চার হাজার মাইনেতে মাড়োয়ারি গুজরাটিদের ফার্মে গলায় টাই ঝুলিয়ে হাতে ব্রিফকেস নিয়ে কত বাঙালি ছেলে চাকরি করে সেলসম্যানের। ওই টাইগুলো দেখলে আমার ইচ্ছে করে ওদের বলতে, গলায় দড়ি দিয়ে মরো না কেন বাছারা?

বাঙালি ড্রাইভার প্রায় কেউই রাখে না। বাঙালিরাও রাখে না। সব বিহারী, নয় ওড়িয়া, নয় উত্তরপ্রদেশীয়।

কেন? রাখে না কেন?

কামাই করে, সময়ে আসে না, নানা অজুহাত, বাহানা। মানুষেরা টাকা বেশি দিতেও কার্পণ্য করেন না যদি ঠিক মতো কাজ পান। তার ওপরে বাড়তি গুণ ইউনিয়নবাজি। এই ইউনিয়নবাজি, স্ট্রাইক, ঘেরাও, চোখ রাঙানি, পথ অবরোধ, রেল রোকো এ সব যে কবে বন্ধ হবে? অগণ্য কাজের মানুষের সব রকম অসুবিধা করে মিছিল, পথ-সভা এসব পশ্চিমবাংলার যা ক্ষতি করেছে তা বলার নয়। জানি না, কাদের ইমপ্রেস করার জন্যে এসব করা হয়। মানুষ কি গরু-গাধা? খেটে খাওয়া মানুষের কি বুদ্ধি নেই? তারা কাজ করতে চায়, কাজ চায়, চাকরি চায়, নির্বিঘ্নে ব্যবসা করতে চায়, তারা নানা নেতার মেদিনী কাঁপানো বক্তৃতা শুনতে চায় না। তারা চায়. ট্রাম-বাস-রেল ঠিক মতো চলুক, পথে ট্র্যাফিক জ্যাম না হোক। সকলেরই নুন আনতে পান্তা ফুরোয়। সকলেই জেগে গেছে এবং প্রকাশ্যেই বলে, বাঙালি কাজও করে না, উল্টে ইউনিয়নবাজি করে। কার দরকার পড়েছে বাঙালিকে চাকরি দেবে? "ডিম্যান্ড অ্যান্ড সাপ্লাই"-এর স্বাভাবিক নিয়মে যে চাকরি বাঙালিরই পাওয়ার

কথা সেই চাকরি বিহার, ওড়িশা, উত্তরপ্রদেশের মানুষ পেয়ে যাচ্ছে।

হিমি বলল, খাবার আর কফি খেতে খেতে, যাঃ বাবা। তোমরা কি এই সব আলোচনা করতেই আর ভাল্লুকের কামড় খেতে এই ভালু-টোংড়িতে চড়েছিলে। এমন পাগলের মতো করলে তো তোর স্ট্রোক হয়ে যাবে তকুদা। নিজেকে শান্ত কর।

কী করব। আমার রাজ্যকে, আমার দেশকে আমি ভালবাসি বলেই তো চুপ করে থাকতে পারি না।

সাঁটুল গ্লাস নিয়ে আর প্লেটে মাঠ্‌রী নিয়ে তকাইকে বলল তকুদা, এই যে ধরুন।

তকাই রীতিমতো ওয়ার্কড-আপ হয়ে গেছিল। রাম্-এর গ্লাসটা হাতে ধরেই চুপ করে গেল। বলল, ওরে, অতিথিকে আগে দে। তুই কী রে সাঁটুল!

দিয়েছি তো।

তকাই বলল, সরি। আমাকে তোরা ক্ষমা করে দিস।

কী যে বলিস তুই তকুদা।

হিমি বলল।

অনিকেত বলল, বক্তৃতা না দিয়ে এখানেই চলে আয় বরং। করে দেখা। তুই যে, পারিস, করে দেখা। তা দেখাতে পারলেই করার মতো কিছু করা হবে। মতলববাজ রাজনীতিকদের গালে থাপ্পড় মারা হবে।

কারও গালেই থাপ্পড় মারতে আমি চাই না। আমি চাই নিজের রাজ্যকে বাঁচাতে। শুধুমাত্রই নিজের পকেট ভরার জন্যে নিজের নাম-যশ-প্রাইজের জন্যে বেঁচে থাকতে চাই না।

তাই তো বলছি। চলে আয়। আর তুই যদি আসিস তাহলে কথা দিচ্ছি, আমিও আসব।

হিমি খাওয়া থামিয়ে বলল, তকুদা, তোরা যদি আসিস, তুই তো আসতেই পারিস, তোর মামাবাড়ি, কিন্তু অনিকেতবাবু যদি আসেন বাইরের মানুষ হয়ে, তবে আমিও আসব। আসব মানে, এও বলতে পারি যে, ব্যাঙ্গালোরে আর ফিরেই যাব না।

তকাই দাঁড়িয়ে উঠে বলল, হুররে। হিপ্ হিপ্ হুররে।

তারপরই বলল, সাঁটুল, ফেরার সময়ে আমাদের কিচলির মোড়ে নামিয়ে দিবি।

কেন? তকুদাদা?

সাঁটুল বলল।

না, তুই আগে গাড়ি নিয়ে গিয়ে বড়মামা, মেজমামিমা আর ছোটমামাকে খবরটা দিবি। বুড়ো-বুড়িরা আনন্দেই না আজ রাতে স্ট্রোক হয়ে মারাই যায়। তাঁদের কত দিনের স্বপ্ন, আমাকে যে কতবার বলেছেন!

হিমি বলল, আমাকেও। কতবার যে সকলে কতভাবে বলেছেন। অনুনয়-বিনয় বললেও কম বলা হয়। তবে যাওয়ার সময়ে ডঃ মাহাতোকে তুলে নিয়ে যাস। সঙ্গে যেন তাঁর ব্যাগটা নিয়ে যান। আমি ঠাট্টা করছি না। আনন্দের shock-টা দুঃখের shock-এর চেয়ে একটুও কম নয়।

সাঁটুল মুখ ব্যাজার করে বলল, এ তো আর সাইকেল নয় যে একটা নিজে চালালাম আর অন্যটাকে পাশে পাশে গড়িয়ে নিয়ে গেলাম! এ যে গাড়ি! একটা গাড়ি তো তোমাদেরও চালিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

ঠিকই তো। তবে এই এখান থেকে আধঘণ্টা আগে রওয়ানা হয়ে যা।

তা হবে না। তোমাদের কারও কাছেই কোনও যন্ত্র নেই। ভাল্লুক দুটো যদি আবার আসে। তার চেয়ে চলো — নেমে তোমরা কিচলির মোড়ে গাড়িতে বসে বা পায়চারি করতে করতে চাঁদের আলোয় জঙ্গল দেখ। নীচে কোনও খতরনাক জানোয়ার নেই। শেয়াল, খরগোশ এসবই আছে। আমি না হয় আগেই চলে যাব।

রাতে কী রান্না হচ্ছে জানিস?

ঠিক জানি না, তবে মা বলছিলেন লুচি আর কচি পাঁঠার মাংস হবে। ফুদিয়ার দোকান থেকে পাঁচুকে দিয়ে রাবড়িও আনিয়ে রেখেছেন ফ্রিজ-এ। আর কাঁচা আমের চাটনি।

তকাই বলল, গিয়ে স্টপ করা। আমার বন্ধু ভেটকু ভুনি খিচুড়ি খেতে খুব ভালবাসে। মেজমামিকে বলবি, তাঁদের বাপের বাড়িতে হাজারিবাগে যেমন ভাজা মুগের ভুনি খিচুড়ি হয় তেমন ভুনি খিচুড়ি করতে আর সঙ্গে কষা মাংস। আজ ভেটকুকে মামাবাড়ি ও আমার তরফেও একটা Treat দেব—নরাণাং মাতুলক্রমঃ বলে কথা।

বলেই বলল, আচ্ছা হিমি, তোর সঙ্গে না ছোটমামার কী জরুরি কথা ছিল বলে উনি এলেন না আর তুই না বলে কয়ে এখানে আমাদের সঙ্গে ভিড়ে গেলি। বুড়ো মানুষের চিন্তা হবে না? তুই তো ভারি ইরেসপনসিবল।

ভেব না যে আমি অমন দায়িত্বজ্ঞানহীন। তোমাদের সঙ্গে দেখা হওয়ার আগেই ছোটকাকার কাছে তোমরা ভালু-টোংড়িতে আসছ জানতে পেরে আমি গাড়ি থেকেই মোবাইলে কথা বলে নিয়েছিলাম।

তাই? হাউ থটফুল অফ ইউ। তা তোর সঙ্গে মোবাইল আছে তো, মামিমাকে তো মোবাইলেই বলে দেওয়া যায় লুচি-ফুচি করে ফেলার আগে।

মোবাইল তো আমার কাছেও আছে। ছোটবাবু দিয়েছিলেন।

সাঁটুল বলল।

আছে? এতক্ষণ বলিসনি কেন? ইডিয়ট।

তোমরা মোবাইল ফোন আনোনি তকুদা?

হিমি জিজ্ঞেস করল তকাইকে।

না, আমরা কেউই আনিনি। কলকাতাতেই রেখে এসেছি। ইনফরমেশন টেকনোলজির এমন বাড়াবাড়িটা আমাদের দুজনের কারওই পছন্দ নয়। আমরা এখন ডিস-ইনফরমেশন টেকনোলজি প্রোমোট করব।

হিমি বলল, তুইই বল না মাকে তকুদা। মা খুশি হবে। আর shock absorb-ও করতে পারবে। আমাদের দেশের মেয়েদের মতো shock absorber-তো ঈশ্বর আর তৈরি করেননি।

তবে দে ফোনটা।

তকাই বলল।

সাঁটুল, আমার গাড়ির ড্যাশবোর্ডে আছে। নিয়ে এসো তো।

তকাই বলল চল, আমি যাচ্ছি। এত বড় একটা ইম্পর্ট্যান্ট অ্যাসাইনমেন্ট — একটু নির্জনে দাঁড়িয়ে ক্যারি-আউট করাই ভাল।

বলেই, সেই মাঠ বা টাঁড়ের দিকে এগিয়ে গেল।

তারপর অনিকেতের দিকে ফিরে বলল, কী রে অনি। মেনু যা বললাম, তাতে হবে তো?

একটা আইটেম add করতে হবে?

কী সেটা?

কুড়মুড়ে আলু ভাজা।

বাঃ দারুণ। আর মামাবাড়ির বুধিয়া গাই-এর গাওয়া ঘিও থাকবে। শুকনো লঙ্কা ভেজে দিতে বলব তো গরম গরম খাওয়ার সময়ে?

আলবাৎ। আমি রেড রাম্ সত্যিই খাই না। ছোটমামা ভালবেসে পাঠিয়েছেন। রাম্-এর মুখে ভুনি খিচুড়ি যা জমবে না।

তুই তো মেজমামির হাজারিবাগী ভুনি খিচুড়ি খাসনি। খেলে, অক্কা যাবি।

তকাই ফোন করার জন্যে সাঁটুলের কাছ থেকে গাড়ির চাবি নিয়ে জ্যোৎস্নার মধ্যে গাছেদের ছায়ার বুটি-কাটা গালচের ওপর দিয়ে শুকনো পাতা মাড়িয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। ওর পেছন পেছন রাম্-এর গ্লাস ধরে সাঁটুলও গেল।

ভেটকু মনে মনে বলল, তকাই একটা রিয়াল বুর্জোয়া।

ঠিক সেই সময়েই পিউ কাঁহা পাখিটা কোথা থেকে ফিরে এসে আবার সমানে ডাকতে লাগল। সেই ডাকের তীব্র শিহরন তোলা অনুরণন উঠল পাহাড়ে খাদে, প্রান্তরে এবং ঝরনাতলাতে। তার প্রিয়াকে খোঁজা এখনও শেষ হয়নি বোধহয় পাখিটার। অনিকেত ভাবছিল যে, তার প্রিয়া তো এখনও কেউই হয়নি। খোঁজা শুরু করতে হবে।

হিমি বলল, কী ভাবছেন? আপনার সর্বনাশ হল আমার সঙ্গে দেখা হয়ে?

না, তা নয়। তাছাড়া কী সর্বনাশ আর কী পৌষমাস তা কি আমরা নিজেরাই জানি।

তারপর বলল, আপনি 'চার অধ্যায়' পড়েছেন? রবীন্দ্রনাথের?

পড়ব না?

তাহলে তো পড়েইছেন, 'প্রহর শেষের আলোয় রাঙা সেদিন চৈত্র মাস, তোমার চোখে দেখেছিলাম আমার সর্বনাশ'।

সত্যি। রবীন্দ্রনাথ কী মডার্ন। কোনওদিনও পুরনো হবার নয়। কিন্তু আপনি কী ভাবছিলেন তা তো বললেন না?

না, ভাবছিলাম, একজন মানুষের জীবনে কত কীই ঘটে যায় এক নিমেষে। এমন এমন সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে খুব ভীরু ও দ্বিধাগ্রস্ত মানুষও এক নিমেষে যে,

নিজেই অবাক হয়ে যায়। কলকাতা ছেড়ে আসার সিদ্ধান্তটা তো সহজ নয়। তকাই আমাকে বলেছে আগে অনেকবার। ভেবে দেখতে বলেছে। অথচ আশ্চর্য। কোনও ভাবাভাবি ছাড়াই এত বড় একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম কী করে কে জানে! তাছাড়া...

তাছাড়া মনে হচ্ছে, যেন আপনাকে কতদিন ধরে চিনি — আর ছোটমামা, বড়মামা, মেজমামিমা যেন আমার কত জন্মের আপনজন। তকাই তো আমার অত্যন্ত কাছের মানুষ অবশ্যই। কিন্তু আপনি — এমনকী সাঁটুলও। এসব কি এই প্রাকৃতিক অভিঘাতের জন্যেই হল?

'চাঁদের বনে যার পাশে যাই তারেই লাগে ভাল' বলছেন?

বলে, চাপা হাসি হাসল হিমি।

এ কথা ঠিকই। এই প্রকৃতি যে কতখানি অঘটন—পটিয়সী তা শুধু সে নিজেই জানে।

তারপর বলল, কাল সকালে রোদ উঠলেই এই ঘোর কেটে যাবে না তো? আমাদের প্রতি আমার পরিবারের সকলের প্রতি এই ভাললাগাটা?

জানি না। কালকের কথা কালই জানে।

আমিও ভাবছি, ব্যাঙ্গালোর ছেড়ে চলে আসার সিদ্ধান্তটা কী করে হঠাৎ নিলাম। জীবনে অনেক ব্যাপারেই বছরের পর বছর ভেবেও কোনও সিদ্ধান্তে আসা যায় না, কিন্তু কোনও বিশেষ মুহূর্তে সেই সিদ্ধান্ত বিদ্যুৎ-চমকের মতো পাকা হয়ে যায়। সত্যি! মানুষের মনের মতো দুর্জ্ঞেয় আর কি কিছু আছে!

তারপর দুজনেই একটুক্ষণ চুপ করে থাকল।

আপনার কিন্তু একটা গান গাইবার কথা ছিল।

হিমিকা বলল, অনিকেতকে।

রামটা খেয়েনি। দু-তিনটি ড্রিঙ্ক-এর পর নিজের মধ্যের নানা অদৃশ্য বাঁধন যখন ঢিলে হয়ে যায়, যখন খুশি খুশি লাগে, তখনই শুধু গাইতে ইচ্ছে করে। গান গাইবার মতো মন কি সব সময়ে থাকে? আমি কি আর আপনার মতো গায়িকা!

'আমার মতো' 'আপনার মতো' বলে কোনও ব্যাপার নেই। যার মধ্যে গান আছ, যার কান আছে, তিনিই গায়ক। আসলে, মানুষ নিজের জন্যে। যতখানি গান করেন, মানে নিজের ভাললাগার জন্যে, তেমন তো অন্য কারও জন্যেই করতে পারেন না।

এটা ঠিকই বলেছেন আপনি।

বলেই, চুপ করে গেল অনিকেত।

ওপাশ থেকে তকাই-এর উল্লসিত চিৎকার শোনা গেল। বলল, আমাকে কী দেবে বল মেজমামি।

তকুদাটা বড্ড চেঁচায়। এই সন্ধের শান্তিটা ছিঁড়েখুঁড়ে দিল।

অনিকেত বলল, আপনি কী ভাবছিলেন?

ভাবছিলাম, আমার ফিরে যাবার তো সবই ঠিক ছিল। কলকাতা থেকে ব্যাঙ্গালোর ফ্লাইটের রিটার্ন টিকিটও নিয়ে এসেছি। অফিসের গাড়ি আসবে

এয়ারপোর্টে। হঠাৎ কী যে হয়ে গেল। তবে একবার যেতে তো হবেই, নিজের জিনিসপত্র গুছিয়ে আনতে, গ্রাচুইটি, পি এফ, শেয়ার সব সেটল করতে। মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি তো। কিছু শেয়ারও দিয়েছিল। শিকড় বেশ গভীরেই ছড়িয়েছিলাম। আমার জি. এম. তো হাত-পা ছুঁড়বেন। বলবেন, ইউ হ্যাভ গান ক্রেইজি।

তারপর বলল, দেখি। আপনি যদি আমাদের পরিবারের এই যজ্ঞে শামিল হন তাহলে আমারও শামিল না হওয়াটা খুবই খারাপ দেখাবে। বিবেক যাকে বলে, "দংশন" করবে।

খারাপ দেখাবে বলেই আসবেন না। মন থেকে আসবার তাগিদ বোধ করলেই আসবেন।

সেটা ঠিক।

ইতিমধ্যে তকাই আর সাঁটুল ফিরে এল। এসেই তকাই বলল, এই সাঁটুল আমার বন্ধুকে দেখছিস না। দ্যাখ গ্লাস খালি হয়ে গেছে কি না?

সাঁটুল অনিকেতের হাত থেকে গ্লাস নিয়ে নিল। দোলের তো মাত্র আটদিন বাকি। দু'দিন পর গিয়ে আবার ফিরে আসবি, না থেকেই যাবি ভেটকু?

না না, অনেক কমিটমেন্টস আছে। তাছাড়া, মা তো একা থাকেন।

মাসিমা এখানে আসতে আপত্তি করবেন না তো?

তকাই বলল।

মনে হয় না। মা কলকাতাতে আর থাকতেও চান না।

সত্যি। কলকাতায় আর থাকা মুশকিলও। না গাড়িতে করে কোথাও যাওয়া যায়, না হেঁটে। প্রশ্বাসও তো নেওয়া যায় না, যা পলিউশন। নেহাত রুজি-রোজগারের জন্যেই থাকতে হয় মানুষের। তাছাড়া এখানে তোদের মামাবাড়িতে একটা ধার্মিক আবহাওয়া আছে, পুজো-আচ্চা, দোল-দুর্গোৎসব, মায়ের ভালই লাগার কথা।

তারপর বলল, কিন্তু আমি এলে মাকে নিয়ে থাকব কোথায়?

কেন? মামাবাড়িতে?

তকাই বলল।

না, তা কেন? সেটা অনিকেতবাবু এবং তাঁর মায়ের পক্ষে সম্মানের হবে না। তবে থাকবার জায়গা জ্যাঠা-কাকার অবশ্যই বন্দোবস্ত করে দেবেন।

হিমি বলল।

তাহলে আমি তোর সঙ্গেই থাকব। আমার মা থাকবেন তাঁর দু'ভাই আর ভাই-বউ-এর সঙ্গে।

হিমির থাকার কথা স্বাভাবিক কারণেই উঠল না। হিমি চুপ করেই রইল।

একটা সিগারেট খাওয়া।

অনি বলল তকাইকে।

সিগারেট! তুই!

হ্যাঁ। ভীষণ টেনশন হচ্ছে।

তকাই খুব জোরে হেসে উঠতে গিয়েও সামলে নিয়ে বলল, নে, খা।

এবারে গান গা একটা হিমি। আমি কিন্তু আজ ড্রাঙ্ক হয়ে যাব। জীবনের কোনও কোনও দিন ড্রাঙ্ক হওয়া দরকার।

সেটা ভাল। কিন্তু ব্যাঙ্গালোরে মিস্টার মুখার্জি আছেন। তিনি বলেন, যেদিন বৃষ্টি পড়ে সেদিন ড্রাঙ্ক হই আর যেদিন পড়ে না সেদিন।

তকাই আর অনিকেত হেসে উঠল।

গা হিমি। তুই খাবি নাকি একটা রাম্? ভেটকু যখন সিগারেট খাচ্ছে। তোর কোনও টেনশন হচ্ছে না তো?

না। কীসের টেনশন? আই অ্যাম ড্রাঙ্ক উইথ লাইফ।

ঠিক আছে। একটা গান গা না।

আচ্ছা গাইছি। বসন্তের একটি গান। যদিও সকালবেলার রাগে বাঁধা।

রবীন্দ্রনাথের গানের পর্যায় সব উনি ভাগ করেছেন বলেই খোদার ওপর খোদকারি করা উচিত নয় কিন্তু অনেক গানকেই অন্য পর্যায়েও সহজেই ঢুকিয়ে দেওয়া যায়, তাই না?

অনিকেত বলল।

অবশ্যই। যে গানটি গাইছি সেটি বসন্তর গান কিন্তু প্রেমের গান বললেও কারও মারামারি করা উচিত নয়। তাছাড়া এটি সকালবেলার গান, তবুও গাইছি, মন যখন করেছি।

গা এবারে। বড় বেশি কথা বলছিস।

হিমি ধরল গান,

'তুমি কিছু দিয়ে যাও মোর প্রাণে গোপনে গো
ফুলের গন্ধে বাঁশির তানে, মর্মরমুখরিত পবনে॥
তুমি কিছু দিয়ে যাও বেদনা হতে বেদনে -
যে মোর অশ্রু হাসিতে লীন, যে বাণী নীরব নয়নে॥
তুমি কিছু দিয়ে যাও মোর প্রাণে..."

গান শুনে স্তব্ধ হয়ে গেল অনিকেত। যেমন স্বরস্থাপনা, তেমন সুরজ্ঞান, তেমনই ভাব। এই গানটি বহু বড় বহু গাইয়ের গলাতেও শুনেছে। তাও যখন এতখানি ভাল লাগল তার মানে হিমি অবশ্যই ভাল গায়। খুবই ভাল গায়।

ভাবছিল অনি।

রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষিতদের গান। এখন সকলেই রবীন্দ্রসঙ্গীত গায়ক ও বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠেছেন। তা দেখে ও শুনে রবীন্দ্রসঙ্গীত যাঁদের প্রাণের গান তাঁদের প্রাণে যে কতখানি আঘাত লাগে তা শুধু অন্য যাঁরা সেই রকম, তাঁরাই বোঝেন, জানেন।

হিমি বলল। ওই "বুর্জোয়া" কবির গানকে যে সমস্ত শিক্ষিত মানুষ যথার্থ সম্মানের ও ভালবাসার সঙ্গে জীবনে গ্রহণ করেছেন, শুধুমাত্র সেই গানেই

আত্মনিবেদন করেছেন তা তাঁদেরই হয়ে থাকলে সুখের হত। সব কিছুরই 'জনগণায়ন' কোনও জাতির পক্ষেই সুস্থতার লক্ষণ নয়। রবীন্দ্রসঙ্গীত কোনোদিনই আপামর জনগণের গান ছিল না। তেমন ভাবাটাও উচিত নয়। জনগণ জনগণোচিত ব্যাপার স্যাপার নিয়ে থাকলেই সেটা সুখের হতো।

অনিকেতের আরও একটা কথা মনে এল। ওর মন বলল, রবীন্দ্রসঙ্গীত এমন পরিবেশেই শুনতে হয়। হাজার আলো-জ্বলা কোনও শহরের কনসার্ট হলে রবীন্দ্রসঙ্গীতের তাৎপর্যই নষ্ট হয়ে যায়। শান্তিনিকেতনে ছেলেবেলায় শান্তি ছিল। তখন সেখানের পৌষোৎসবে কি বসন্তোৎসবে গান শুনলে প্রকৃতির ছোঁয়া তখনও পাওয়া যেত। কিন্তু আজকে ভিড়ের চোটে তা আর পাওয়া যায় না। অনির কাছে এ এক আবিষ্কার। হিমির গানটি যেন ওর মরমে বিঁধে গেল। এই প্রকৃতি এবং প্রকৃতির নানারকম অভিঘাতও পরম আবিষ্কার।

তকাই বলল, গ্লাসটা ধর। বটমস্-আপ কর ভেটকু।

অনি বলল, হ্যাঁ। ভাবছি। আজকে আমিও ড্রাঙ্ক হব।

হিমি একবার তাকাল অনিকেতের মুখে।

তকাই বলল, আমার বোনের গান কেমন শুনলি তা তো বললি না?

সব জিনিস কথা দিয়ে বোঝানো যায় না। বোঝানোর চেষ্টা করাও উচিত নয়।

তবে?

চোখের ভাষা দিয়ে বোঝাতে হয়।

এই সপ্তমীর শুক্লপক্ষের আলোতে তো অন্য মানুষের চোখ দেখা যায় না তেমন করে।

যে দেখতে জানে সে ঠিকই দেখে।

বুঝলাম। এবার তুই গা।

না। ওই গানের পরে অন্য গান আর হয় না। গানটির রেশ কেটে যাবে। অন্যদিন হবে।

তাহলে চল আমরা সকলে মিলে 'আজ জ্যোৎস্নারাতে সবাই গেছে বনে গাই'। আমার বডিও আজ গান চাইছে।

তকাই বলল।

হিমি হেসে বলল, ফাজিল কোথাকার।

রবীন্দ্রনাথের ওই গানটিও 'ক্লিশে' হয়ে গেছে সূর্যাস্তর ছবিরই মতো। গান যে গাইতে হবেই তার কি মানে আছে? একটু না হয় চুপ করেই থাক। প্রকৃতির কথা শুনি, রূপ দেখি।

অনি বলল।

আরে বাব্বা। এ যে দেখি 'গুরু গুড় চেলা চিনি'।

তারপর হেসে বলল তকাই, 'দুদিনের সন্ন্যাসী, ভাতকে বলে অন্ন'।

সাঁটুল বলল, আর পনেরো মিনিট বসে তারপর গেলেই ভাল।

অনি বলল, ড্রাঙ্ক হয়ে বাড়ি ফিরলে মামারা কিছু বলবেন না? আর মামিমা?

খাওয়ার সময়ে তো মামিমা থাকবেনই।

মামারা বলবেন না, তবে মামিমাকে বলব, মামাদের খাইয়ে দিতে। বড়মামা তো সাড়ে আটটাতে খান। ছোটমামা জেগে থাকলেও কিছু হবে না। তাছাড়া ড্রাঙ্ক হবই বা কেন? ভদ্রলোকে কখনও ড্রাঙ্ক হয় না, 'হাই' হতে পারে কখনও কখনও।

যেমন তোরা ঠিক করবি।

তারপর বলল, চল, আমরা আবার চুপ করে থাকব, আগের মতো।

আবার যদি ভাল্লুক আসে।

হিমি বলল।

এলে আসবে।

সাঁটুল বলল।

আরও চারটে গুলি তো আছে রিভলবারের চেম্বারে। ভয় নেই। তাড়িয়ে দেব।

তাহলে সবাই চুপ।

অনিকেত বলল।

সেই রুপোঝুরি রাতে ঝিরিঝিরি ছায়ার মধ্যে চন্দ্রাহত হয়ে ওরা তিনজনে বসে রইল, মস্ত বড় কালো পাথরটার ওপরে। ওরা চুপ করতেই ঝরানার শব্দটা জোর হল। ভারি সুন্দর নাম ঝরনাটার। হৃদি-ঝোড়া। আস্তে আস্তে নানা রাত-পাখির ডাক স্পষ্ট হতে লাগল। অনিকেত হিমির মুখটা ভাল করে দেখার চেষ্টা করতে লাগল। তার কাটা-কাটা-নাক। চিবুক ঠাহর করতে পারল কিন্তু ওই স্বল্পালোকে তার চোখ পড়তে পারছিল না। আর চোখই তো মনের আয়না। মনের জানলা।

হিমিও তাকিয়ে ছিল অনড় হয়ে বসে অনিকেতের মুখে। যদি দেখতে পায় চোখ অনিকেতের, পড়তে পারে তার ভাষা।

একটা কপার-স্মিথ পাখি ডাকছিল ঝরনাতলার কাছ থেকে আর তার দোসর সাড়া দিচ্ছিল পাহাড়ের নীচ থেকে। যে পাখিটা ঢাব-ঢাব-ঢাব-ঢাব করে ডাকে এমন চাঁদের রাতে রাতভর, সেটা ডাকা শুরু করল। সামনের জ্যোৎস্নালোকিত বিস্তীর্ণ ফাঁকা টাঁড়-এর ওপরে একটি একলা ইয়ালো-ওয়াটেলড ল্যাপউইঙ্গ ডেকে ফিরতে লাগল ডিড-ইউ-ড্যু-ইট-ডিড-ইউ-ড্যু-ইট করে।

কে যে কী করল, কেন করল, কেমন করে করল, তা কে জানে!

পাখিরাই শুধু জানে বুঝি। শুধু পাখি জানে। পাখিরা জানে।

ভাবছিল, হিমি।